ভারত কথা

H 17 IX(A)

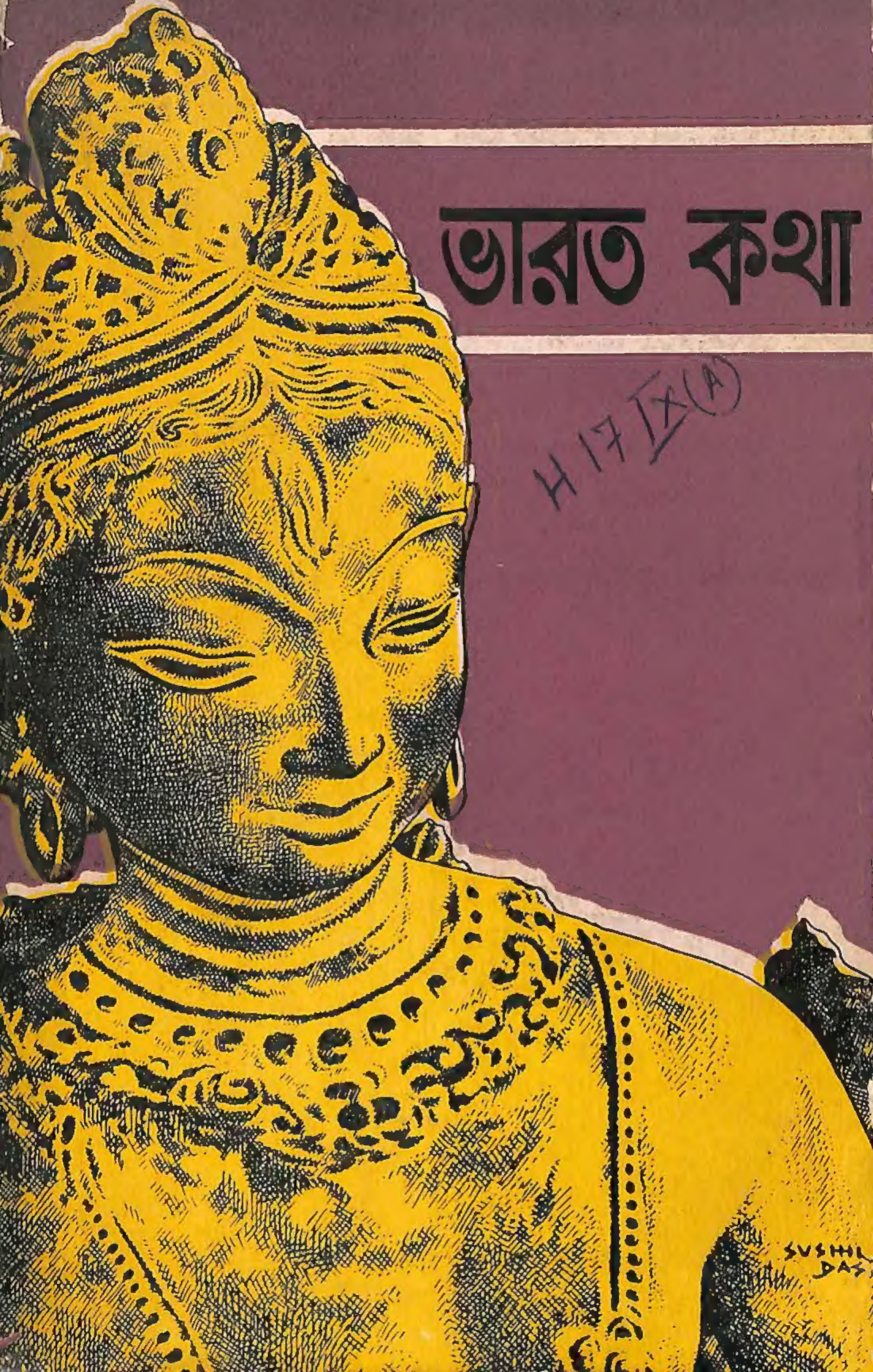

৫৭
২৪.৫.৭০

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন সিলেবাস অনুসারে
নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনুমোদিত।
T.B. No. Syll/H/IX/87/59 of 13.11.87.

ভারত কথা

[নবম শ্রেণীর পাঠ্য]

বর্ধমান শিক্ষক সংসদ

S.C.E.R.T., W.B. Library
25/3, B. C. R.
Calcutta

টিচার্স এন্টারপ্রাইজ
৭এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

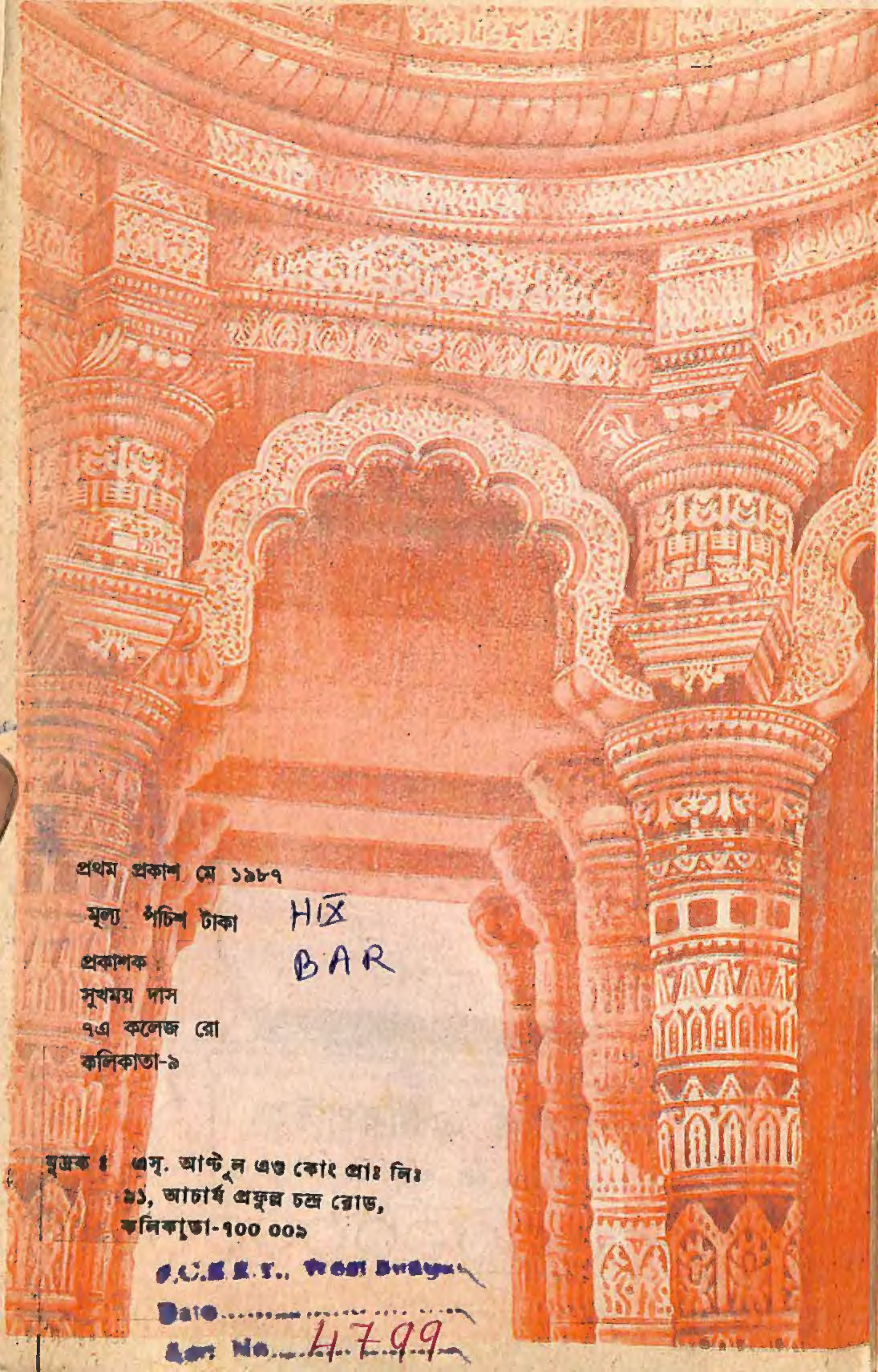

প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৭

মূল্য পঁচিশ টাকা

HIX
BAR

প্রকাশক :
সুখময় দাস
৭এ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : এস্. আন্টুন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৯১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

S.C.E.R.T., West Bengal
Date..........
Acc. No. 4799

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৮৮ সাল থেকে প্রবর্তিত নতুন সিলেবাস অনুসারে এই ইতিহাস বইটি লেখা হল। নতুন সিলেবাস চিত্তাকর্ষক এবং সময়োপযোগী হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট উপকৃত হবে। এমন একটি সঠিক সিলেবাস অনুযায়ী বই লিখে আমাদের শ্রম সার্থক হল। বইটি রচনায় বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তাঁদের নাম উল্লেখ করা হল না। আমাদের সংসদের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বহু মূল্যবান প্রামাণ্য পুস্তক ও পত্রপত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বইটি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ইতিহাসের ক্ষুধা মেটাতে সাহায্য করবে।

ছাত্র/ছাত্রীগণ এ পুস্তক পড়ে ভারত ও ভারতবাসীকে ভালবেসে জাতীয় সংহতি বোধে উদ্বুদ্ধ হবে আশা করি।

শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ বইটির উন্নতির জন্যে আমাদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করলে বাধিত হব।

বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৯৪

—বর্ধমান শিক্ষক সংসদ

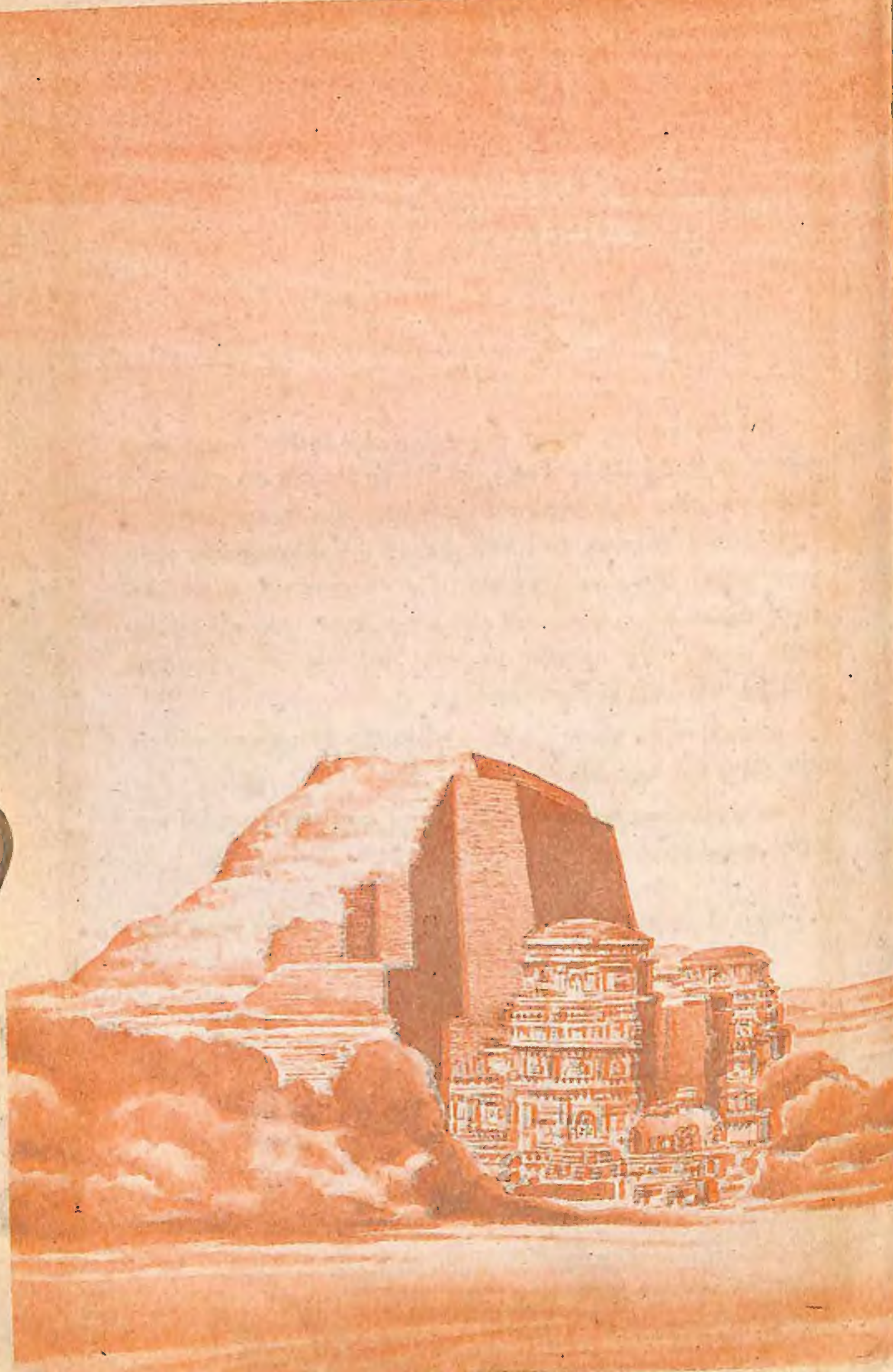

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX

ANCIENT PERIOD

Chapter-I : Geography & History :

(a). Chief physical features of the Indian sub-continent and its main ethnic elements ;

(b). Influence of Geography on History ;

(c). The Fundamental unity ;

(d). Source of ancient Indian History.

Chapter-II : Dawn off Indian Civilisation :

(a). Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages of cultures;

(b). Harappan Civilisation (Chalcolithic) chief features—its antiquity (with special reference to its extent, urban character, town planning and social, economic and religious life), relations with outside world.

Chapter-III : The Vedic Age :

(a). The "Aryans"—their original homeland ; Their first literary work in India—the Rig-Veda ;

(b). Vedic literature ; Later *samhitas, Brahmans, Aranyakas, Upanishadas and Sutras ;*

(c). Life of the people as reflected in the Vedic literature—

(i). Social, economic and religious life and political and administative activities of the people as known from the Rig-Veda ;

(ii) later development.

(d). Expansion of Vedic culture in the subcontinent ;

(e). Beginning of the Iron Age.

Chapter-IV : Protest Movement :

(a). Social, economic and religious causes of the beginning of the movements protesting against the dominance of the age—old Vedic or Brahmanical culture ;

(b). Jainism and Buddhism ;

(c). Lives and teachings of Buddha and Mahavira.

Chapter-V : The Age of Imperialism and Political Unification :

(a). Reference to sixteen Mahajanapadas ;

(b). A bare outline of the history of the growth of the power of Magadha from the days of Bimbisara to the rise of the Mauryas ;

(c). History off the Maurya empire—with special reference to the periods of Chandragupta (his achievements, administration of the age as known from the account of Megasthenes and the *Arthasastra* of Kautilya dated generally to the Maurya Age) and Asoka (his conquest of Kalinga, limits of his empire, propagation of Buddhism and his own Dharma, his humanitarian work, his

contacts with outside world and his place in world history);

(d). Invasions of India by foreigners—

(i). Reference only to the extension of the Achaemenid empire to parts of the Indian subcontinent. Alexandar's invasion and its effects ;

(ii) after the fall of the Mauryas—reference to the rule of the Indo-Greeks, Sakas and Pahlavas ;

(iii). Social and economic condition—with reference to agriculture, trade and industry—foreign elemennts in the population—contacts with outside world—Mauryan Art ;

(e). History of the Kushana Empire with special referennce to the reign of Kaniska (his probable date, his conquest, limit of his empire, his patronage of Buddhism and Indian art and culture) and to India's contact with the outside world in the Kushana age ; cultural importance of the Kushana period in Inndian History ;

(f). The Satavahana Empire—

(i). its extent ;

(ii). the achievements of its greatest ruler—Gautamiputra Satakarni ;

(g) History of the Gupta Empire—with special reference to—

(i). the periods of Samudragupta (his conquests and achievements, war against the Saka Kshatrapas ; (his other achievements) Chandragupta II, a legendary figure. Evidence of Fa-Hien ; Kumargupta I and Skandhagupta (his success against the Hunas) ;

(ii). Causes of the downfall of the Gupta Empire. Distinctive features of the Gupta culture.

Chapter-VI : Struggle for Domination :

(a) North India—

(i) Referennce to the Hunas—Yasodharmana ;

(ii). Rise of Gauda under Sasanka, his relations with Bhaskarvarman of Kamarupa and Harshavardhana of Thaneswar and Kanauj ;

(iii). Conquests of Harshavardhana, limits of his kingdom,—account of Huan-tsang ;

(iv). Rise of the Pratihara and Pala Empires—brief referennce—to the tripartite struggle and its outcome ;

(v). Important Pala and Sen rulers—Dharmapala, Devapala, Mahipala I, Ramapala, Vijayasena and Lakshmanasena ;

(b). Deccan—

(i). the early Chalikyas of Badami ;

(ii). Achievements of Pulakesi II ;

(iii). the Rashtrakutas ;

(iv). Achievements of Govinda III and Krishna III. Later Chalukyas of Kalyanas ; and achievemennts of Vikramaditya VI (A. D. 1076—1128).

(c). South India—

(i) The Pallavas of Kanchi—some notable rulers and their achievements—the Long-drawn conflict between the Pallavas and Chalukyas ;

(ii). The Cholas of Tanjore ;

(iii). Achievements of Rajaraja I and Rajendra I with special reference to their overseas campaigns.

Chapter-VII : Social, Econ. and Culture :

(a). Social, economic and cultural life from the 7th Century to the 12th Century A.D. under the Palas, the Senas, the Chalukyas, the Rashtrakutas, the Chandellas, the greater Gangas of Orissa and the Pallavas and the Cholas of the far South ;

(b). Commercial and cultural contacts with outside world.

ইতিহাস পাঠক্রমের বাংলা অনুবাদ

প্রাচীন যুগ

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূগোল এবং ইতিহাস

(ক) ভারতীয় উপ-মহাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও তার জাতি পরিচয়।

(খ) ইতিহাসের উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব। (গ) মূলগত ঐক্যবোধ।

(ঘ) প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভারতীয় সভ্যতায় সূচনাপর্ব

(ক) পুরা প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তরযুগ এবং নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতা।

(খ) হরপ্পা সভ্যতা (প্রত্নতাত্ত্বিক) প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী—ইহার প্রাচীনতা (সভ্যতার বিস্তার, শহুরে প্রভাব, নগর পরিকল্পনার এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন), বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বৈদিক যুগ

(ক) আর্য জাতি—তাদের আদি বাসভূমি ঃ ভারতে তাদের প্রথম সাহিত্য ঋগ্বেদ।

(খ) বৈদিক সাহিত্য, পরবর্তী সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং সূত্রসমূহ।

(গ) বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত মানুষের জীবনধারা (১) ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও ধর্মজীবন এবং রাজনৈতিক ও শাসনসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ।

(২) পরবর্তী উন্নয়ন।

(ঘ) উপ-মহাদেশীয় অঞ্চলে বৈদিক সংস্কৃতি বিস্তার। (ঙ) লৌহ যুগের সূচনা।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রতিবাদী আন্দোলন

(ক) প্রাচীন বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হওয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণ।

(খ) জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম (গ) বুদ্ধ এবং মহাবীরের জীবন ও শিক্ষা।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য

(ক) ষোড়শ মহাজনপদ।

(খ) বিম্বিসার থেকে মৌর্য অভ্যুত্থান পর্যন্ত মগধের ক্ষমতা বৃদ্ধির অল্প রূপরেখা।

(গ) মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস—বিশেষতঃ চন্দ্রগুপ্ত (তাঁর সক্রিয়তা, মৌর্যযুগে মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসরণে তাঁর শাসননীতি) এবং অশোক (তাঁর কলিঙ্গ বিজয়, সাম্রাজ্যের সীমা, বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং আচরিত ধর্ম, মানবতাবাদ, বর্হিজগতের সঙ্গে সম্পর্ক, ইতিহাসে তাঁর স্থান)।

(ঘ) বৈদিশিকগণ কর্তৃক ভারত অভিযান।

(১) আকামেনিড রাজত্বের বিস্তার, ভারতীয় উপ-মহাদেশে আলেকজান্ডারের অভিযান ও তার ফলাফল।

(২) মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের পর ইন্দো-গ্রীক, শক ও পল্লবগণের উত্থান।

(৩) মৌর্যযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য বৈদেশিক নীতিতে জনগণের প্রভাব—বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক—মৌর্যকলা।

(ঙ) কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস—বিশেষত কণিষ্কের রাজত্বকাল (তাঁর রাজত্বের তারিখ, বিজয়, রাজত্বের সীমা, বৌদ্ধধর্ম, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিতে তাঁহার অবদান) এবং কণিষ্ক যুগে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ, কুষাণ যুগে ভারত ইতিহাসের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব।

(চ) সাতবাহন সাম্রাজ্য ঃ (১) বিস্তার, (২) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী—শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তারূপে সক্রিয়তা। (৩) গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস—বিশেষতঃ সমুদ্রগুপ্তের কাল (বিজয় ও সক্রিয়তা), শক-ক্ষত্রপগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (অন্যান্য সক্রিয়তা) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—লোক কাহিনী। ফা-হিয়েনের প্রমাণ, প্রথম কুমার গুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত (হূণদের বিরুদ্ধে সাফল্য), গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। গুপ্ত সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন পরিচিতি।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ শাসন কর্তৃত্বের সংগ্রাম

(ক) উত্তর ভারত (১) হূণদের পরিচিতি—যশোধর্মন। (২) শশাংকের নেতৃত্বে গৌড়ের উত্থান, কামরূপের ভাস্করবর্মণ এবং থানেশ্বর ও কনৌজের হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। (৩) হর্ষবর্ধনের বিজয়, রাজ্যসীমা, হিউয়েন সাং-এর বিবরণী। (৪) প্রতিহার ও পাল সাম্রাজ্যের উত্থান, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ত্রিপাক্ষিক সংগ্রাম ও ফলাফল। (৫) পাল ও সেন বংশীয় প্রধান রাজগণ—ধর্মপাল, দেবপাল প্রথম মহীপাল, রামপাল, বিজয়সেন এবং লক্ষ্মণসেন।

(খ) দাক্ষিণাত্য—(১) বাদামীর প্রথম চালুক্য (২) দ্বিতীয় পুলকেশীর সক্রিয়তা (৩) রাষ্ট্রকূট (৪) তৃতীয় গোবিন্দ ও তৃতীয় কৃষ্ণ, কল্যাণীর চালুক্যর সক্রিয়তা, ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কীর্তি (১০৭৬—১১২৮ খ্রীষ্টাব্দ)

(গ) দক্ষিণ ভারত—(১) কাঞ্চীর পল্লবগণ—কিছু স্মরণীয় রাজগণ এবং তাঁদের কীর্তি—পল্লব ও চালুক্যগণের মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংঘর্ষ। (২) তাঞ্জোরের চোলগণ। (৩) প্রথম রাজরাজ ও প্রথম রাজেন্দ্রের কীর্তিসহ তাদের সমুদ্রবিজয়।

সপ্তম অধ্যায় ঃ

(ক) সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল, সেন, চোল, রাষ্ট্রকূট, চন্দেল্ল উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠতর গঙ্গবংশ এবং সুদূর দক্ষিণে পল্লব ও চোলগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন।

(খ) বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক।

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

প্রাচীন যুগ

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ ভূগোল ও ইতিহাস (Geography & History) ঃ ভারতের উপমহাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান জাতিগোষ্ঠী ; ভারতের ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব ; মূলগত ঐক্য ; প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান।	১—৯
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ (Dawn of Indian Civilization) ঃ পুরাতন প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতা ; হরপ্পা সভ্যতা (তাম্র-প্রস্তর যুগ)।	১০—১৯
তৃতীয় অধ্যায় ঃ বৈদিক যুগ (Vedic Age) ঃ আর্য—তাদের আদি বাসস্থান ; ভারতে তাদের প্রথম সাহিত্য গ্রন্থ—ঋক্ বেদ ; বৈদিক সাহিত্য, পরবর্তী সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং সূত্র ; বৈদিক সাহিত্যে জনজীবন ; উপমহাদেশে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার ; লৌহ যুগের সূচনা	২০—৩২
চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রতিবাদী ধর্ম-আন্দোলন (Protest-movement) ঃ বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ ; জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ; বুদ্ধদেবের জীবনী ও বাণী ; বর্ধমান মহাবীরের জীবনী ও বাণী।	৩৩—৪১
পঞ্চম অধ্যায় ঃ সাম্রাজ্যবাদের যুগ ও রাজনৈতিক ঐক্যের সূচনা (The Age of Imperialism and Political Unification) ঃ ষোড়শ মহাজনপদ ; মগধের অভ্যুত্থান ; মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস ; চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ; মহামতি অশোক ; বিদেশীদের আক্রমণ ; আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান ; ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক ও পহ্লবদের শাসন ; সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প ; ভারতীয় জনসমাজে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ-বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগসাধন ; মৌর্যশিল্প ; কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ; সাতবাহন সাম্রাজ্য ; গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস ; দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ; কুমার গুপ্ত ; স্কন্দগুপ্ত ; গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ; গুপ্ত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।	৪২—৭৩

পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ৭৪—৮০

ক্ষমতার লড়াই (Struggle for Domination) ঃ উত্তর-ভারত—হূন জাতি ও যশোধর্মন ; গৌড়ের উত্থান—শশাঙ্ক ; হর্ষবর্ধন ; প্রতিহার ও পালরাজ্যের উত্থান ; পাল্ল সাম্রাজ্য ; ত্রিশক্তির দ্বন্দ্ব ; পাল ও সেন রাজগণ, ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, রামপাল, বিজয়সেন, লক্ষণসেন ; দাক্ষিণাত্য—বাতাপির চালুক্যবংশ—দ্বিতীয় পুলকেশী ; রাষ্ট্রকূট ; দক্ষিণ-ভারত—কাঞ্চির পল্লবগণ ; তাঞ্জোরের চোলরাজগণ—রাজরাজ ; রাজেন্দ্র চোল।

সপ্তম অধ্যায় ঃ ৮১—৯০

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন [৭ম থেকে ১২শ শতাব্দী] (Social, Economic and Cultural life from 7th—12th Century) ঃ সামাজিক ব্যবস্থা—পাল ও সেন যুগ ; অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ; সাংস্কৃতিক জীবন ; পল্লব ও চোল সংস্কৃতি ; দক্ষিণ-ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি ; দক্ষিণ-ভারতের সাহিত্য ; বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক।

দ্বিতীয় পর্ব

মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায় ঃ ৯৩—৯৪

মধ্যযুগ (Medieval India) ঃ মুসলিম যুগকে মধ্যযুগ বলা হয় কেন ?

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ৯৪—৯৫

মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান ঃ সুলতানী যুগ (Sources of medieval Indian History : The Sultanate Period)।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ৯৫—৯৬

ভারতে ইসলামের আবির্ভাব ঃ সিন্ধুদেশে আরব বিজয় (Advent of Islam in India : The Arab Conquest of Sind)।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ৯৭—১০০

ভারতে মুসলমান শাসনের সূচনা (Beginning of Muslim Rule in India) ঃ মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থান ; সুলতান মামুদ ; অল-বেরুনী।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ১০১—১০৯

আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য গঠন (From Invasion to Empire) ঃ মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ ; কুতুবউদ্দিন আইবাক্ ; সামসুদ্দিন ইলতুতমীস ; গিয়াসউদ্দিন বলবন।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ১১০—১১৫
খালজী সাম্রাজ্যবাদ (Khalji Imperialism) : আলাউদ্দিন খালজী।

সপ্তম অধ্যায় : ১১৬—১২১
মহম্মদ-বিন্-তুঘলক (Mahammad Bin Tughlug) : সুলতান ফিরোজ শাহ্।

অষ্টম অধ্যায় : ১২১—১২৫
তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণ (Invasion by Timur) : সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা ; লোদী বংশ।

নবম অধ্যায় : ১২৬—১৩৯
আঞ্চলিক শক্তির উত্থান (Rise of Regional Power) : ইলিয়াস শাহ্ ; হুসেনশাহী বংশ ; আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ ; নসরৎ শাহ ; বাহমনী রাজ্য ; দাক্ষিণাত্যের পাঁচ রাজ্য ; বাহমনী-বিজয়নগর দ্বন্দ্বের প্রকৃতি, বিজয়নগর রাজ্য ; দ্বিতীয় দেবরায় ; কৃষ্ণদেব রায়।

দশম অধ্যায় : ১৪০—১৪৮
সুলতানী যুগে ভারতে ইসলামের প্রভাব (Impact of Islam on India During Sultanate Period) : সাংস্কৃতিক জীবন ; গোঁড়া প্রতিক্রিয়া ; সুফীবাদ ; ভক্তি আন্দোলন ; রামানুজ ; রামানন্দ ; কবীর ; গুরু নানক ; শ্রীচৈতন্যদেব ; শিল্পকলা ও স্থাপত্য।

মোগল যুগ

প্রথম অধ্যায় : ১৪৯—১৫৩
মোগল যুগ (Mughal Age) : ইতিহাসের উপাদান।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ১৫৪—১৮৭
মোগল পরিচয় (Origins of the Mughals) : বাবর কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ; মোগল-আফগান দ্বন্দ্ব ; হুমায়ুন ; শেরশাহ ; আকবর ; জাহাঙ্গীর ; শাহজাহান ; ঔরঙ্গজেব ; শিবাজী ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপ।

তৃতীয় অধ্যায় : ১৮৮—১৯৬
মোগল আমলে ভারত (India under the Mughals) : বৃহত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ; মোগল শাসকগণ ও জায়গিরদারেরা ; ভূমিরাজস্ব নীতি ; বিদেশীদের চোখে ভারতীয় শাসকশ্রেণী ; ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ; মোগল আমলে সাংস্কৃতিক জীবন ; কলা-স্থাপত্য-চিত্রশিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস রচনা-সঙ্গীত ; আঞ্চলিক সংস্কৃতি।

তৃতীয় পর্ব

আধুনিক যুগ

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় :

ভারতের ইতিহাস ১৭০৭-১৯৪৭ (History of India 1707-1947) : মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মৌলিক কারণ ; নাদির শাহের ভারত আক্রমণ ও তার পরিণাম — ২০১—২০৬

দ্বিতীয় অধ্যায় :

আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুত্থান (Growth of Regional Powers) : হায়দ্রাবাদ ; মহীশূর ; অযোধ্যা ; শিখ জাতির অভ্যুত্থান ; মারাঠা শক্তির উত্থান ও পতন (১৭৬১ পর্যন্ত) ; পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল। — ২০৭—২১৬

তৃতীয় অধ্যায় :

ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের বিস্তার ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব। — ২১৭—২২৫

চতুর্থ অধ্যায় :

ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক বিকাশ — ২২৬—২৩৩

পঞ্চম অধ্যায় :

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির প্রসার—১৭৬৭—১৮৫৭ (British Imperial Expansion 1767—1857) : মারাঠা ; মহীশূর ; অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি (১৭৯৮) ; অন্যান্য ব্রিটিশ বিজয়সমূহ ; পাঞ্জাব বিজয়—ডালহৌসী ও ব্রিটিশ সম্প্রসারণবাদ। — ২৩৪—২৫১

ষষ্ঠ অধ্যায় :

প্রশাসনিক কাঠামো (Administrative Foundations) : ভারতে ব্রিটিশ শক্তির রাজনৈতিক গুরুত্বের ক্রমবিকাশ (১৭৬৫ পর্যন্ত) ; কেন্দ্রীয়করণ ; বিচার বিভাগীয় ও পুলিশী ব্যবস্থা ; ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা। — ২৫২—২৫৯

সপ্তম অধ্যায় :

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও কিছু ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস — ২৬০—২৬৪

অষ্টম অধ্যায় :

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র (The Cultural Scene) : প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন — বিশেষভাবে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের স্থান। — ২৬৫—২৭৬

নবম অধ্যায় :

কৃষক বিদ্রোহ—ফরাজী ও ওয়াহাবি আন্দোলন আদিবাসী বিদ্রোহ। — ২৭৭—২৮২

দশম অধ্যায় :

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ (The Revolt of 1857) : বিদ্রোহের কারণসমূহ—নেতৃত্ব ; বিদ্রোহের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। — ২৮৩—২৯০

প্রাচীন যুগ

ভারত উপমহাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান জাতিগোষ্ঠী (Chief physical features of the Indian sub-continent and its main ethnic elements) ঃ

একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, পুরানো দিনের ঘটনার বিবরণই হল ইতিহাসের বিষয়বস্তু। আসলে কিন্তু 'ইতিহাস' শব্দটির অর্থ আরও ব্যাপক। আদিমযুগ থেকে আরম্ভ করে নানা বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষ কিভাবে আধুনিক সভ্যতায় এসে পৌঁছেছে তার ধারাবাহিক বিবরণ ও বিশ্লেষণই হল ইতিহাসের বিষয়বস্তু। কোন দেশের ইতিহাস ও মানবসম্প্রদায়কে ঠিকভাবে জানতে হলে সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। কারণ ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে ; একটি আর একটির পরিপূরক।

ভারত এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত এক বিশাল দেশ। ভূখণ্ডটি ৮°৪′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৩৭°৬′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৮°৭′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯৭°২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে ভারত ৩২০০ কিলোমিটার লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩০০০ কিলোমিটার চওড়া। ১৯৮৩ সালের গণনা অনুসারে এর আয়তন ৩২,৮৭,৭৮২ বর্গ-কিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে ভারত এশিয়ার মধ্যে তৃতীয় ও পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। এই ভূ-খণ্ডের আয়তন, জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য একটি মহাদেশের সমতুল। সেই কারণে ভারতকে একটি 'উপমহাদেশ' বলা হয়ে থাকে।

সীমা ঃ উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ভারতীয় ভূখণ্ডকে এশিয়া মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। উত্তর-পশ্চিমে সুলেমান ও হিন্দুকুশ পর্বত ভারতকে আফগানিস্তান ও পারস্য থেকে পৃথক করেছে। উত্তর-পূর্বে আরাকান পর্বত ভারতীয় উপমহাদেশকে ব্রহ্মদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ভারতের পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর। এই তিন দিকে সমুদ্র রয়েছে বলে ভারতবর্ষকে 'উপদ্বীপ'-ও বলা হয়।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই ভারত উপমহাদেশকে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ঃ** ভারতের উত্তরে বিশ্বের বৃহত্তম পর্বতমালা হিমালয় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে ভারতকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করছে এবং

চীন ও তিব্বত থেকে ভারতকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে। হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট হয়ে সিন্ধু ও গঙ্গা এই দুই প্রধান নদ-নদী ভারতের বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরকে সুজলা-সুফলা করেছে। কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, ভূটান, কাংড়া, তরাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গিরিপথগুলি এখানে অবস্থিত। আর এই গিরিপথ পার হয়েই নানা জাতি, নানা সময়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

(২) **সিন্ধু-গঙ্গা বিধৌত সমভূমি ঃ** এই বিশাল সমভূমিটি হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণ থেকে মধ্য-ভারতের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ পশ্চিমে সিন্ধুনদের

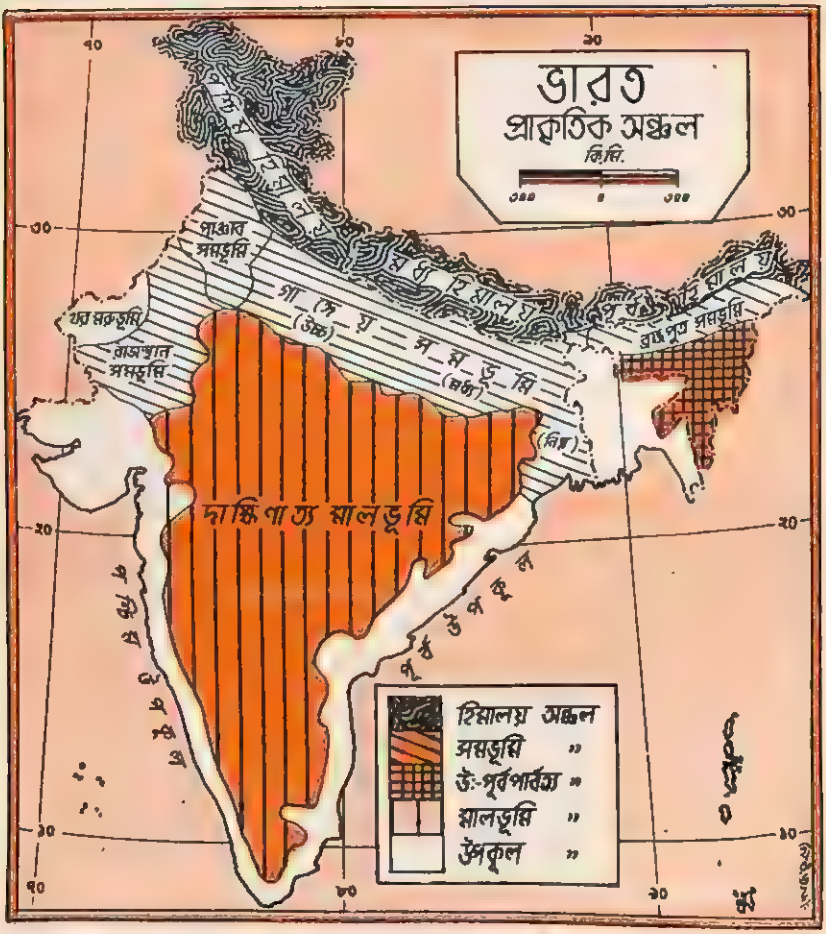

অববাহিকা থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের বেশির ভাগ অঞ্চলই অত্যন্ত উর্বর এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ। এখানকার উল্লেখযোগ্য নদ-নদী হল সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখানদীগুলি। নদীবহুল হওয়ার দরুণ এই সমভূমিতে প্রাচীনকাল থেকেই বড় বড় নগর ও সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। আর্যসভ্যতার বিকাশ,

প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন, তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ, পাণিপথের তিনটি যুদ্ধ ও পলাশীর যুদ্ধ এই সমভূমিতেই সংঘটিত হয়েছিল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই অঞ্চলটির গুরুত্ব অপরিসীম।

(৩) **মধ্যভারতের মালভূমি ঃ** এই ভূ-ভাগটির উত্তরে গঙ্গা-যমুনার সমান্তরাল ভূখণ্ড অবস্থিত। এই পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বত, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতমালা ও নর্মদা উপত্যকা এবং পূর্বে শোন নদী। এই ভূভাগটিকে একটি ত্রিভুজের মতো দেখতে। ভারতের আদিম অধিবাসীগণ যেমন—কোল, ভীল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা এই অঞ্চলেই বাস করে। এই অঞ্চলের মাটি বিশেষ উর্বর নয় এবং লোকবসতি কম।

(৪) **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ঃ** বিন্ধ্য-সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণে একটা ত্রিভুজের মতো দেখতে এই মালভূমিটি পশ্চিমে পশ্চিমঘাট ও পূর্বে পূর্বঘাট পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু এই মালভূমির মধ্যে অবস্থিত। নর্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীগুলি এই মালভূমির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা খুব ভাল নয়। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ অঞ্চলটির বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই।

(৫) **সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ ঃ** পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত, পূর্বঘাট পর্বতের পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং নীলগিরি পর্বতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপকূল ভাগটি হল সুদূর দক্ষিণ। এই অঞ্চলটি হল তামিল সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে। চোল, কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুরাজ্যগুলির এই অঞ্চলেই বিকাশ ঘটে। এখানকার মাটি খুব উর্বর। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ভূ-ভাগটি খুবই উপযুক্ত।

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের আর একটি বিকল্প নাম ছিল। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে সর্বপ্রথম 'জম্বুদ্বীপ' নামটি ভারতবর্ষের বিকল্প হিসেবে আমরা দেখতে পাই। ভারতবর্ষ শব্দটি কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপিতে আমরা প্রথম উল্লেখ পাই। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণের বর্ণনা অনুসারে সমস্ত ভারতীয় ভূ-খণ্ডটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন ঃ (১) উদীচ্য—বর্তমান ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভাগ, (২) মধ্যদেশ—এই বিভাগটির ভৌগোলিক পরিধি মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে মোটামুটি ভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, পশ্চিমে সরস্বতী নদী থেকে পূর্বে কালকবন বা বর্তমান এলাহাবাদ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। (৩) অপরান্ত—পশ্চিম-ভারত অর্থাৎ কাথিয়াওয়াড় গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চল। (৪) প্রাচ্য—পূর্বভারত বা বাংলা, বিহার, কামরূপ বা আসাম প্রভৃতি অঞ্চল। (৫) দক্ষিণাপথ—বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশ থেকে বর্তমান নীলগিরি পর্বত ভূ-ভাগ। আবার কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুই ভাগে ভারতবর্ষকে ভাগ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, আর্যাবর্ত বলতে গোটা উত্তর-ভারত এবং দাক্ষিণাত্য বলতে প্রাচীন দক্ষিণাপথকে বোঝাত।

জাতিতত্ত্বের বিশারদগণ চোয়াল, মাথার খুলির গঠন ও ভাষার ভিত্তিতে ভারতের অধিবাসীকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন ঃ

(১) ভারতীয় আর্য—এরা খুব লম্বা হয়, এদের গায়ের রঙ ফর্সা ও নাক উঁচু হয়। বৈদিক সংস্কৃত ভাষা থেকে এদের ভাষার জন্ম। বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে এই শ্রেণীর লোক বেশি দেখা যায়। পূর্বভারতের মধ্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাকসিফেলাস সম্প্রদায়ের লোক বেশি বাস করে।

(২) **দ্রাবিড় গোষ্ঠী**—এদের শরীরের গঠন আগের সম্প্রদায়ের থেকে আলাদা। গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল কোঁকড়ানো ও কপাল চওড়া হয়। এরা খুব লম্বা হয় না। এদের বেশির ভাগ লোকই এখন দক্ষিণ-ভারতে বাস করে। ভাষা হল তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও কানাড়ী। এইসব ভাষার লিপি সংস্কৃত বা ব্রাহ্মী থেকে আলাদা। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন যে, দ্রাবিড় গোষ্ঠীই সিন্ধু-সভ্যতার অন্যতম স্রষ্টা।

(৩) **অরণ্যবাসী আদিম অধিবাসী**—এরা খুব বেঁটে হয়; এদের গায়ের বরণ ঘন কালো, নাক চ্যাপ্টা ও চোয়াল চওড়া হয়। অস্ট্রিক হল এদের ভাষা, সংস্কৃত এবং দ্রাবিড় ভাষা থেকে আলাদা। পণ্ডিতদের অনুমান বর্তমান অলচিকি লিপি হল এদের ভাষার লিপি। কোল, ভীল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতি এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এদের প্রধান বাসভূমি হল মধ্যপ্রদেশের বনভূমি।

(৪) **মোঙ্গলীয় জাতিগোষ্ঠী**—এদের গায়ের রঙ হলদে, চোখ চাপা, নাক চ্যাপ্টা ও শরীরের উচ্চতা মাঝারি ধরনের। এদের ভাষা অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হিমালয়ের পাদদেশে ও আসামের পার্বত্য অঞ্চল তাদের বাসভূমি।

তবে, একথা ঠিক যে, নানা জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল। কালক্রমে তারা অধিকাংশ ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। এমনিভাবে ভারতীয় জনসমাজ এক মহাজাতিতে পরিণত হয়েছিল। গ্রীক-শক-হূন-পাঠান-মোগল কোন একক জাতির পক্ষেই তার মৌলিক অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতের ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব (Influence of Geography on Indian History) ঃ

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের ইতিহাস গঠনে সেই দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পণ্ডিতেরা বলেন, 'Geography and chronology are the sun and the moon, the right eye and the left eye of all history.' ভারতবর্ষের ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়।

হিমালয় পর্বতমালা দেশের উত্তর-সীমান্তকে সুরক্ষিত করে ভারতবর্ষকে বিদেশীদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে আসছে। এর অতি উঁচু চূড়াগুলি পেরিয়ে ভারতের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করা আজ পর্যন্ত কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব হয় নি। হিমালয় ভারতবর্ষকে এশিয়া মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ও নিজস্ব সভ্যতা বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই সভ্যতার গতি সুপ্রাচীনকাল থেকে

আধুনিক সভ্যতার কাল পর্যন্ত ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। এর উঁচু চূড়াগুলি মধ্য এশিয়া থেকে আসা উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুকে বাধা দিয়ে একদিকে ভারতকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস থেকে রক্ষা করেছে, আবার অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এর উঁচু চূড়ায় বাধা পেয়ে সমতলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে সমতল অঞ্চলের মাটি হয়েছে সুজলা ও সুফলা। হিমালয়ের বরফ-গলা পুষ্ট হয়ে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি উত্তর-ভারতের নদীগুলি জমিকে শুধু উর্বর করেছে তাই নয়, অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের পথও সুগম করে তুলেছে। ভারতের বনজ ও খনিজ সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে হিমালয়েরই দান।

ভারত-ইতিহাসের উপর উত্তর-পশ্চিমের খাইবার, বোলান, গোমাল প্রভৃতি গিরিপথগুলির প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সর্বপ্রথম আর্যরা এ পথ দিয়েই ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তারপর একে একে পারসিক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হূন প্রভৃতি বিদেশীরা এই গিরিপথ দিয়েই ভারতে অনুপ্রবেশ করে। ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশে তাদের অবদান অপরিসীম। আবার উত্তর-পূর্ব গিরিপথ দিয়েই তিব্বত, চীন ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রপাত হয়। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে যারা বাস করে তারা কঠোর পরিশ্রমী, দুর্ধর্ষ ও সাহসী হয়। পক্ষান্তরে, এই পার্বত্য অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার দরুণ এই সব অঞ্চলে কয়েকটি ছোট ছোট রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর্য-সভ্যতার পরবর্তী যুগেও সেখানে সভ্যতার আলো সহজে প্রবেশ করতে পারে নি।

ভারতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিন্ধ্যপর্বত ভারতকে আর্যাবর্ত বা উত্তর-ভারত ও দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণ-ভারত এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করেছে। এই পর্বত দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় জাতিকে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই দ্রাবিড় সভ্যতা আর্য সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বিন্ধ্যপর্বত থাকার দরুণ উত্তর-ভারত থেকে কোন দিগ্বিজয়ী-রাজা সহজে দক্ষিণ-ভারতে প্রবেশ করতে পারেন নি। পুরাণে বর্ণিত আছে অগস্ত্য মুনিই সর্বপ্রথম বিন্ধ্য পার হয়ে দক্ষিণ ভারতে যান। অর্থাৎ অগস্ত্য-যাত্রা থেকেই শুরু হল দক্ষিণ-ভারতে আর্যজাতির অনুপ্রবেশ।

ভারতের ইতিহাসের ওপর সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রভাব সবথেকে বেশি। এই সমভূমিটি উর্বরা, শস্যশ্যামলা। জীবিকার জন্যে এখানকার অধিবাসীদের কঠোর সংগ্রাম করতে হয় না। সিন্ধুনদের উপত্যকায় গড়ে ওঠে সিন্ধু-সভ্যতা এবং 'পঞ্চনদ' ও গঙ্গার উপত্যকায় গড়ে ওঠে আর্য সভ্যতা। আর্যরা তাদের অবসর সময় গঠনমূলক সাহিত্যে, দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চায় অতিবাহিত করেন। ফলে এক মননশীল সভ্যতার বিকাশ গঙ্গানদী উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করছে। এখানকার বন্দরগুলি থেকে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। এই কারণে, গঙ্গার দুই তীরে পাটলিপুত্র, কনৌজ, বারাণসী প্রভৃতি নগরগুলি গড়ে ওঠে। এই সমতল ভূ-খণ্ডেই রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। উর্বরা জমি জয় করবার লালসায় বারেবারে বিদেশ থেকে নানা জাতি প্রধান নদ-নদীগুলির পথ ধরে ভারতে প্রবেশ করে।

ভারতের তিন দিকে সমুদ্র। তাই প্রাচীনকালে ভারতের উপকূল অঞ্চলে কোন বিদেশী প্রবেশ করতে পারে নি। আবার, সমুদ্র উপকূলের খুব কাছাকাছি থেকে

দক্ষিণ-ভারতের চোল, পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি জাতিগুলি সুদক্ষ নাবিক ও নৌ-সেনা হয়ে উঠেছিল। এই উপকূলের বন্দর থেকেই ভারতের বাণিজ্য-জাহাজ একদিকে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যদিকে পারস্য ও লোহিত সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মূলগত ঐক্য (Fundamental Unity) ঃ

বৈচিত্র্যে ভরা এই ভারতীয় উপমহাদেশে নানা জাতি, নানা ভাষাভাষী ও নানা ধর্মের লোক বাস করে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার অনুষ্ঠান ও সামাজিক রীতিনীতিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের প্রধান খাদ্য ও জীবিকা বিভিন্ন প্রকার। তার ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের আবহাওয়া যখন গ্রীষ্মপ্রধান, তখন উত্তর-ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। নদীমাতৃক সমতলভূমির মানুষ সাধারণত কোমল, ভাবুক ও পরিশ্রমবিমুখ হয়। আবার দেখা যায় রাজপুতানার অনুর্বর মরুভূমির মানুষ দুর্ধর্ষ, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। সীমান্ত প্রদেশের কাছে বলে পাঞ্জাবের অধিবাসী সাহসী ও দক্ষ সেনানী হয়। আরব, সমুদ্রের কাছে বলে দক্ষিণ-ভারতের উপকূলের মানুষ হয়েছে দক্ষ নাবিক।

তবু, গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই বিভিন্নতার আড়ালে একটা ঐক্যের সূত্র দৃঢ়ভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে বেঁধে রেখেছে। যেমন—এই বিশাল উপমহাদেশের অধিবাসীগণ যে যেখানেই থাকুক, প্রত্যেকে নিজেকে সর্বপ্রথম ভারতীয় বলে পরিচয় দেয়। ভারতে বসবাসকারী হিন্দুরা একদিকে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা ও আরেকদিকে সিন্ধু থেকে অবিভক্ত বাংলাদেশ পর্যন্ত এক ও অভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে। বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রতিটি হিন্দুর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ভিন্ন ভাষাভাষী হলেও সকল হিন্দুর তীর্থস্থান এক এবং পূজা-পদ্ধতির নিয়ম-কানুনও প্রায় একই রকমের। মুসলমান সম্প্রদায়ও ভারতীয় সভ্যতার অংশীদার। দীর্ঘকাল এক সঙ্গে বাস করবার ফলে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতি ও ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে।

উত্তর-ভারতে যতগুলি প্রচলিত ভাষা আছে, তাদের প্রত্যেকটির মূল ভাষা হল সংস্কৃত। আবার একই সঙ্গে বলা যায়, উত্তর-ভারতে যতগুলি লিপির প্রচলন আছে, তাদের প্রত্যেকটির আদি লিপি হল ব্রাহ্মী। এই লিপি সমগ্র উত্তর-ভারতে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে প্রচলিত হয়। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠী সংস্কৃত থেকে উৎপত্তি না হলেও দ্রাবিড় সাহিত্যে সংস্কৃতের অসামান্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মী লিপি (অক্ষর) ভারতীয় ভাবধারাকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রাচীন শাস্ত্রকাররা সর্বভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ প্রচার করেন। 'আসমুদ্র হিমাচল' শব্দটি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ঐক্য ও শক্তির পরিচয় বহন করে। 'একরাট্', 'সম্রাট', 'রাজচক্রবর্তী' প্রভৃতি রাজকীয় উপাধিগুলি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্দেশ করে। 'জয়হিন্দ' ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি প্রতিটি ভারতীয়কে এক ও অভিন্ন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। সবশেষে কবিগুরুর 'জন-গণ-মন'

সঙ্গীতটি জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে সকল ভারতীয়কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একই পতাকাতলে নিয়ে এসে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারাকে আরো দৃঢ়তায় ঐক্যবদ্ধ করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান (Sources of ancient Indian History) ঃ

ভারতীয়দের সম্বন্ধে বিদেশী ঐতিহাসিকদের সব থেকে বড় অভিযোগ হল প্রাচীন ভারতের অধিবাসীগণ তাদের নিজের দেশের কোন ইতিহাস রচনা করে যান নি। তাঁদের ধারণা প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস লেখার কোন মানসিকতা ছিল না। কিন্তু এই অভিযোগ পুরোপুরি ঠিক নয়। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত নিঃসন্দেহে তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। তবে একথা ঠিক যে, ইতিহাস রচনায় প্রাচীন ভারতীয়রা কখনও কখনও ধারাবাহিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। আমাদের দেশে থুকিডিডিস ও ট্যাসিটাস কিংবা হেরোসিটাস ও লিভির মতে ইতিহাসবেত্তা জন্মান নি বটে তবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সূচনা সুদূর অতীতে—সেই পাথরের যুগে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

(১) সাহিত্য-গ্রন্থ ও (২) প্রত্নতত্ত্ব।

সাহিত্য-গ্রন্থ উপাদানকে আবার দুটি বিভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) ভারতীয়দের লেখা দেশীয় সাহিত্য ও (খ) বিদেশী পর্যটকদের লেখা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(ক) ভারতের প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্য-গ্রন্থ বেদ থেকে আর্যদের রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি এবং ধর্ম সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের যথেষ্ট মূল্য আছে। রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য থেকে তখনকার ভারতের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। মোট আঠারটি পুরাণের মধ্যে বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইতিহাস রচনার দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান।

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য-গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দীপবংশ' এবং 'মহাবংশ' ও জৈন গ্রন্থ 'ভগবতী সূত্র', জৈন 'কল্প সূত্র' ও হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট পর্বণ খুব মূল্যবান। এছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত গার্গী সংহিতা, পাণিনি র অষ্টাধ্যায়ী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে।

প্রাচীন রাজাদের সভ কবিদের বিবরণ ও জীবন-চরিত ইতিহাস রচনায় আর একটি মূল্যবান সম্পদ। কুষাণ-সম্রাট কণিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', রাজা হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহু', বিল্‌হ্নের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ঐতিহাসিক তথ্য ও নির্ভরশীলতার দিক থেকে কল্‌হনের লেখা 'রাজতরঙ্গিনী' সবথেকে

বেশি মূল্যবান। এই বইটি থেকে কাশ্মীরের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। বইটি পদ্যে লেখা। এইটি দ্বাদশ শতাব্দীর এক নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণমূলক ইতিহাস।

বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত : এঁদের মধ্যে আছেন গ্রীক, রোমান, চৈনিক, তিব্বতীয় এবং আরবীয় ঐতিহাসিক। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের আগে (৩২৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) গ্রীক লেখকদের মধ্যে হেরোডোটাস ও টিসিয়াসের নাম উল্লেখযোগ্য। পারস্যরাজ যে উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করেছিলেন তা এঁদের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি। কার্টিয়াস, আরিয়ান, প্লুতার্ক প্রভৃতির লেখা থেকে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' থেকে মৌর্যযুগের সমাজ ও রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লেখা 'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সী' বা 'ভারত মহাসাগরের ভ্রমণ' বইটি তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থা জানবার জন্যে অপরসীম মূল্যবান। এতে ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর, পোতাশ্রয়, আমদানী-রপ্তানীযোগ্য পণ্যদ্রব্যের এক নিখুঁত বর্ণনা আছে। গ্রীক লেখক টলেমীর ভূগোল এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

চীনদেশ থেকে এদেশে যেসব পরিব্রাজক এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন, (৩৯৯-৪১৩), হিউ-এন-সাঙ (৬২৯-৬৪৩), ই-সিং (৬৭১) উল্লেখযোগ্য। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল, হিউ-এন সাঙ-এর বিবরণ থেকে রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল এবং ই-সিং-এর লেখা থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বভারত সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। তিব্বতীয় লেখক তারনাথ বৌদ্ধধর্ম ও সমকালীন রাজনীতি সংক্রান্ত অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন।

যে সব আরব পর্যটক এইদেশ সম্বন্ধে কিছু লিখে গেছেন তার মধ্যে সুলেমান এবং আল্‌বিরুনির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আল্‌বিরুনি ধর্মের দিক থেকে মোটেই গোঁড়া ছিলেন না। তাঁর লেখা তারিখ-উল-হিন্দ্ বইটি থেকে তখনকার হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থার কথা বিশদভাবে জানা যায়।

প্রত্নতত্ত্ব : এই শ্রেণীর উপাদানকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায় : (ক) লেখ (খ) মুদ্রা (গ) প্রাচীন স্মৃতি সৌধ।

লেখ : ইতিহাসের উপদান হিসেবে লেখ-এর মূল্য সাহিত্যগ্রন্থ থেকে অনেক বেশি। প্রাচীন রাজাদের বিজয়গাথা বা প্রশস্তি, রাজার কোন নির্দেশ বা অনুশাসন, জমিদান ইত্যাদি আমরা তখনকার রাজাদের শিলালিপি বা তাম্রফলক থেকে জানতে পারি। সাধারণতঃ পাথর, লোহা ও তামা এই ধরনের ধাতুর ব্যবহার লেখতে দেখতে পাওয়া যায়।

শিলালিপির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল মৌর্যরাজ অশোকের অনুশাসন সংক্রান্ত লিপিগুলি। এই লিপিগুলির বেশির ভাগই ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ প্রিন্সেপ্ সর্বপ্রথম ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করে ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেন। কলিঙ্গরাজ খারবেলের 'হাতিগুম্ফা' লিপি, গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উদয়গিরি গুহা-লিপি, সাতবাহন রাজ সাতকর্ণির নাসিক প্রশস্তি, শকমহাক্ষত্রপ রুদ্রদমনের জুনাগড়-লিপি, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর

আইহোল লিপি, প্রতিহাররাজ ভোজের গোয়ালিয়র লিপি, বিয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে সংশ্লিষ্ট রাজাদের ও সেই সময়ের অনেক রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ জানতে পারা যায়।

ভূমিদান সম্পর্কিত দলিলগুলি তাম্রফলকের উপর খোদাই করা লেখ। এগুলি বেশির ভাগই রাজার প্রশস্তি ও বংশতালিকা সংবলিত দলিল।

বৈদেশিক লেখগুলির মধ্যে সবথেকে উপল্লেখযোগ্য হ'ল এশিয়া মাইনরে প্রাপ্ত বোঘাজকোয় শিলালিপি। এ থেকে আমরা আর্য রাজাদের এবং তাদের সন্ধি সম্বন্ধে জানতে পারি। পারস্যরাজ দারায়ুস (৫২২-৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ)-এর পারসেপলিস ও নক্স-ই-রুস্তম লেখ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল।

মুদ্রা ঃ ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মুদ্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ভারতের এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁদের রাজত্বের কথা কেবলমাত্র মুদ্রা থেকেই জানা যায়। এর বড় প্রমাণ হল ভারতে ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের শাসনকাল। মুদ্রা থেকে রাজার নাম ও কাল (যদি তারিখ উল্লেখ থাকে) জানা যায়। যে ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরি, সে ধাতুর মান থেকে তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝতে পারা যায়। সোনার মুদ্রা যেমন অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি বোঝায়, তেমনি তার থেকে হীন মানের মুদ্রা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অস্থিরতা ইঙ্গিত করে। সাধারণতঃ মুদ্রার মুখ্য দিকে রাজার ছবি এবং গৌণ দিকে কোন দেবদেবীর মূর্তি বা রাজার নিজস্ব কোন রুচির পরিচয় থাকে। মুদ্রার গৌণ দিক তখনকার রাজার ব্যক্তিগত ধর্মের বিশ্বাস প্রতিফলিত করে। যে জায়গা থেকে মুদ্রা পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় যে ঐ অঞ্চলের সঙ্গে মূল রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। গুপ্ত রাজাদের সময় ভারতে অনেক রোমের মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ থেকে আমরা মনে করতে পারি যে, গুপ্তদের সময়ে ভারতের সঙ্গে সুদুর রোমের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। সাহিত্য-গ্রন্থ ও লেখ থেকে আমরা যে ঐতিহাসিক তথ্য পাই মুদ্রা তার সত্যতা যাচাই করে দেয়।

প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম যে মুদ্রার প্রচলন হয় তাতে কোন রাজার ছবি কিংবা কোন তারিখের উল্লেখ ছিল না। এ জাতীয় মুদ্রাকে বলা হয় 'হস্ত-চিহ্নিত মুদ্রা' বা **'Punch-marked coin'**। তামা ও রূপো দুই রকমের ধাতু দিয়ে এ জাতীয় মুদ্রা তৈরি হত। ভারতে শক, কুষাণ, গুপ্ত,সাতবাহন প্রভৃতি রাজাদের মুদ্রা থেকে যে তথ্য জানা যায় তাতে ঐতিহাসিক মূল্য অনেক।

স্মৃতিসৌধ ঃ মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে পোড়ো মন্দিরের গঠন, দেবদেবীর মূর্তি, পোড়া মাটির কাজ, সংশ্লিষ্ট মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানতে পারা যায়। এজাতীয় তথ্য দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় কোন সাহায্য করে না ; কিন্তু সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাস রচনায় এর গুরুত্ব যথেষ্ট। একটি সভ্যতা কত পুরানো তা অনেক সময় সেই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষের স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, লোঠাল, তক্ষশীলা, সারনাথ, হস্তিনাপুর, কৌশাম্বী এবং আলিগড়ের কাছে অত্রনজি খেরা প্রভৃতি স্থানে খোঁড়ার ফলে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় এই সব তথ্যের মূল্য অপরিসীম।

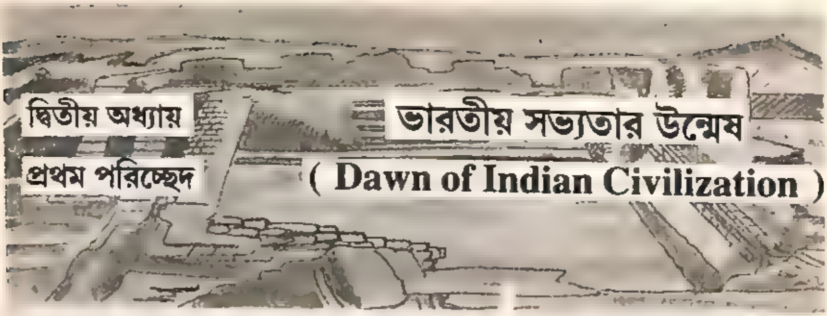

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ
(Dawn of Indian Civilization)

(ক) পুরাতন প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতা ঃ (Palæolithic, Mesolithic ad Neolithic Stages of Culture) :

ঠিক কোন্ সময় ভারতের মাটিতে মানুষ প্রথম বসবাস করতে শুরু করে সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে সময়টিকে 'প্রস্তর যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন অনেকের ধারণা সেই প্রস্তর যুগেই সূচনা হয়েছিল ভারতের মাটিতে মানুষের প্রথম বসবাস। পণ্ডিতদের অনুমান যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চার লক্ষ বছর আগে ভারতে পুরাতন প্রস্তর যুগের সূচনা হয়। সে যুগের মানুষ যে-সব জিনিস ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত সেগুলির গঠন-প্রকৃতি, আয়তন ইত্যাদি বিচার করে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রস্তর যুগকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন : (১) প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Palæolithic age), (২) মধ্য প্রস্তর যুগ (Mesolithic age) এবং (৩) নব্য প্রস্তর যুগ (Neolithic age)।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ ঃ এ যুগটি ছিল বন্য পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষার বা শিকারের যুগ। একমাত্র পাথর ছাড়া এ যুগে কোন ধাতুর ব্যবহার জানা ছিল না। তাই পাথর দিয়েই মানুষ তার হতিয়ার তৈরি করত। একটি শক্ত পাথরকে ধারালো ও ছুঁচলো করবার জন্যে সে আর একটি পাথর নিয়ে তাকে ঠুকতে লাগল। ফলে শক্ত পাথরের কয়েক খণ্ড পাত খসে পড়ল। পাথরটি বেশ ধারালো ও ছুঁচলো হয়ে উঠল। এই ভাবে তৈরি হল প্রাচীনতম মানুষের 'হাত-কুড়াল'। এর কোন হাতল ছিল না। এর সাহায্যে মানুষ শিকার করত, কাঠ কাটত, মাংস কাটত ইত্যাদি। এবড়ো-খেবড়ো পাথর খণ্ড দিয়ে চাঁছার যন্ত্র বানানো হত। আবার ধারালো পাথর দিয়ে কাটারি তৈরি করা হত। পাথরের পাত দিয়ে ছুরি তৈরি করা হত। বুনো পশুকে যাতে খুব সহজেই শিকার করা যায় তার জন্য ছুঁচলো পাথরের টুকরো দিয়ে বর্শার ফলা বা হারপুন বানানো হত। এইভাবে এই যুগেই মানুষ কাঠের বা হাড়ের বাটালি, চেরাই করার যন্ত্র, তীর ধনুক, মাছ ধরার বঁড়শি, ছুঁচ প্রভৃতি যন্ত্রপাতি তৈরি করে ফেলল। এ যুগের সবথেকে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল আগুনের ব্যবহার ও তাকে ঠিকমতো নিজের কাজে লাগানো। এ যুগের ব্যবহার করা জিনিসপত্র পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর উপত্যকায় (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত), কর্ণাটক, মাদ্রাজের নীলগিরি ও কৃষ্ণা নদীর উপত্যকায় পাওয়া গেছে।

জীবনধারণের জন্য এ যুগের মানুষকে খাবার যোগাড় করতে হত। তারা খাদ্য তৈরি করতে জানত না। তখন পর্যন্তও চাষবাসের প্রচলন হয় নি। তারা গাছের ফল ও পশুর

মাংস খেত। এককথায় খাদ্যের ব্যাপারে তারা ছিল বর্বর ও যাযাবর। তারা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে বাস করত। অনেকে মনে করেন তারা ছিল দ্রাবিড় জাতিগোষ্ঠীর লোক। পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ লক্ষ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব আট হাজার অব্দ পর্যন্ত পুরাতন প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল।

মধ্য প্রস্তর যুগ : এ যুগেও মানুষ পাথর ছাড়া অন্য কোন ধাতুর ব্যবহার জানত না। তবে মানুষ তখন খুব দ্রুত সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছে। তখন তার প্রধান অস্ত্র ছিল পাথরের ফলা ও নুড়ি পাথর। গুজরাটের লঙ্ঘঞ্জ অঞ্চলে এই-জাতীয় অস্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। এ যুগের মানুষ প্রথম দিকে মাটির তৈরি শিল্প করতে জানত। কিন্তু চাকা তৈরি করতে শেখেনি। তাই হাতে তৈরি মাটির জিনিসপত্রই ছিল এ যুগের শিল্পের আকর্ষণ। জীবজন্তুকে পোষ মানানো, এবং শেষের দিকে কৃষিকার্যের সূচনা ও চাকার আবিষ্কার এ যুগের বৈশিষ্ট্য। এ যুগেই ভারতের পশ্চিম দিকে ককেশীয়রা ও পূর্বে মঙ্গোল জাতিগোষ্ঠী এসেছিল। এই যুগের সভ্যতার নিদর্শন পশ্চিমে সিন্ধুদেশে (বর্তমানে পাকিস্তান), দক্ষিণে তিনেভেলিতে এবং পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ছয় হাজার অব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল।

নব্য প্রস্তর যুগ : প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন খ্রীষ্টপূর্ব ছয় হাজার অব্দ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের সূচনা। এ যুগের ব্যবহার করা জিনিসগুলি ও পাথরের তৈরি যন্ত্রপাতিগুলি ছিল খুবই চকচকে পালিস করা ও মসৃণ। এই যুগেই মানুষ কতকগুলি জিনিস আবিষ্কার করেছে যাকে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে 'যুগান্তকারী' আখ্যা দেওয়া যায়। মানবসভ্যতার বিবর্তনে ভারতের 'নব্য প্রস্তর যুগ' এক মহাবিপ্লবের অধ্যায় সূচিত করে।

কৃষি : এ যুগেই প্রথম কৃষিকাজের সূচনা হয়। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য উৎপাদনকারী। পাথরের ফলায় মাটি খুঁড়ে তাতে বীজ বপন করা হত। জমি খোঁড়ার জন্য পাথরের কোদাল ও শিঙের লাঙল তৈরি হল। ফসল কাটার জন্য তৈরি হল হাড়ের কাস্তে। এরপর হামালদিস্তা, শিলনোড়া ইত্যাদি অনেক জিনিসই তৈরি হতে লাগল।

গোষ্ঠীজীবন : চাষবাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক চাষী পরিবার একই জায়গায় পাশাপাশি বাস করতে লাগল। এ যুগের মানুষ কাঁচা মাটির তৈরি বাড়িতে বাস করত। তারা ধাপে ধাপে গোষ্ঠীজীবনের সূচনা করল। ক্রমে একদিন গড়ে উঠল গ্রাম, নগর, সমাজ ও রাষ্ট্র।

পশুপালন : এ যুগের মানুষ গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশুকে গৃহে পালন করত। ঘরে দুধ, মাংস, শস্য সর্বদাই মজুত থাকত। গৃহপালিত পশুকে গাড়ি টানার কাজে লাগিয়েও মানুষ লাভবান হতে লাগল।

যানবাহন : এ যুগে কিংবা মধ্য প্রস্তর যুগের শেষদিকে মানুষ চাকা তৈরি করে। তক্তা জুড়ে নৌকো তৈরি করে ও যাতায়াতের বিরাট উন্নতি সাধন করে। নৌকো ও পালতোলা জাহাজে করে খুব তাড়াতাড়ি জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে ভারতের বাইরের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধে হয়।

উন্নত মানের মৃৎশিল্প : এ যুগে খুব সুন্দর মাটির বাসন, হাঁড়ি, কলসি প্রভৃতি তৈরি

হয়। এগুলি পোড়া মাটি বলে খুব মজবুত ছিল। বালুচিস্তানের ঝোব নাল (Nal) ও কুল্লি (Kulli) অঞ্চলে এ যুগের মৃৎশিল্পের নিদর্শন মেলে।

পরিধেয় বস্ত্র : এ যুগেই মানুষ প্রথম তুলো থেকে সুতো তৈরি করতে ও কাপড় বুনতে শেখে। পশুর লোম, তিসি গাছের বাকল ও তুলোর আঁশ থেকে সুতো তৈরি করা হত। এইভাবে সে তার নিজের পরবার কাপড়-চোপড় তৈরি করতে শিখে ফেলল।

ধর্মীয় বিশ্বাস : এ যুগেই মানুষ সর্বপ্রথম দেবদেবী সম্পর্কে একটা ধারণা করতে শেখে। সে জমিকে দেবী বলে মানতে লাগল। দেবতা যাতে বেশি ফসল দেন তার জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে নানা উপহার দেওয়ার রীতি প্রচলিত হল। এই সময় এক ধরনের দেবীর বহু মূর্তি গড়া হয়। সে মনে করত এই দেবীকে পুজো করলে জমি উর্বরা হবে। সূর্য, চন্দ্র, পশু-পাখি টোটেম বলে বিবেচিত হত।

শিল্প : গুহা ও সমাধির গায়ে, মাটির বাসনে খোদাই করা ছবি ঐ যুগের মানুষের শিল্প মানসিকতার পরিচয় দেয়।

নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতার চিহ্ন যে সব জায়গায় পাওয়া গেছে তার মূল কেন্দ্র হল সিন্ধুদেশ ও বেলুচিস্তান (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত)। এছাড়া, বিহার-ওড়িশা এবং আসামেও এ যুগের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরপ্পা সভ্যতা (তাম্র-প্রস্তর যুগ) Harappan Civilisation (Chalcolithic) : প্রধান বৈশিষ্ট্য—এর প্রাচীনত্ব (এর বিস্তৃতি, নগর-সভ্যতা, নগর-পরিকল্পনা, সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন বিশেষভাবে উল্লেখ্য) বহির্বিশ্বের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক [Harappan Civilisation (Chalcolithic)—Chief features— antiquity (with special reference to its extent, urban character, town planning, and social, economic and religious life) relations with outside world].

তাম্র-প্রস্তর যুগ নব্য প্রস্তর যুগের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয় তামা ও ব্রোঞ্জ-এর যুগ। এ যুগে পাথর ও তামার তৈরি জিনিসপত্র একসঙ্গে ব্যবহার করা হত। সেই জন্য অনেকে এই যুগকে তাম্র-প্রস্তর যুগ বলে। এই যুগেই মানুষ প্রথম ধাতুর ব্যবহার শিখল। পণ্ডিতদের অনুমান এখন থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে এই তাম্র-প্রস্তর যুগের সূচনা হয়।

এই যুগেই মানুষ তামাকে পিটিয়ে নানা রকমের জিনিস তৈরি করতে লাগল। নিত্য নতুন জিনিসের আবিষ্কার করে সে সভ্যতার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেল। এর পরবর্তী কালে এ যুগেই শুরু হল নাগরিক সভ্যতার বিকাশ। সমাজে পেশাভিত্তিক শ্রেণীর সৃষ্টি হল। কেউ হল চাষী, কেউ পশুপালক, কেউ কারিগর, কেউ বা ব্যবসায়ী। এক জাতি অন্য জাতির জমি দখল করতে গেলেই যুদ্ধ বাধত। তাই নগর সভ্যতার সূচনা পর্বেই এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করত। মানুষ পুরোহিতদের

সম্মান করত। তারা পুরোহিতকে দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে দেখত। অনেক সময় এই পুরোহিতরাই রাজা হতেন।

মাটি খুঁড়ে যেসব জিনিস পাওয়া গেছে তা পরীক্ষা করে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের ওপর তাম্র-প্রস্তর যুগের প্রভাবই ছিল বেশি। তুলনায় উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে সেই প্রভাব অনেক কম। এ যুগের লোকেরা খুব পাকাপোক্ত মাল-মসলা দিয়ে বাড়ি বানাত। বড়িগুলির ওপর মাটির একটা আস্তরণ থাকত। এই যুগের সংস্কৃতির নিদর্শন পূর্ব ভারতেও পাওয়া গেছে।

হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Harappan Civilisation) : ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার হিউবার্ট জন

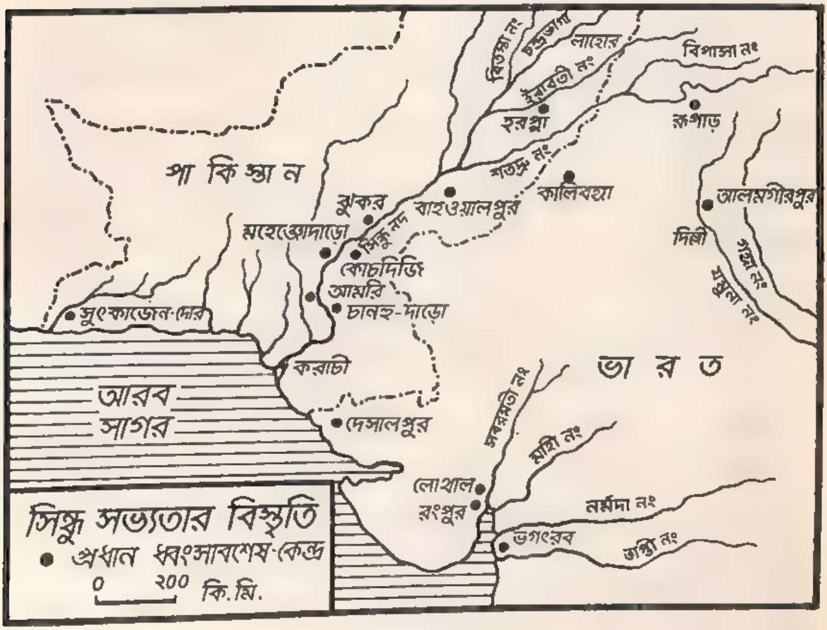

মার্শাল-এর তত্ত্বাবধানে সিন্ধুনদের অববাহিকার মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু হয়। একাজে তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন ভারতের পুরাতত্ত্ববিদ্‌ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দয়ারাম সাহানী। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুলতান জেলায় হরপ্পা ও সিন্ধুদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদাড়ো—এই দুই স্থানে খোঁড়ার ফলে ভারতের এক উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখন এই স্থান দুটি পাকিস্তানের অন্তর্গত। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার মার্টিমের হুইলারের তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলে আর একবার মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু হয়। ফলে আরও কিছু সভ্যতার নিদর্শন মেলে।

হরপ্পা সভ্যতার কাল (Antiquity of Harappan Civilisation) : সমকালীন কোন সাহিত্য গ্রন্থ নেই যাকে কেন্দ্র করে এই সভ্যতার কাল নির্ণয় করা যায়। হরপ্পায় অনেক সীলমোহর পাওয়া গেছে। তবে তাদের গায়ে যে লিপি আছে সেই লিপির পাঠোদ্ধার করা আজও সম্ভব হয়নি। ফলে এই সংস্কৃতির কাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে

কিছু বলা যায় না। তবে আনুষঙ্গিক কয়েকটি নিদর্শনের ওপর নির্ভর করে পণ্ডিতগণ একটি ইতিহাসগ্রাহ্য সময়সীমা নির্ণয় করেছেন।

সিন্ধু উপত্যকায় লোহা পাওয়া যায়নি। খ্রীষ্টপূর্ব সহস্রাব্দের মধ্যভাগে পশ্চিম এশিয়ায় লোহার ব্যবহার শুরু হয়। এই অঞ্চলের সঙ্গে হরপ্পার যোগাযোগ ছিল। সুতরাং হরপ্পা সভ্যতা নিম্নতম কালসীমা হিসেবে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আবার মহেঞ্জোদাড়োর কয়েকটি স্তর জলমগ্ন থাকায় তা খোঁড়া সম্ভব হয় নি। ভূতাত্ত্বিকরা মহেঞ্জোদাড়োর সব থেকে নিচুতলের মাটির প্রকৃতি পরীক্ষা করে বলেন যে, আনুমানিক ২৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। জন মার্শাল মনে করেন হরপ্পা সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৫০ অব্দের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। হরপ্পার সীল-এর মতো কিছু সীল পশ্চিম-এশিয়ার সুমের, ব্যাবিলন, এলাম প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গেছে। ডঃ সি· জে· প্যাড কয়েকটি সীল পরীক্ষা করে এই সভ্যতার বিকাশ হিসেবে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের মধ্যে সময়সীমা চিহ্নিত করেছেন। ডঃ ফ্রাঙ্কফুর্ট পশ্চিম এশিয়ার টেল্ অব্দ নির্দিষ্ট করেছেন। মার্টিমার হুইলারের মতে এই সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। পুরাতাত্ত্বিকদের অনুমান সুমের ও হরপ্পা এই দুই সংস্কৃতি ছিল একই সময়ের। সুমেরীয় সভ্যতার সময় সীমা হিসেবে ২৮০০ খ্রীষ্টপূর্ব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহেঞ্জোদাড়োর মাটির তলায় যে অনাবিষ্কৃত স্তর আছে, পণ্ডিতরা তাকে আরো ২০০ বছরের প্রাচীন বলে মনে করেন। সেই হিসেবে ২৮০০+২০০ বা ৩০০০ খ্রীঃপূঃ-কে হরপ্পা সংস্কৃতির সম্ভাব্য কাল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃতি (Extent of Harappan Civilisation) : পরবর্তীকালে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে এই সভ্যতার একটি সম্ভাব্য পরিধি নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। পণ্ডিতগণ বলেন এই সভ্যতা পূর্ব-পশ্চিমে ১১০০ কিলোমিটারের ওপর এবং উত্তর-দক্ষিণে ১৬০০ কিলোমিটারের ওপর বিস্তার লাভ করেছিল। সুদূর দক্ষিণে নর্মদা নদীর মোহনায় ও পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, কাথিয়াওয়াড়, গুজরাট, রাজস্থান, সিন্ধু প্রদেশের চান-হু-ডারো এবং আমেদাবাদের লোথাল-এ এই সভ্যতার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে এই সংস্কৃতি পশ্চিমে ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী সীমান্ত, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ এবং দক্ষিণে ক্যাম্বে উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নগর পরিকল্পনা (Town planning) ঃ হরপ্পা সভ্যতা ছিল মূলতঃ নগরকেন্দ্রিক। প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে স্পষ্টই প্রমাণ করা যায় যে নগরগুলি পূর্ব-পরিকল্পনামাফিক তৈরি হয়েছিল। পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা এই দুটি নগরের পরিকল্পনা প্রায় একই রকমের ছিল। স্টুয়ার্ট পিগট মনে করেন যে, হরপ্পা সভ্যতা যে-বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অক্ষত ছিল তাতে ঐ অঞ্চলে দুটি রাজধানী ছিল মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা এবং রাজস্থানের কালিবনগান শহরের রাস্তাগুলি চওড়া (৯ ফুট থেকে ৩৪ ফুট) ও সোজা ছিল। একদিকের রাস্তা অন্যদিকের রাস্তার সঙ্গে সমকোণে মিলিত হয়েছিল। এরা

একটি শহরকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করেছিল। প্রতিটি অঞ্চলেই ছিল অনেকগুলি রাস্তা ও গলি। গলিগুলিতে জলের কুয়ো খোঁড়া হত। তবে হরপ্পায় কুয়োর সংখ্যা অনেক কম ছিল।

মহেঞ্জোদাড়োর একটি গলি

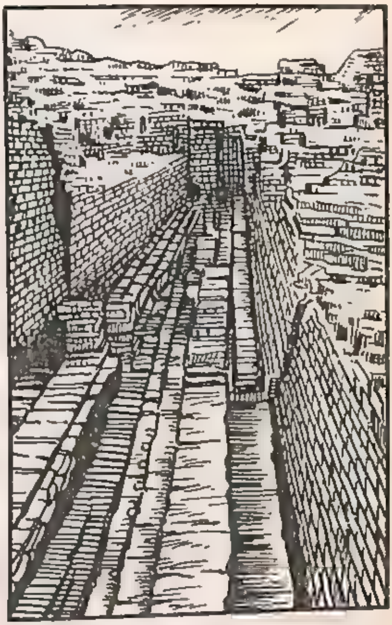

মহেঞ্জোদাড়োর পয়ঃপ্রণালী

রাস্তা ও গলি এই দুই জায়গার ওপরই বাড়ি তৈরি হত। বাড়িগুলি পোড়া ইটের তৈরি ছিল। ইটের মাপ সব জায়গাতেই একই রকমের ছিল। বাড়িগুলি নিখুঁত পরিকল্পনা মাফিক হলেও আয়তনের দিক থেকে সমান ছিল না। কোন কোন বাড়ি ছিল একতলা। মেঝের আয়তন ছিল মাত্র তিরিশ বর্গফুট ; আবার কোন কোন বাড়ি ছিল দোতলা ও তিনতলা যার মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রাসাদ বা সরকারি বাড়ি ছিল। মাঝারি ধরনের বাড়িরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। অনেকের ধারণা হরপ্পা সংস্কৃতিতে শ্রেণীবৈষম্য ছিল।

প্রত্যেক বাড়িতে একটা চারকোণা আঙিনা, দরজা, জানালা, তিন চারটে ঘর, একটা স্নানাগার ও রান্নাঘর ছিল। বাড়িতে প্রবেশ করার জন্য ছিল পাশের সরু গলি। রাস্তার ওপর কোন বাড়ির জানালা ছিল না। প্রত্যেক বাড়িতে কুয়ো ছিল। জল ও আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য ছিল অতি সুন্দর পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা। খুব সম্ভব পৌর প্রতিষ্ঠানের ওপর এর দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল।কোশাম্বী বলেছেন যে ভারতে আধুনিক যুগের আগে কোন শহরে এত সুন্দর পরিকল্পনা ছিল না।

হরপ্পায় একটি বাড়ির আঙিনার চারদিকে দুই ঘর বিশিষ্ট কয়েকটি যৌথ ঘরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। অনেকে এই ঘরগুলিকে শ্রমিকদের নিবাস বলে মনে করেন। এখানে

এক বিরাট শস্যাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আয়তন হল লম্বায় ১৬৯ ফুট × ১৩৫ ফুট। অনেকের ধারণা শ্রমিকদের এই শস্যাগারে নিযুক্ত করা হত। এ· এল· ব্যাসম একে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

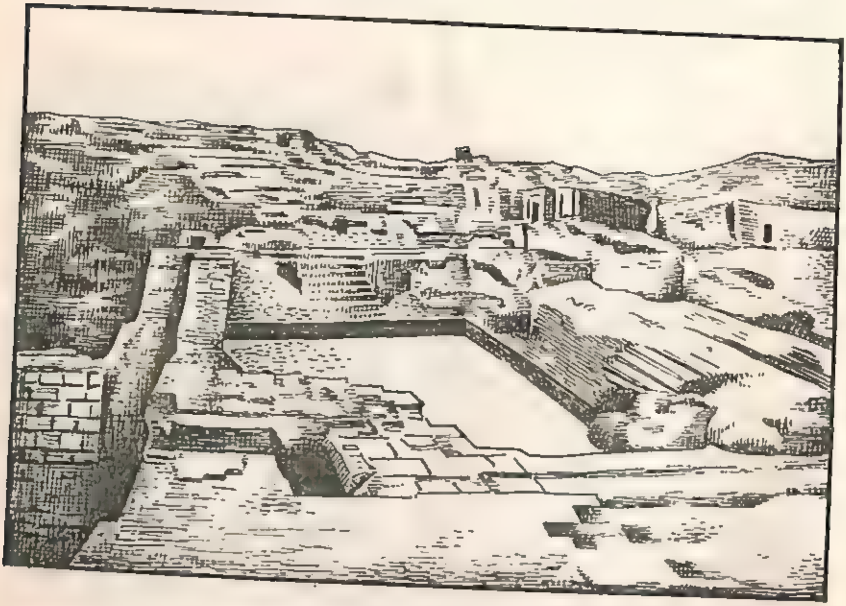

মহেঞ্জোদাড়োর স্নানাগার

নগর সভ্যতার সব থেকে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হল এক বৃহৎ স্নানাগার। এটি মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গেছে। এই স্নানাগারটি ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এর বাইরের দিকের আয়তন ছিল ১৮০ ফুট × ১০৮ ফুট। এর মাঝখানে স্নান করবার জলাধারটির আয়তন ছিল ৩৯ ফুট × ২৩ ফুট এবং গভীরতা ৮ ফুট। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন যে এই স্নানাগারটি পুণ্যার্থীদের জন্যে তৈরি হয়েছিল।

কালিবনগানে নগর-দুর্গকে ঘিরে এক বিশাল ইটের তৈরি দেওয়াল ছিল। হরপ্পা থেকে যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তার দেয়াল ছিল ১৩ মিটার চওড়া। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোথাল-এর বাড়িগুলি উঁচু মঞ্চের ওপর তৈরি করা হয়েছিল।

এখানকার জল-নিকাশীর ব্যবস্থা ছিল খুব উন্নত মানের। প্রতিটি বাড়িতে পোড়া ইটের তৈরি নালা দিয়ে জল বেরিয়ে এসে রাস্তার পয়ঃপ্রণালীতে পড়ত। রাস্তায় নর্দমাগুলি পাথরের ঢাকনা দিয়ে চাপা দেওয়া হত। রাস্তার মাঝে যাতে আবর্জনা না জমে তার জন্যে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা ছিল। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন মহেঞ্জোদড়োয় প্রোটোঅস্ট্রোলয়েড়, আলপিনিয়ড, মেডিটারেনিয়ান এবং মঙ্গোলয়েড় এই চার জাতির মানুষ বাস করত। সেদিক থেকে শহরটি ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন।

সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবন (Social, religious and economic life in Harappan Civilisation) ঃ

হরপ্পাবাসীদের জীবনযাত্রার পুনর্গঠনে কেবলমাত্র প্রাপ্ত শীলমোহর ছাড়া অন্য কোন উপকরণ আমাদের হাতে নেই। এই শীলমোহর ও সমসাময়িক সুমেরীয় সভ্যতার উপকরণগুলি পরীক্ষা করে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা হয়েছে যে হরপ্পাবাসীরা কৃষি, শিল্প ও

মহেঞ্জোদড়োর সীলমোহর

বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। শহরের বাইরে বিরাট এলাকা জুড়ে ছিল কৃষকদের গ্রাম ও শস্য ক্ষেত্র। উর্বরা জমি ও তার ফসল ছিল এই সভ্যতার সম্পদ। তাদের প্রধান খাদ্য-শস্য ছিল গম, যব ও নানাধরনের বাদাম। ধানের চাষ হত কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। এছাড়া তারা মাছ, ভেড়ার মাংস, পাখির মাংস প্রভৃতিও খেত। এখানে খাদ্যের কোন অভাব ছিল না। নদীপথে খাদ্য আমদানি করা হত।

নাগরিকদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। অধিকাংশই ছিল স্বচ্ছল ব্যবসায়ী। অনেকের ধারণা হরপ্পা ছিল প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আবার অনেকে মনে করেন যে, সমগ্র সিন্ধু-অঞ্চলটি ছিল একটি সাম্রাজ্য এবং এক দক্ষ উদারনৈতিক পুরোহিত রাজা এর শাসন পরিচালনা করতেন।

হরপ্পায় একটি ছোট মূর্তি পাওয়া গেছে। সে যে পোশাক পরে আছে তার ওপরের দিকটা শালের মত, নিচের দিকটা ধুতির মত দেখায়। স্ত্রী-পুরুষের পোষাকে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তুলো এবং পশমের ব্যবহার জানা ছিল। সেকালে শহরগুলিতে বস্ত্র বয়ন একটি বিরাট শিল্প ছিল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরত। সোনা, রুপো, দামী পাথর ইত্যাদি দিয়ে এই অলঙ্কার (আংটি, গলার হার, কঙ্কণ) তৈরি হত।

নাগরিকদের একটি বড় অংশ ছিল শিল্পী ও কারিগর। এ যুগে লোহার ব্যবহার জানা ছিল না। তাই গৃহস্থালীর নানা ধরনের জিনিসপত্র তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হত। কুঠার, বর্শা, তীর-ধনুক ঢাল, কাস্তে, সূঁচ, চিরুনি প্রভৃতি হরপ্পার অন্যতম ধাতুশিল্প ছিল। মৃৎ-শিল্পের মধ্যে কলসী, জালা, থালা, বাটী ও খেলনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে মজবুত করা হত। পোড়ামাটির তৈরি শীলমোহর ছিল এ যুগের শিল্পের সব থেকে বড় আকর্ষণ।

বাণিজ্য ছিল হরপ্পাবাসীদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। তাই ভারতের ভিতরে ও বাইরে বিশেষ করে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতে কাশ্মীর, মহীশূর ও নীলগিরি অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যের কথা জানা যায়। সিন্ধুর নগরগুলি থেকে রপ্তানি করা কাপড়ের গাঁটে সিন্ধুর সীলমোহর লাগান সমেত মেসোপটেমিয়ার উম্মাতে পাওয়া গেছে। লোথালে একটি জাহাজঘাট আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয়, সমুদ্রপথে এই বাণিজ্য চলত। আবার, মেসোপটেমিয়ার কিছু সীল সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গেছে।

হরপ্পার জীব-জন্তুর মূর্তিগুলির মধ্যে মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাতি, গণ্ডার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহেঞ্জোদড়োতে যে কঙ্কালটি পাওয়া গেছে তা ঘোড়ার কি-না সে সম্পর্কেযথেষ্ট সন্দেহ আছে। সীল-এর ওপর খোদাই করা ছবিগুলির মধ্যে কুঁজবিশিষ্ট ষাঁড়, মহিষ ও বাইসন সর্বোৎকৃষ্ট। ষাঁড়টি তেজী, বাইসনটিও জীবন্ত ও মহিষটি দৃষ্টিগ্রাহ্য।

এই অঞ্চলে মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল কি-না সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। অন্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি যা থেকে আমরা হরপ্পাবাসীদের ধর্মীয় মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। এখানে অনেক নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। এরা সকলেই দাঁড়ানো ও অর্ধনগ্না। অনেকে এই মূর্তিগুলিকে মাতৃপূজার প্রতীক হিসেবে মনে করেন। পুরুষ দেবতাদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল একটি সীলমোহরের ওপর যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যানস্থ মূর্তি। এঁর তিনটি মুখ, তিনটি মাথা ও তিনটি শিং আছে। তিনি জীবজন্তুর দ্বারা বেষ্টিত। জন মার্শাল এই মূর্তিটিকে শিবের মূর্তি বলে মনে করেন। পশুদ্বারা বেষ্টিত বলে তিনি পশুপতি ; আবার মাথার শিংকে যদি ত্রিশূলের সঙ্গে অভেদ মনে করা হয় তবে এই মূর্তিটি হল যথার্থ শিবের। এছাড়া

পশুপতির মূর্তি

শিবলিঙ্গের আকৃতির কিছু পাথর পাওয়া গেছে। এ থেকে কেউ কেউ মনে করেন যে, হরপ্পাবাসীগণ শৈবধর্মে বিশ্বাসী ছিল। এখানে অনেক পোড়ামাটির মাতৃকামূর্তি পাওয়া গেছে। সুতরাং হরপ্পাবাসীরা যেমন শিবপূজা করত, তেমনি মাতৃপূজারও আরাধনা করত। আবার, একই সঙ্গে তারা গাছ, নদ-নদী প্রভৃতি প্রকৃতিদেবীরও পূজা করত। মৃতদের কবর দেবার ব্যবস্থা ছিল।

অধ্যাপক শাঙ্খালিয়া মনে করেন হরপ্পাবাসীরা প্রথম ছত্র ডান থেকে বাঁদিকে, আর পরের ছত্র বাঁদিক থেকে ডান দিকে লিখত। এই লিপিগুলি ছিল চীনদেশের চিত্রলিপির মত। এখন পর্যন্ত এই লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে অন্যান্য সংস্কৃতির সম্পর্ক (Relations with other Cultures in outside world) ঃ একসময় পণ্ডিতেরা মনে করতেন যে, ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা হল বৈদিক সভ্যতা। কিন্তু হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পর সে ধারণা এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। আবার যাঁরা মনে করেন হরপ্পা সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা একই জাতিগোষ্ঠীর সৃষ্টি, তাঁরাও দৃঢ়ভাবে তাঁদের যুক্তি পরিবেশন করতে পারেন নি পক্ষান্তরে, জন মার্শাল প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ কয়েকটি অকাট্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার গুণগত পার্থক্য আছে। হরপ্পা সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক আর বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামীণ। হরপ্পাবাসীরা লোহার ব্যবহার জানত না, বৈদিক আর্যরা তামা, ব্রোঞ্জের সঙ্গে লোহার ব্যবহারও জানত। হরপ্পাবাসীরা ষাঁড়ের পূজা করত। বৈদিক আর্যরা গরুর পূজা করত। এই ধরণের বহু বৈসাদৃশ্য উভয় সংস্কৃতির মধ্যে বর্তমান।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন সুমেরীয়দের সৃষ্টি। তাঁরা বলেন হরপ্পা ও সুমের উভয় দেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলত। উভয়দেশের লোকেরা মাতৃ-দেবতার পূজা করত। উভয় দেশের নগর পরিকল্পনা, চিত্রলিপি, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ একই ধরনের। প্রাচীন সুমেরে, সিন্ধু উপত্যকার বহু সীলমোহর পাওয়া গেছে। সিন্ধু শহর থেকে সুমের ও পশ্চিম-এশিয়ার অন্যান্য শহরে সূতীবস্ত্র রপ্তানি হত। সিন্ধুর শীলমোহরযুক্ত কাপড়ের গাঁট পশ্চিম-এশিয়ার উম্মা শহরে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে দুই সভ্যতার মধ্যে সাদৃশ্য থেকে বৈসাদৃশ্যই বেশী। সিন্ধুলিপি সুমেরীয় চিত্রলিপি থেকে পৃথক। সিন্ধু উপত্যকায় পোড়ামাটির ইটের ব্যবহার বেশি ; কিন্তু সুমেরে কাঁচা মাটির ইটের ব্যবহার বেশি। কারও কারও মতে সুমেরীয় জাতি সিন্ধু অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে নগরের পত্তন করে।

কোন কোন পণ্ডিতদের মতে প্রাচীন মিশরীয়দের সঙ্গে হরপ্পাবাসীদের সংস্কৃতিগত কিছু সম্পর্ক ছিল। উদাহরণস্বরূপ তারা উল্লেখ করেন যে, মিশরীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ কাঠের টুল, দীপাধার প্রভৃতি সিন্ধুদেশে পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক গরডন চাইল্ড বলেছেন, সুমেরীয় ও সিন্ধুসভ্যতার মধ্যে বৈষম্য অনেক। তবে একথা ঠিক যে একই ভাবধারা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ওপর দুই সভ্যতাই বিরাজ করেছিল।

যে সব ঐতিহাসিক মনে করেন যে হরপ্পা সংস্কৃতির স্রষ্টা হল দ্রাবিড় জাতি, তাদের যুক্তিগুলি মোটামুটি এইরকম ঃ বেলুচিস্তানের পাহাড়ে ব্রাহুই নামে যে উপজাতি বাস করে তাদের মাতৃভাষা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ধর্মের দিকে শিবপূজা, শক্তিপূজা ও লিঙ্গপূজা উভয় সভ্যতার মধ্যেই প্রচলিত ছিল। আধুনিককালে দক্ষিণ-ভারতীয়দের মধ্যে প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড এবং মেডিটারেনিয়ান এই দুই জাতিগোষ্ঠীর মিশ্রণ দেখা যায়। হরপ্পা সংস্কৃতিতে জাতিগতভাবে এই দুইটি শ্রেণীই প্রাধান্যলাভ করেছিল। ভারতে প্রাক-আর্য যুগে একমাত্র দ্রাবিড়দের উন্নতমানের সভ্যতা ছিল। সুতরাং অনেক ঐতিহাসিক দ্রাবিড়দেরই হরপ্পা সংস্কৃতির জনক হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে, যতদিন লিখিত উপকরণের অভাব থাকবে, উত্তরও অমীমাংসিত থেকে যাবে।

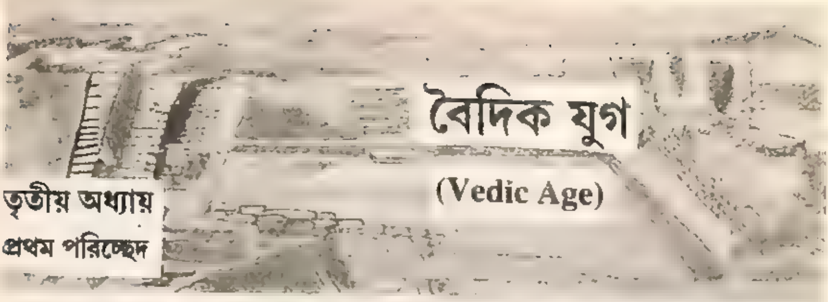

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈদিক যুগ

(Vedic Age)

(ক) আর্য (The Aryans)—তাদের আদি বাসস্থান (Original Homeland) ঃ ভারতে তাদের প্রথম সাহিত্য গ্রন্থ—ঋক্-বেদ। (Their first literary work in India—The Rig-Veda.)

'আর্য' বলতে সাধারণত আমরা একটি বিশেষ জাতি বা জাতিগোষ্ঠীকে বুঝি। প্রকৃতপক্ষে আর্য হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর নাম। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ স্যার উইলিয়ম জোন্স এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন—ল্যাটিন, জার্মান, গ্রীক, গথিক, সংস্কৃত, কেলটিক ও পারসিক ভাষা এক ও অভিন্ন মৌলিক ভাষাগোষ্ঠী থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যিনি এই ভাষাগোষ্ঠীর যে-কোন একটি ভাষায় কথা বলেন তিনিই আর্য। ম্যাক্সমূলারও মনে করেন যে, আর্য বলতে কেবলমাত্র ভাষা বোঝায়। তবে, ভারতীয়দের মতো পারসিকরাও আর্য শব্দটিকে জাতিবাচক অর্থেই ব্যবহার করত। পারস্য সম্রাট প্রথম দারায়ুস তাঁর সমাধির ওপর নক্সী—রুস্তম শিলালিপিতে (৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) নিজেকে একজন আর্য বলে উল্লেখ করেছেন।

ইতিহাসে যাদের আর্য হিসেবে বলা হয়েছে তাদের গায়ের রং হল ফর্সা, উন্নত নাসিকা, আয়ত চক্ষু ও তারা দীর্ঘাঙ্গী। তাদের আদি নিবাস সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেন নি। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল এই ভারতেরই মাটিতে। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ইউরোপে।

যাঁরা ভারতবর্ষকে আর্যদের আদি নিবাস বলে মনে করেন তাঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক পার্গিটার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, গঙ্গানাথ ঝা, ডি· এস· ত্রিবেদী ও এল· ডি· কাল্লা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রত্যেকে আলাদাভাবে মত বিনিময় করলেও সামগ্রিকভাবে তাঁদের মতটি মূলতঃ পুরাণ-নির্ভর। পুরাণে উল্লেখ আছে যে, আর্যরা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে আর্যরা ভারতে এসেছিল তার কোন উল্লেখ নেই। আবার, ঋক্‌বেদের নদীস্তুতিতে প্রথমে গঙ্গার, পরে যমুনার এবং তারপরে সরস্বতীর নাম পাওয়া যায়। বোঘজ কোয়ি লিপি থেকে অনুমান করা হয় যে, আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব-এর মধ্যেই আর্যরা বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। আর্যরা সপ্তসিন্ধুকে তাদের আদি বাসস্থান বলে মনে করত। খুব সম্ভবতঃ বৈদিক যুগ আরম্ভ হবার আগে তারা বহুবছর ধরে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বাস করত। ভারতের প্রায় সকল মুখ্য

ভাষাতেই সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋক্‌বেদ একমাত্র ভারতের মাটিতেই লেখা হয়েছিল। এ থেকে আর্যরা মূলতঃ ভারতেরই মানুষ বলে অনেকে মনে করেন।

যাঁরা মনে করেন আর্যদের আদি নিবাস ছিল ইউরোপে তাঁরা বলেন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাতটি ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ও পারসিক ছাড়া বাকি পাঁচটি ভাষাই ইউরোপের। এই ভাষাগুলিতে সমুদ্রবিষয়ক কোন শব্দ নেই। সুতরাং আর্যদের আদি বাসস্থান কোন সমুদ্রতীরে ছিল না। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে যে সব গাছপালা জন্মে যেমন ওক, বার্চ, উইলো প্রভৃতির সঙ্গে আর্যদের পরিচিতি ছিল। আর্যদের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশুপালন। গরু, ঘোড়া, ষাঁড়, ভেড়া ইত্যাদি পশুকে তারা পোষ মানিয়েছিল। সুতরাং আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল এমন দেশে যেখানে ঘোড়া চারণযোগ্য বিস্তীর্ণ স্তেপি, ভেড়া চরাবার জন্য উঁচু জমি, দুই-ই ছিল। এই সব বিচার করে ডঃ গাইলস্ মনে করেন যে, বর্তমান অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি-বোহেমিয়া ছিল আর্যদের আদি নিবাস। ডঃ এ· এল· ব্যাসম মনে করেন যে, পোল্যাণ্ড থেকে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত স্তেপি বা তৃণভূমি অঞ্চলে আর্যরা পশুচারণ করত। সুতরাং ঐ অঞ্চলটি ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। অধ্যাপক হার্ট (Hirt) মনে করেন আর্যরা ককেশাস পর্বত পার হয়ে পারস্যে প্রবেশ করে। বিশ্বকোষপ্রণেতাদের মতে আর্যরা কাস্পিয়ান সাগরীয় এবং দক্ষিণ-রাশিয়ার স্তেপি অঞ্চল থেকে অভিযান করেছিল। অধ্যাপক ব্রানডেনস্টাইন-এর মতে ইউরোপের উরাল পর্বতের দক্ষিণে খিরঘিজের তৃণভূমি অঞ্চল ছিল আর্যদের আদি নিবাস। এখান থেকে একটি শাখা পশ্চিম দিকে যায়। পরে এই শাখা দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগ ইরানে আর একভাগ ভারতে আসে। বেশির ভাগ ঐতিহাসিক ব্রানডেনস্টাইনের অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ঋক্‌বেদ (Rig-Veda) ঃ ঋক্‌বেদ আর্যদের সবথেকে প্রাচীন সাহিত্য। মূল ঋক্‌বেদে মোট ১০২৮টি স্তোত্র আছে। প্রথমে এই স্তোত্রগুলি লিখিত আকারে ছিল না। শিষ্যরা গুরুর কাছ থেকে শুনে মনে রাখতেন। তাই বেদের আরেক নাম শ্রুতি। হিন্দুরা বেদকে অভ্রান্ত ও অ-পৌরুষেয় বলে মনে করেন। পরবর্তী সময়ে মুখে মুখে রচিত স্তোত্রগুলি লিখিত আকারে প্রকাশ পায়। ঋক্‌বেদ ছাড়া অপর তিনটি বেদের নাম সাম, যজুঃ, অথর্ব। তবে ঋক্‌বেদের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার মনে করেন যে, কোন একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে ঋক্‌বেদ রচিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে ঋক্‌বেদের বিভিন্ন স্তোত্র রচিত হয়েছিল। তাঁর ধারণা ১২০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে ঋক্‌বেদের প্রধান স্তোত্রগুলি রচিত হয়েছিল। আবার, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বোঘোজকোয়ি ও তেল-এল-আর্মানা শিলালিপি থেকে ইন্দ্র, বরুণ, নাসাত্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতার নাম আমরা সর্বপ্রথম জানতে পারি। পণ্ডিতরা এই শিলালিপির কাল হিসেবে ১৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব অব্দটিকে অনুমান করেছেন। সেই দিক থেকেও ঋক্‌বেদের রচনাকাল ১৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব অব্দের মধ্যে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

S.C.E.R.T., West Bengal
Date ....
S.C.E.R.T., West Bengal Library

ঋক্‌বেদ সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এর সঙ্গে পারসিক ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্‌-আবেস্তা তুলনীয়। বৈদিক আর্যদের ইতিহাস পুনর্গঠনে ঋক্‌বেদের অবদান অপরিসীম। ঋক্‌বেদ শুধু ভারতের নয় পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সাহিত্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদিক সাহিত্য (Vedic literature) ঃ

পরবর্তী সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং সূত্র (Later Samhitas, Brahmans, Aranyakas, Upanishads and Sutras.) ঃ ইতিহাসে বৈদিক সাহিত্য বলতে চারটি বেদ ও বেদাঙ্গকে বোঝায়। প্রতিটি বেদের চারিটি অংশ আছে। যেমন সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ। বেদাঙ্গকে সূত্র-সাহিত্য বলা হয়। সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদের বহু স্তোত্র মূলতঃ ঋক্‌বেদ থেকেই নেওয়া হয়েছে। সংহিতাগুলি সবই পদ্যে লেখা হয়েছে। এতে স্তব-স্তুতি ও মন্ত্র আছে। সামবেদের স্তোত্রগুলি যজ্ঞের সময় গাওয়া হত। যজুর্বেদে যজ্ঞের মন্ত্রাদির উল্লেখ আছে। অথর্ব বেদে কিছু স্তব ও ইন্দ্রজাল বিদ্যারও বর্ণনা আছে।

ব্রাহ্মণ অংশগুলি গদ্যে লেখা। এতে যজ্ঞের নিয়মকানুন ও বেদমন্ত্রের টীকার উল্লেখ আছে। আরণ্যক ও উপনিষদে দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। আরণ্যকে ভক্তিধর্ম ও বাণপ্রস্থ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উপনিষদে মায়াবাদ, কর্ম ও মুক্তি বিষয়ে আলোচনা আছে। হিন্দুগণ কর্মফল ও পরজন্মে বিশ্বাসী—এর মূলমন্ত্র আমরা উপনিষদেই পাই। উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত। হিন্দুসমাজের গঠন ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের গুরুত্ব অসীম।

বেদাঙ্গে ছয়টি সূত্র ও ছয়টি দর্শন আছে। যজ্ঞের নিয়ম-কানুন ঠিকভাবে আয়ত্ত করবার জন্য ও বেদের স্তবগুলি ঠিকভাবে পাঠ করবার জন্য বেদাঙ্গ লেখা হয়।

ছয়টি সূত্র (Sutras) ঃ (১) **শিক্ষা ঃ** যার সাহায্যে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করে বেদ পাঠ করা হয় ; (২) **ছন্দ ঃ** যাতে বেদের স্তবগুলির পদবিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ; (৩) **ব্যাকরণ ঃ** যার সাহায্যে ভাষা শুদ্ধভাবে বলতে ও লিখতে পারা যায় ; (৪) **নিরুক্ত ঃ** যাতে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে মৌলিক নিয়মের উল্লেখ আছে ; (৫) **জ্যোতিষ ঃ** যাতে সৌর জগতের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও কাজ সম্বন্ধে আলোচনা আছে ; (৬) **কল্প ঃ** এতে যজ্ঞের নিয়ম-কানুন ও সমাজ পরিচালনার রীতি সম্বন্ধে জানা যায়। এই সূত্রটি বেদাঙ্গের সব থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। এতে আর্যদের সমাজ ও ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি অনুশাসন দেওয়া হয়েছে। এটি চারটি অংশ নিয়ে গঠিত—শ্রৌতসূত্র, শুল্বসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। একজন হিন্দু গৃহীর জীবনযাপনের নিয়ম ও তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের রীতির উল্লেখ আছে গৃহ্যসূত্রে। ঐতিহাসিক কে· এম· পাণিক্কর মনে করেন, 'It is this body of domestic ritual which makes a Hindu.' ধর্মসূত্রে সামাজিক রীতি-নীতি ও রাষ্ট্রশাসন সম্পর্কে অনুশাসনের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, বিষয় সম্পত্তি

সম্পর্কিত আইন প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা আছে। পরবর্তীকালে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, বৃহস্পতি স্মৃতি, নারদ স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই ধর্মসূত্রের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে লেখা হয়েছিল। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে এর মূল্য এমন কিছুই নয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতের সমাজ সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশনে সূত্র সাহিত্যের মূল্য অসীম।

বেদাঙ্গের ছয়টি দর্শন হল (১) সাংখ্য, (২) যোগ, (৩) ন্যায়, (৪) **বৈশেষিক**, (৫) **পূর্ব-মীমাংসা** (৬) **উত্তর-মীমাংসা**। কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কনাদ, জৈমিনি এবং ব্যাস যথাক্রমে ছয়টিদর্শনের রচয়িতা। বৈদিক সাহিত্য হল আর্যদের উন্নত মনীষার প্রতিফলন। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন রকম মাপের সঙ্গে তাদের সম্যক পরিচয় ছিল। শুল্ক সূত্রে জ্যামিতি সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের যথার্থ আলোচনা আছে। এ থেকে বোঝা যায় আর্যরা জ্যামিতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিল। চিকিৎসাবিদ্যাতেও আর্যদের যথেষ্ট অধিকার ছিল। তারা যে শারীরবিদ্যা ও ভেষজ বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা অথর্ব বেদ থেকে পাই। যজ্ঞ করতে হলে একটি বেদী তৈরি করতে হয়। কোথায় বেদীটি চতুর্ভুজ, আবার কোথায় ত্রিভুজ হবে, সে-সম্পর্কে আর্যরা পৃথিবীতে প্রথম আলোকপাত করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদিক সাহিত্যে জনজীবন (Life of the People as reflected in the Vedic literature)

(১) ঋক্‌বেদে বর্ণিত সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থা (Social, economic and religious life and political and administrative activities of the people as known from the Rig-veda) ঃ

সামাজিক অবস্থা (Social condition) ঃ আর্যদের সমাজ ছিল পরিবারভিত্তিক। পিতা ছিলেন পরিবারের প্রধান কর্তা। পরিবারের সকল ব্যক্তির সঙ্গে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পিতা, মাতা ও অন্যান্য পরিজন নিয়ে পরিবার গঠিত হত। পরিবারের প্রধানকে কখনও কখনও গৃহপতি অথবা দম্পতি নামে অভিহিত করা হত। বৈদিক সমাজে মূলতঃ একান্নবর্তী পরিবারের প্রাধান্য ছিল। গৃহপতি নিজে সমস্ত পরিবারের খাদ্য ও জামা-কাপড়ের যোগান দিতেন।

প্রাথমিক জীবনে আর্যরা ছিল যাযাবর। তারপর তারা স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করে। তাদের বাড়িগুলি সাধারণতঃ বাঁশ, খড় দিয়ে তৈরি হত। প্রতি বাড়িতে পোড়ামাটির তৈরী একটি করে অগ্নি গও থাকত।

আর্য সমাজে নারীর স্থান ছিল খুবই উচ্চে। পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী। নারীদের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল না। তাঁরা যথেষ্ট বিদ্যাশিক্ষা লাভ করতেন। এ যুগে বহু বিদুষী নারী ভারতীয় সমাজকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, মমতা প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে

অনেকেই বেদের বিভিন্ন স্তোত্র রচনা করেছিলেন। এঁরা একদিকে যেমন সাহিত্যচর্চা করতেন, অপরদিকে তেমনি অস্ত্রশিক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যাও আয়ত্ত করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এঁরা পুরুষের অনুগামিনী হতেন।

বৈদিক সমাজে বাল্যবিবাহ হত না। মেয়েরা একটি নির্দিষ্ট বয়স পার হলেই বিবাহযোগ্যা হত। স্বামী-নির্বাচনে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাজপত্য বিবাহের প্রচলন ছিল অর্থাৎ উভয়পক্ষের অভিভাবকরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পুত্র অথবা কন্যার বিবাহ দিতেন। এ ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর নিজেদের কোন ভূমিকা ছিল না। এ যুগে দৈব, আর্য, প্রাজপত্য, গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস, পৈশাচ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বিবাহের অনুমোদন ছিল। পুরুষরা কখনও কখনও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতেন। কিন্তু নারীরা কখনই একাধিক পতি গ্রহণ করত না। নারীদের নৈতিক চরিত্র অনেক উন্নতমানের ছিল। লোকে পুত্রসন্তান কামনা করত ; কিন্তু তাই বলে কন্যা সন্তান হলে তাকে কখনই অবহেলা করত না।

আর্যসমাজে নারী ও পুরুষের পোশাকে কোনও পার্থক্য ছিল না। প্রতিটি পোশাকের তিনটি করে অংশ ছিল ; উত্তরীয় (দেহের ওপরের অংশ), নিবি (নিম্ন অংশ) এবং অধিবাস (নিবির উপরের পরিধান)। সাধারণতঃ আর্যরা সূতী, পশম ও হরিণের চামড়া পোশাকের জন্য ব্যবহার করত। আর্য নারীরা সোনার গয়না পরতেন।

আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল যব, গম, দুধ, ঘি ও ফল। উৎসবে তারা ঘোড়ার ও ছাগলের মাংস খেত। আবার যজ্ঞের সময় তারা সোমরস পান করত। তবে সুরাপান সমাজে নিন্দনীয় ছিল। দুগ্ধবতী গাভীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল।

আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ হিসেবে নাচ, গান, দৌড়, শিকার, মুষ্টিযুদ্ধ, পাশাখেলা প্রভৃতি উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈদিক আর্যরা মূলতঃ তিনটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ঃ (১) রাজন্য বা যোদ্ধা (২) ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত (৩) সাধারণ মানুষ। এই শ্রেণীবিভাগ কিন্তু বংশানুক্রমিক ছিল না। এটি ছিল পেশাভিত্তিক। এক শ্রেণীর সঙ্গে আর এক শ্রেণীর বিবাহ আহারাদি এবং ধর্মগত কোন বিধিনিষেধ ছিল না। ঋক্‌বেদে যে বর্ণ শব্দটির উল্লেখ আছে তা কিন্তু জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বর্ণ কথাটি গায়ের রঙ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। যারা আর্য তাদের গায়ের রঙ গৌরবর্ণ আর যারা অনার্য তাদের গায়ের রঙ কালো। তবে ঋক্‌বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল কি-না এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। সংরক্ষণশীল পণ্ডিতরা বলেন বৈদিক যুগে আর্যরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি জাতিতে বিভক্ত ছিল। প্রমাণ হিসেবে তারা ঋক্‌বেদের দশমণ্ডলের 'পুরুষসূক্তের' উল্লেখ করেন। এতে বলা হয় "ব্রহ্মার মুখ হল ব্রাহ্মণ, বাহু হল ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হল বৈশ্য এবং তাঁর দুই পা থেকে জন্ম হয় শূদ্রের।" তবে অনেকেই মনে করেন ঋক্‌বেদের অন্তর্গত দশম মণ্ডলের এই শ্লোকটি মূল গ্রন্থ রচনার সময় লেখা হয়নি ; এটি পরবর্তীকালের সংযোজন। তাঁদের মতে ঋক্‌বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে কোন বংশানুক্রমিক জাতিভেদের প্রচলন ছিল না। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন।

আর্যরা তাঁদের জীবনধারাকে চারিটি পর্যায়ে ভাগ করেন। এটি ইতিহাসে চতুরাশ্রম নামে খ্যাত। সমাজের প্রথম তিন শ্রেণীর মধ্যে এটি প্রচলিত ছিল। প্রথম পর্যায়ের নাম ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম গার্হস্থ্য, তৃতীয় পর্যায়ের নাম বাণপ্রস্থ ও চতুর্থ পর্যায়ের নাম সন্ন্যাস। কিশোর বয়সে গুরুগৃহে থেকে সাহিত্য, ব্যাকরণ, বেদ প্রভৃতি বিদ্যাচর্চা করা ও ব্রহ্মচর্য পালন ছিল প্রথম আশ্রম। বিবাহ করে সংসার-ধর্মপালন করা ছিল দ্বিতীয় আশ্রম । প্রৌঢ় বয়সে সংসার-ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে বনে বাস করা ছিল তৃতীয় আশ্রম। সবশেষে ভগবানের চিন্তা করা এবং সন্ন্যাস জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা ছিল চতুর্থ আশ্রম।

অর্থনৈতিক জীবন (Economic life) ঃ ঋক্‌বেদে থেকে জানা যায় যে, আর্যদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন। রোমিলা থাপারের মতে আর্যরা প্রথমে পশুপালনকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে এবং পরে কৃষিকাজে মন দেয়। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে আর্যরা মূলতঃ ছিলেন কৃষিজীবী, পশুচারণ ছিল তাদের সহযোগী জীবিকা। ঋক্‌বেদে 'ব্রীহি' বা ধানের কোন উল্লেখ নেই। সেহেতু অনেকে মনে করেন যে যে আর্যরা হয়তো ধানের চাষ করত না। এর উত্তরে পণ্ডিতরা বলেন, ঋক্‌বেদে উল্লেখ আছে যে বৈদিক আর্যরা যবের চাষ করত। তাদের মতে 'যব' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ধানকেও বোঝাত। সে-যুগে গরুকে খুব মূল্যবান সম্পত্তি মনে করা হত। গরুর মূল্যকে একক ধরে অন্য দ্রব্যের মূল্য স্থির করা হত। সূত্রধর বা কাঠের মিস্ত্রীর কাজের খুব সমাদর ছিল।

বৈদিক যুগে আর্যসভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। খড়, কাঠ ও বাঁশ দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি হত। অনেকের ধারণা আর্যরা আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে স্ব-নির্ভর গ্রামীণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। গ্রাম ছিল অর্থনৈতিক জীবনের মৌলিক সোপান। নগর বা শহরের সঙ্গে আর্যদের কোন পরিচয় ছিল না। তবে ঋক্‌বেদ থেকে জানা যায় যে যুদ্ধের সময় আর্যরা 'পুর' নামে এক দৃঢ় ও মজবুত আবাসে আশ্রয় নিত। সে-যুগে চাষযোগ্য জমিতে গরুকে দিয়ে লাঙ্গল টানা হত। আধুনিক ঐতিহাসিকদের ধারণা আর্যরা লোহার তৈরি লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। জমিতে জলসেচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল।

অধ্যাপক কোশাম্বী মনে করেন যে, জমি ছিল গ্রামের সমষ্টিগত সম্পত্তি এবং উৎপন্ন ফসল গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। ধীরে ধীরে কিছু কিছু জমি গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের হাতে চলে যায় এবং এইভাবে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মনে করেন, আবাদের ও বাস্তুজমি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে। কিন্তু পশুচারণ জমি সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত।

ধাতুর তৈরি মুদ্রা এ-যুগে প্রচলিত ছিল না। তাই বিনিময় প্রথার মাধ্যমে জিনিস কেনাবেচা হত। ঋক্‌বেদে 'নিষ্ক', 'মনা', 'কার্যাপণ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 'নিষ্ক' কথাটির অর্থ হল সোনার তৈরি কোন অলঙ্কার। এটি কখনই মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হত না। 'মনা' মূলতঃ ব্যাবিলনের প্রাচীন মুদ্রা। অনেকে মনে করেন আর্যদের সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঋক্‌বেদে 'পানি' নামে

একশ্রেণীর দক্ষ বণিকের কথা জানা যায়। অনুমান করা যেতে পারে যে, এরা আন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। স্থলপথে রথ ও গরুর গাড়ি এবং জলপথে নদীর মাধ্যমে নৌকায় মাল চলাচল করত। আর্যরা সমুদ্রপথে বিদেশের সাথে বাণিজ্য করত কি-না এ সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে ঋক্‌বেদে 'শত অমিত্র' শব্দটির উল্লেখ আছে। এর অর্থ হল বহু দাঁড়যুক্ত নৌকা। এ-থেকে অনেকে মনে করেন আর্যরা হয়তো সমুদ্রপথে নৌকোর সাহায্যে বিদেশের সাথে বাণিজ্য করত। তবে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নিশ্চিত অভিমত দেওয়া যায় না। এ-যুগেই মিশ্র অংলীতির সৃষ্টি হয়। তবে সামগ্রিক ভাবে আর্যদের জীবনযাত্রায় কোন আড়ম্বর ছিল না।

ধর্মজীবন (Religious life) : আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋক্‌বেদ থেকে আমরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জানতে পারি। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির প্রকাশকে তারা পূজা করত। তারা মনে করত, কোন দৈবশক্তি প্রকৃতির অন্তরালে থেকে কাজ করে। তাদের প্রাথমিক দেবতাগণ পুরুষ ও আকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঋক্‌বেদে অসংখ্য দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ঐতিহাসিকদের ধারণা ঋক্‌বেদে একেশ্বরবাদের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। ঋক্‌বেদের স্তোত্রগুলি ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। এ যুগে নারীদেবতা থেকে পুরুষ দেবতার প্রতিপত্তি ছিল বেশি। নারী দেবতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **পৃথিবী, অদিতি, ঊষা, সরস্বতী** প্রভৃতি। আর্যরা প্রকৃতির মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করতেন। বৈদিক যুগের প্রথমদিকে আকাশের দেবতা বা পিতা ছিলেন **'দৌ'** আর মাতা ছিলেন **পৃথিবী**। ক্রমে ক্রমে এই সকল দেবতার জায়গায় স্থান করে নিলেন **ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ**। ইন্দ্রকে ঋক্‌বেদে কখনও পুরন্দর কখনও বা বৃত্রঘ্ন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর হাতে থাকত বজ্র। এই বজ্রের সাহায্যেই তিনি অসুরদের পরাজিত করেছিলেন। বজ্রের দেবতা ইন্দ্র কালে কালে আর্যদের প্রধান দেবতা হয়ে উঠেছিলেন। পরে তিনি বরুণের ক্ষমতা খর্ব করে দেবতাদের রাজ হিসেবে নিজেক প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পরেই ছিল অগ্নিদেবের স্থান। **মিত্র ও বরুণ** ছিলেন আকাশের দেবতা। **ইন্দ্র ও মরুৎ** ছিলেন বায়ুর দেবতা। **অগ্নি ও সোম** ছিলেন পৃথিবীর দেবতা। সূর্য ছিলেন আলোর দেবতা। পর্জন্য ছিলেন বৃষ্টির দেবতা।

দেবতাদের খুশি করার জন্য আর্যরা নিয়মিতভাবে যজ্ঞ করতেন। পুরোহিতরা ছিলেন এই যজ্ঞের হোতা। সাধারণতঃ যজ্ঞকুণ্ডে ঘি, মধু, যব প্রভৃতি উৎসর্গ করা হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজাগণ যজ্ঞের খরচ বহন করতেন ও ব্রাহ্মণগণ দান গ্রহণ করতেন। এই যজ্ঞে কখনও সন্তান-সন্ততি কামনা করা হত, আবার কখনও-বা শত্রুকে বিনাশ করার প্রার্থনা করা হত। পুরোহিতরাই ছিলেন এই সকল যজ্ঞের একমাত্র স্বীকৃত হোতা। সেহেতু ব্রাহ্মণ্য সমাজে পুরোহিতদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট বেড়ে যায় এবং কালে কালে এরাই সমাজে ও ধর্মের মাথা হয়ে দাঁড়ায়।

ঋক্‌বেদের কয়েকটি স্তোত্রে (শিবলিঙ্গ), কৃষ্ণ, শিশ্নদেব প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ থাকায় অনেকে অনুমান করেন যে, বৈদিক আর্যগণ লিঙ্গ পূজায় বিশ্বাস করতেন। বহু

দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও আর্যরা পৌত্তলিক ছিলেন না। ঋক্‌বেদে 'মন্দির' শব্দটির উল্লেখ না থাকায় আর্যদের উপাসনাগার সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা যায় নি।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী (Politcial and administrative activities) ঃ

ঋক্‌বৈদিক যুগে উত্তর-ভারত বা আর্যাবর্ত কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। আর্যরা ছিল যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তারা দ্রাবিড়দের সঙ্গে বিরামহীন যুদ্ধ চালিয়ে যায় আবার একই সঙ্গে এক বা একাধিক উপজাতি রাজ্য দখলের লোভে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হত। অনবরত যুদ্ধের কারণে আর্যদের মধ্যে কিছুটা শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয় তখন দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন দেখা দিল। এ যুগে নির্বাচিত রাজতন্ত্রের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে দেবতারা অসুর বিনাশ করবার জন্যে সকলে একমত হয়ে তাঁদের রাজা নির্বাচিত করেন।

রাজপদ ছিল মূলতঃ বংশানুক্রমিক। বিবদমান উপজাতির মধ্যে অনু, যদু, পুরু, তুর্ভস্, ভরত, সঞ্জয়, পঞ্চাল, মৎস্য খুব প্রতিপত্তিশালী ছিল। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য গোষ্ঠীর সকলে মিলে তাদের নেতা নির্বাচন করত। অনুমান করা যেতে পারে যে, যুদ্ধের সময় যিনি সব থেকে বেশি সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিতেন তিনিই গোষ্ঠী-নেতা নির্বাচিত হতেন। ক্রমে এই নেতা অশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রাজপদে অধিষ্ঠিত হতেন। বৈদিক রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে দাবি করেন। রাজ-পুরোহিত রাজাকে অভিষিক্ত করবার পর সরকারি ভাবে রাজপদ ও তাঁর অধিকার সম্পর্কে ঘোষণা করেন। এ যুগে রাজার সঙ্গে পুরোহিতেরও সার্বিক মর্যাদা দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। কোন কোন রাজার উপাধি ছিল 'সম্রাট্'।

বৈদিক রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল কুল বা পরিবার। পরিবারের প্রধানকে বলা হত 'কুলপ'। কয়েকটি পরিবার নিয়ে হত 'গ্রাম'। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে হত 'বিশ'। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত 'জন'। গ্রামের কর্তাদের বলা হত গ্রামণী, বিশ-এর কর্তাকে বলা হত 'বিশপতি' আর 'জন'-এর কর্তাকে বলা হত গোপ। বাস্তবক্ষেত্রে যিনি গোপ হতেন তিনিই সাধারণতঃ রাজা হতেন। তবে, 'বিশ' এবং 'জন'-এর মধ্যে পারস্পরিক কী সম্পর্ক ছিল সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। প্রশাসনিক দিক থেকে 'বিশ'-এর থেকে 'জন' বৃহত্তর একক ছিল।

রাজতন্ত্র এ যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা হলেও প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থারও অস্তিত্ব ছিল। এদেরকে বলা হত 'গণ', এবং এদের শাসককে 'গণপতি' বা 'জ্যেষ্ঠ' বলা হত।

সামগ্রিকভাবে রাজা ছিলেন প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। একটি উপজাতির একটি রাজ্য, এই ছিল প্রচলিত রীতি। সেইজন্য রাজ্যগুলি হত আয়তনে ছোট। রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করবার জন্য যে সব কর্মচারী নিযুক্ত হতেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সেনানী ও পুরোহিত। সৈন্য পরিচালনা ও যুদ্ধ বিগ্রহের দায়িত্ব পালন করতেন সেনানী। পুরোহিত একদিকে যেমন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রধান ছিলেন, তেমনি শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারেও রাজাকে উপদেশ দিতেন। ঋক্‌বেদ থেকে জানা যায়

যে, যুদ্ধের সময় পুরোহিত রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন। 'গ্রামণী'র উপর দায়িত্ব ছিল গ্রামের সামরিক ও অসামরিক কাজ দেখাশোনা করা। রাজা দূত ও গুপ্তচর নিয়োগ করতেন।

রাজার প্রধান দায়িত্ব ছিল উপজাতি ও তার সম্পত্তিকে রক্ষা করা, শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা ও আইন-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করা। রাজা একদিকে ছিলেন প্রধান প্রশাসক, আবার অন্যদিকে ছিলেন প্রধান বিচারপতি। এ যুগে গরু চুরি করা, জোর করে অপরের জমি ও সম্পত্তি দখল করা এগুলিকে অপরাধের চোখে দেখা হত। রাজা পুরোহিতের সাহায্যে ন্যায় বিচার করতেন। দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হত। অপরাধীকে ধরে আনার জন্য 'উগ্র' নামে একশ্রেণীর কর্মচারীর ওপর দায়িত্ব ছিল। কোন বিবাদের মীমাংসা করতে একজন মধ্যস্থ থাকতেন। তাঁর উপাধি ছিল 'গ্রাম্যবাদিন'।

রাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করত। তবে এদের গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অনেকের ধারণা 'সভা' ছিল গ্রাম্য-পরিষদ এবং 'সমিতি' ছিল জনপরিষদ। জার্মান অধ্যাপক লুডভিগের মতে সভা ছিল, "উপজাতির প্রধানদের নির্বাচিত পরিষদ ও সমিতি ছিল উপজাতির সর্বসাধারণের পরিষদ্।" তবে সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন যে, 'সমিতি' আকারে ও ক্ষমতায় 'সভা'র তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 'সমিতি'র অধিবেশনে উপস্থিত থাকা রাজা তাঁর অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করতেন। ঋক্‌বেদে জনসাধারণকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সকলে এক হয়ে সমিতির অধিবেশনে যায় ও একসুরে কথা বলে। অনুমান করা হয় যে, সভা ছিল বয়স্কদের প্রতিষ্ঠান। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, 'সভা' ছিল স্থানীয় পরিষদ এবং সমিতি ছিল কেন্দ্রীয় পরিষদ। ডঃ এ· এস· আলটেকার মনে করেন যে, প্রথম দিকে 'সমিতি' রাজার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করত। এর সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজা শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। পরে রাষ্ট্রের অয়তন বাড়লে সমিতির ক্ষমতা কমে যায়।

তাম্রফলকে লেখা প্রাচীন দান স্তুতি থেকে জানা যায় যে রাজা জমির মালিক ছিলেন না। জমি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে। প্রজারা রাজাকে দিতেন স্বেচ্ছামূলক 'কর'। এই কর বাধ্যতামূলক ছিল না।

আর্যদের গোষ্ঠীযুদ্ধের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল 'দশ রাজার যুদ্ধ'। একদিকে ভরত উপজাতির রাজা দিবোদাসের পুত্র সুদাস ; অন্যদিকে বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বে দশ উপজাতির দশজন রাজা। এ থেকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বোঝা যায়। ঋক্‌বেদে সেনাবাহিনীর 'চতুরঙ্গে'র উল্লেখ নেই। এ যুগে সেনাবাহিনীর তিনটি অঙ্গ ছিল ঃ পত্তি (পদাতিক) রথী এবং অশ্বারোহী। ঋক্‌বেদে চলমান দুর্গের উল্লেখ আছে। প্রধান অস্ত্রগুলির মধ্যে তীর, ধনুক, তরবারি ও বর্শার উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি লোহা দিয়ে তৈরি ছিল। শান্তির সময় সেনানীকেও অসামরিক কাজ করতে হত। তাঁর পদমর্যাদা গ্রামণীর থেকে উঁচু ছিল। ম্যাকডোনাল ও কিথ মনে করেন বৈশ্যদের নিয়ে বৈদিক যুগের সেনাবাহিনী গঠিত হত। তবে পরিচালনা করতেন ক্ষত্রিয় নেতারা।

(২) পরবর্তী বৈদিক যুগ (Later Vedic age) :

ইতিহাসে পরবর্তী বৈদিক যুগ বলতে ঋক্‌বেদের সমাপ্তিকাল এবং গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব-এর মধ্যবর্তী সময়কে বোঝায়। সাধারণভাবে ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়টিকে পরবর্তী বৈদিক যুগ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। এ যুগের ইতিহাস রচনার একমাত্র উপকরণ হল সাম্, যজুঃ ও অথর্ব বেদ, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য, উপনিষদ্ ও সূত্র সাহিত্য। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে সাম্প্রতিক কালের হস্তিনাপুরে প্রাপ্ত কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে মাটি খুঁড়ে যেসব নমুনা পাওয়া গেছে তা সাহিত্য উপকরণের তুলনায় খুবই দুর্বল। এখানে মাটির ও তামার তৈরি কিছু জিনিস এবং কাঁচা ইটের তৈরি বাড়ির কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপমহাদেশে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার (Expansion of Vedic culture in the sub-continent) :

ঋক্‌বেদে যে সকল ভৌগোলিক তথ্য আছে তা বিশ্লেষণ করলে আমরা অনুমান করতে পারি যে, ভারতে এসে আর্যরা প্রথমে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করে। পাঞ্জাবে বাস করার সময়েই ভারতে আর্য সভ্যতার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। এখানে একদিকে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ও বিভিন্ন উপজাতিদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ক্রমে তারা আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্যকে গ্রাস করে তাদের অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে চলল। পাঞ্জাব থেকে ক্রমশঃ পূর্বদিকে আরও ভেতরে এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে যমুনা ও গঙ্গানদীর অববাহিকায় তারা তাদের সভ্যতা বিস্তার করে।

পরবর্তী যুগের সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, আর্যরা উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। প্রথম দিকে তারা খুব ধীরে পূর্ব দিকে এগোতে থাকে। সমস্ত বনজঙ্গল পরিষ্কার করে অরণ্যগুলিকে বাসযোগ্য করে তোলে। রোমিলা থাপার মনে করেন যে, ঋক্‌বেদের যুগে আর্যরা দিল্লী পর্যন্ত তাদের বসতি বিস্তার করে। শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায় যে, আর্যরা গঙ্গা পেরিয়ে আরও পূর্বে তাদের বসতি বিস্তার করে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দের মধ্যেই গাঙ্গেয় উপত্যকা তাদের সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। ফলে কাশী, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মগধ (দঃ বিহার), অঙ্গ (পূঃ বিহার), বঙ্গ, আসাম এই সময় পর্যন্ত আর্য সংস্কৃতির বাইরে ছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে গঙ্গানদীর দক্ষিণ অঞ্চলের কোন উল্লেখ নেই এই সময়। এ থেকে অনুমান করেন যে, আর্যরা গঙ্গা তীর ধরে ভারতে অনুপ্রবেশ করেনি। তাঁদের ধারণা হিমালয়ের পাদদেশ দিয়ে আর্যরা ক্রমবিস্তার করে। বাংলাদেশে আর্য সংস্কৃতির বিস্তারে যথেষ্ট সময় লাগে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও বৌধায়ন ধর্মসূত্র পুণ্ড্র (উঃ বাংলা) ও বঙ্গ (পূঃ বাংলা)-কে বর্বর ও অনার্য বলে উল্লেখ করেছেন। মহাকাব্যের যুগে (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ থেকে ২য় শতক) বাংলাদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করে।

উত্তর ও পূর্ব-ভারত পুরোপুরি আর্যদের দখলে আসার পর আর্যরা দক্ষিণ-ভারতে তাদের সভ্যতা বিস্তারে সচেষ্ট হয়। তবে ঠিক কোন্ সময় থেকে আর্যরা দক্ষিণ-ভারতে সভ্যতা বিস্তার করে, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে কিংবদন্তী অনুসারে, ঋষি অগস্ত্য ছিলেন বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে আর্য সভ্যতার বিস্তারের পুরোধা। দক্ষিণ-ভারতে আর্য সভ্যতা যে পুরোপুরি বিস্তার লাভ করে নি তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, শবর, পুলিন্দ, অন্ধ্র প্রভৃতি অনার্য জাতি তাদের পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে আজও আর্য-সভ্যতার পাশে টিকে আছে।

এই যুগে আর্যদের বসতি বিস্তার লাভ করলে রাজ্যের ভৌগোলিক পরিধিও বেড়ে যায়। ফলে, রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা বেড়ে ওঠে। বড় বড় রাজ্যগুলি ক্ষমতা দখলের লড়াইতে লিপ্ত হয়। শক্তিশালী রাজারা কেবলমাত্র 'রাজন্' উপাধিতে সন্তুষ্ট নন, তাঁরা 'একরাট্', 'সম্রাট', 'সার্বভৌম' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করে রাজশক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে 'রাজসূয়' ও 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের সূচনা করেন। ক্ষত্রিয়রাই রাজা হতেন ; তবে এই রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নির্বাচিত রাজপদের উল্লেখ আছে। রাজা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি—এই মতবাদ আরও জোরালো হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে পুরোহিতের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ যুগে জমির ওপর রাজার অধিকার স্বীকৃত হয়। প্রজাদের থেকে 'কর' গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়। সেনানী ও গ্রামণী ঋক্-বৈদিক যুগের মতোই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হত। এককথায়, রাজার ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ। 'সমিতি'র ক্ষমতা এ যুগে কমে এলেও 'সভা'র ক্ষমতা কিছুটা বেড়ে যায়। কিন্তু 'সভা' কোন গণতান্ত্রিক সংস্থা ছিল না। উচ্চ রাজকর্মচারীদের নিয়ে গঠিত হত সভা। অনেকের মতে 'সভা' ছিল অভিজাতদের প্রতিষ্ঠান।

এ যুগেও আর্যরা মুখ্যতঃ গ্রামেই বাস করত। তবে 'পুর' বা নগরের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। এ যুগের সমাজে সব থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল নারীর মর্যাদা আগের তুলনায় অনেক কমে যায়। তাদের না ছিল কোন রাজনৈতিক অধিকার, না ছিল সম্পত্তিপ্রাপ্তির অধিকার। তবে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি বিদুষী নারী এ-যুগেই জন্মেছিলেন। জাতিভেদের কঠোরতা এ-যুগের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণরা নিজেদেরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে পরিচয় দিতেন। তাঁরাই হলেন সমাজের নেতা। যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই চারটি কাজ নিয়ে ব্রাহ্মণরা থাকতেন। এমনকি ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন জাতি এই চারটি কাজের অধিকারী ছিলেন না। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজকার্যের নেতৃত্ব দিতেন। আর্যদের সভ্যতার বিস্তারের ফলে ধীরে ধীরে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর বৈশ্যরা সামগ্রিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। এ ছাড়া, কৃষি, পশুপালন ও নানারকম শিল্পের কাজে তারা নিযুক্ত থাকত। শূদ্র ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন উচ্চ বর্ণের দাস। অস্পৃশ্যতা ও সংকীর্ণতা এ-যুগ থেকেই শুরু হয়। বৃত্তি বা পেশাকে অবলম্বন করে জাতিভেদের সৃষ্টি হয়। এই চারিটি বর্ণ ছাড়াও এই যুগে ব্রাত্য ও নিষাদ নামে দুটি নতুন জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকল আর্য কৃষির

বদলে পশুপালনকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল তারাই হল ব্রাত্য। আর নিষাদ ছিল অনার্য জাতি।

সাহিত্যের উপকরণ থেকে জানা যায় যে, আর্য সভ্যতা বিস্তৃতির ফলে এই যুগ থেকেই নাগরিক জীবনের সূচনা হয়। চাষের প্রক্রিয়ার উন্নতি হয়, কোন্ ঋতুতে কোন্ শস্যের চাষ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে মানুষের পরিষ্কার ধারণা হয়েছিল। এ যুগে মানুষ লোহার তৈরি অস্ত্র দিয়ে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষির উপযোগী জমি তৈরি করত। লোহা ছাড়া সোনা, রূপা, তামা, টিন, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। ধাতুর তৈরি মুদ্রা তখনও প্রচলিত হয় নি। বিনিময় প্রথাই ছিল অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। 'কৃষ্ণল'—যার ওজন ছিল এক রতি এবং 'শতমান'—যার অর্থ হল সোনার বাট, কখনও কখনও মুদ্রার একক হিসেবে ব্যবহৃত হত। এ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব-ভারতে নেপাল এবং পশ্চিম-ভারতে তক্ষশিলা (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল)। ভারতের সঙ্গে মেসোপটেমিয়া ও পশ্চিম-এশিয়ার অন্যান্য দেশের নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এই বাণিজ্য সমুদ্রপথ দিয়েই চলত বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান।

ঋক্‌বৈদিক যুগে ইন্দ্র ছিলেন আর্যদের প্রধান দেবতা। পরবর্তী বৈদিক যুগে ইন্দ্রের স্থান অধিকার করেন রুদ্র ও বিষ্ণু। এই রুদ্রই পরে শিবে পরিণত হন। এ যুগে কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে ধারণা আরও দৃঢ় হয়। মানুষের পাপ-পুণ্য থেকে ভগবান বিষ্ণুই মুক্তি দিতে পারেন বলে এ যুগের মানুষের বিশ্বাস জন্মাল। সাহিত্যে, বিশেষ করে উপনিষদে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও ধর্মের আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। দার্শনিক তত্ত্বের প্রাধান্য এ যুগে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুধর্মের সংগঠনের মৌলিক তত্ত্ব এ যুগেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লৌহ যুগের সূচনা (Beginning of the Iron Age)ঃ ভারতে লৌহ যুগের সূচনা ঠিক কোন্ সময় থেকে হয়েছিল তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে হরপ্পা সভ্যতার পরে ভারতে লৌহ যুগের শুরু। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে খ্রীষ্ট জন্মের ১০০০ বছর আগে ভারতে লৌহ যুগের সূচনা হয়েছিল। বিবর্তনের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসান ও ঐতিহাসিক যুগের উন্মেষ—এই সময়েই লৌহ যুগের সূচনা হয়। অর্থাৎ নব্যপ্রস্তর যুগের পরেই লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। বলাইবাহুল্য, একই সময়ে একই সঙ্গে ভারতের সব জায়গায় লৌহ যুগের আবির্ভাব ঘটেনি। যেমন উত্তর-ভারতে নব্যপ্রস্তর যুগ এবং লৌহ যুগের মাঝখানে তাম্র যুগের সূচনা হয়েছিল। তেমনি দক্ষিণ-ভারতে নব্যপ্রস্তর যুগের পরেই হয় লৌহ যুগের সূচনা।

কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা, ঋক্‌বেদের যুগে ভারতে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। অধ্যাপক এ· এল· ব্যাসম মনে করেন যে, ঐ যুগে আর্যরা লোহার ব্যবহার জানত না। ঋক্‌বেদে 'অয়স্' শব্দটির উল্লেখ আছে। ব্যাসম বলেন এই 'অয়স' শব্দটি "ব্রোঞ্জ অথবা তামাকে" বুঝিয়েছে; লোহাকে নয়। যজুর্বেদে 'কালো ব্রোঞ্জের' উল্লেখ আছে। ব্যাসমের মতে এই 'কালো ব্রোঞ্জ' খুব সম্ভব লোহারই ইঙ্গিত করে। তবে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক অথর্ব বেদে পরিবেশিত তথ্যের ওপর নির্ভর করে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দে উত্তর-ভারতে লোহার ব্যবহার স্বীকার করে নিয়েছেন।

লোহা আবিষ্কারের ফলে আর্যরা কারিগরী যন্ত্র এবং লাঙ্গলের সাহায্যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষিকাজ বহুগুণে প্রসারিত করেছিল। ফলে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বেড়ে যায়। ফসল উদ্বৃত্ত হতে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটল। নানা ধরনের নগর গড়ে উঠতে লাগল। মহাকাব্যের যুগে লোহার প্রচলন ছিল, তবে যোগান বেশি ছিল না। দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজাদের রাজত্বকালে লোহার চাহিদা দারুণভাবে বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারতীয় লোহা বিদেশেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন
(Protest-Movement)

চতুর্থ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ (Social, economic and religious causes of the beginning of the movements protesting against the dominance of the age-old Vedic or Brahmanical Culture) ঃ

সামাজিক কারণ ঃ অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ঋক্‌বৈদিক যুগে জাতিভেদের কঠোরতা ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামি, অত্যাচার, সংস্কার, কঠোরতা-এর সবকিছুরই প্রতিফলন হয়েছিল পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের যুগে। উপনিষদের যুগ থেকে অথবা খ্রীষ্ট পূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ব্রাহ্মণ্য সমাজে নানারকম কঠোরতা দেখা দেয়। ব্রাহ্মণদের ধারণা হল তারা দৈব ক্ষমতার অধিকারী। এদিকে সমাজের অপর তিনটি জাতির ওপর তারা প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করল। সমস্ত আর্যসমাজ ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্যের প্রতিভূ হয়ে উঠল। দেশের শাসক ও যোদ্ধারা ছিলেন ক্ষত্রিয়। দেশরক্ষার দায়িত্ব এই ক্ষত্রিয় জাতির ওপর ন্যস্ত ছিল। সুতরাং তারা ব্রাহ্মণদের আধিপত্য মানতে রাজী হল না। ফলে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের প্রকাশ্য সংঘাত দেখা দেয়। ব্রাহ্মণরা নিজেদের 'দ্বিজ' বলে ঘোষণা করলেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ পৈতা বা 'উপবীত' ধারণ করলেন। তারা যাগযজ্ঞ ও পশুবলির অনুষ্ঠান যথেচ্ছ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। এইখানেই ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সব থেকে বড় সংঘাত। এর কারণ হল, সমাজে যাগ-যজ্ঞের হোতা ছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। কিন্তু এই যাগ-যজ্ঞের পর একটি দানপর্বের ব্যাপার থাকত। এই দানপর্বের যাবতীয় খরচ বহন করতেন ক্ষত্রিয় রাজারা। তাই এই ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞের তারা বিরোধী ছিল। দেখতে দেখতে অন্য দুই বর্ণ বৈশ্য ও শূদ্ররাও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের শিকার হয়ে উঠল। আর্যসমাজ পরিষ্কারভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। একদিকে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত সম্প্রদায়, অন্যদিকে অ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের মধ্যে আর্যরা পূর্বভারতে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার লাভ করে। মধ্যদেশ পর্যন্ত বা সরস্বতী নদীর অববাহিকা থেকে প্রয়াগ বা এলাহাবাদ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগটি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। কিন্তু আর্যরা যখন পূর্ব-ভারতে সভ্যতা বিস্তারে মনদেয়, তখন প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে সেখানে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে। এক কথায়, এই পূর্ব-ভারতে ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রায়শঃই যুদ্ধ হত। এই অঞ্চল বরাবরই ক্ষত্রিয়প্রধান। শুরু হল ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

আন্দোলন। নেতৃত্ব দিলেন ক্ষত্রিয় বংশজাত দুই মহান ধর্মপ্রবক্তা ঃ গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর জৈন।

অর্থনৈতিক কারণ ঃ আর্যরা যখন একের পর এক রাজ্য জয় করে সমগ্র উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছে, তখন তারা পশুপালনের জীবিকা ছেড়ে কৃষিকাজে মন দেয়। এর ফলে কৃষির ফলন বেড়ে যায়। প্রয়োজনের তুলনায় ফসল উদ্বৃত্ত হতে লাগল। সাধারণ গৃহপতি এযুগে বিত্তশালী হিসেবেপরিগণিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার ঘটল। শিল্পের উন্নতি হল। এদিকে লোহার যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কারিগর, যেমন কর্মকার, ছুতোর মিস্ত্রী প্রভৃতি শিল্পীরা সমাজে যথেষ্ট চাহিদা মেটাতে লাগল। ফলে সাধারণ অ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এমনকি, শূদ্ররাও আগের তুলনায় অনেক বেশি ধনশালী হয়ে উঠল। এই যুগেই সৃষ্টি হল এক বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায়ের। ইতিহাসে এই বণিক সম্প্রদায় 'শ্রেষ্ঠী' নামে পরিচিত। একদিকে সঙ্গতিপন্ন গৃহপতি আর একদিকে শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় আর্যসমাজে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হল। কিন্তু ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজে তারা ছিল নিচু জাতের মানুষ। তাই তাদের অধিকার ব্রাহ্মণরা স্বীকার করল না। ফলে এই নিপীড়িত ও ন্যায্য অধিকারথেকে বঞ্চিত মানুষ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বণিকরা সমুদ্রযাত্রায় পাড়িদেয়। এতে সমাজ অর্থনীতিতে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বয়ং বৌধায়ণ তার ধর্মশাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রাকে পাপ বলে বর্ণনাকরেছেন। নিঃসন্দেহে এটি সমাজের বণিক সম্প্রদায় বা বৈশ্য জাতির প্রতি এক নির্মম আঘাত। অবশ্য বৈশ্য জাতি বৌধায়ণের নির্দেশ মানতে রাজী নয়। ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজে জাতিভেদের কঠোরতার জন্যে এই বিত্তশালী শ্রেণী বৈদিক সমাজব্যবস্থার প্রতি প্রচণ্ড বিরূপ হয়। বৈদিক সমাজে দরিদ্র শ্রেণীকে সকল রকমের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রবক্তাগণ দরিদ্র নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষকে পরমাত্মার অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের বিশেষ অধিকার দিয়েছেন। ফলে বৈদিক ধর্মের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের পথ সুগম হয়।

ধর্মীয় কারণ ঃ উপনিষদের যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নিয়মনিষ্ঠার পরিবর্তে লৌকিকতার প্রয়োগ বেশি পরিমাণে দেখা দেয়। এ যুগে যাগযজ্ঞ ও পশুবলির অবাধ প্রয়োগ দেখা দেয়। আবার এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ উপাসক যাগযজ্ঞ ও পশুবলিকে পূজার অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করে না। তাদের মতে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রকৃত উপাসনার কোন সম্পর্ক নেই। মানুষ ইহলোকে যেমন কাজ করে, পরের জন্মে সে তেমন ফল পাবে—এই ধরনের বিশ্বাস খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দের আগেই বৈদিক সমাজে প্রচলিত হয়। তাদের বিশ্বাস, মানুষ কখনই কর্মফল থেকে রেহাই পেতে পারে না। যারা মনে করে যে, যাগ-যজ্ঞ করলে মানুষের পাপ স্খালন হয়, তারা মিথ্যাচারী ও বিভেদসৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত হত। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই কর্মফলকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না—জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল এ যুগের ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, 'নাবিক যেমন যাত্রী পারাপার করে জীবিকা অর্জনের জন্য নৌকো তৈরি করে, সেইরকম

ব্রাহ্মণগণ জীবিকা অর্জনের জন্য যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধি দেন।' প্রগতিশীল এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এই বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, মৃত্যুর পর জীবের আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন যে, দেহের ধ্বংস আছে, কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। এই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনের চাকা থেকে যাগ-যজ্ঞ মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। মানুষকে ইহ-জীবনেই হতে হবে নিষ্ঠাবান্ ও শুদ্ধাচারী। তবেই সে কর্মফল থেকে মুক্তি পেতে পারে। উপনিষদের এই চিন্তাধারা নিঃসনেদহে ব্রাহ্মণ-প্রধান প্রচলিত বৈদিক ধর্মের প্রতিকূল। খ্রীঃপূঃ ৬০০ অব্দে আজীবিক জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তাগণ সামগ্রিকভাবে উপনিষদের এই বাণী গ্রহণ করেন এবং তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারা প্রচলিত বৈদিক ধর্মমতকে অস্বীকার করে এক নতুন ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটায়। এই ধর্মমত মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজের বর্ণভিত্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক শোষণহীন, শ্রেণীহীন, বর্ণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অধিকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ.

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম (Jainism and Buddhism) ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে সমগ্র উত্তর-ভারত ও পূর্ব-ভারত যখন আর্য সমাজের জাতিভেদের কঠোরতার শিকার, তখন পূর্ব-ভারতে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্মের জন্ম হয়। উচ্চবর্ণের মানুষ নীচুবর্ণের লোকেদের ঘৃণা করত। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নীচু বর্ণের লোকেরা ছিল অস্পৃশ্য। ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজে পুরোহিতের নির্দেশ ছিল সর্বেসর্বা। সমগ্র আর্য সমাজ ছিল পুরোহিতদের অধীনস্থ। ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সমকালীন ভারতবর্ষে অসংখ্য ছোট বড় নতুন ধর্মমতের উদ্ভব হয়। এইসব ধর্মমতের মধ্যে প্রধান দুটি ধর্মমত হল জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম।

যাঁরা পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের ধর্মমত মেনে চলেন তাঁদের বলা হয় জৈন। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, তাদের ধর্ম যাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে সেজন্য প্রাচীনকাল থেকে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত মোট চব্বিশ জন ধর্মপ্রচারক পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। এই ধর্মপ্রচারকগণকে 'তীর্থংকর' বলা হয়। প্রথম বাইশ জন তীর্থংকরের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ২৩তম তীর্থংকর ছিলেন পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ। তিনিই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে জৈন শাস্ত্রকার ভদ্রবাহু কিছু তথ্য রেখে গেছেন। ২৪তম বা সর্বশেষ তীর্থংকর ছিলেন বর্ধমান বা মহাবীর। ভদ্রবাহুর রচনা থেকে জানা যায় যে পার্শ্বনাথ ছিলেন বেনারসের রাজা অশ্বসেনের পুত্র। কিংবদন্তী আছে যে তিনি মহাবীরের ২৫০ বছর আগে জন্মেছিলেন। তবে বর্ধমান মহাবীর ইতিহাসের দিক থেকে প্রথম তীর্থংকর না হলেও তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভারতে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

পার্শ্বনাথ ত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগী হন। তারপর কঠোর তপস্যা করে তিনি শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি মানবসমাজকে চারটি পথ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাকে বলে 'চতুর্যাম'। সেই চারটি পথ হল ঃ (১) অহিংসা (২) সত্য (৩) অচৌর্য (৪) অপরিগ্রহ। প্রকৃতপক্ষে পার্শ্বনাথই জৈন ধর্মমতের মৌলিক তত্ত্ব

রচনা করেন। মহাবীর এই চারটি পথের সঙ্গে একটি নতুন পথ যোগ করেন ঃ তা হল (৫) ব্রহ্মচর্য।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, জৈনধর্ম মূলতঃ একটি প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন। সুতরাং এর মৌলিকত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে যেহেতু জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই উপনিষদের যুগের অব্যবহিত পরেই আবির্ভূত হয়েছে সেহেতু উভয় ধর্মমতে মূল উপকরণ হল উপনিষদ।

জীবে প্রেম বা অহিংসা জৈন ধর্মের মূলনীতি। এখানে জীব বলতে কেবলমাত্র সচল প্রাণীকেই বোঝায় না, গাছপালা, লতা-গুল্ম ও জড় বস্তুকেও বোঝায়। প্রাণীহত্যা জৈনধর্মে গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত। এমনকি, হিন্দু-ধর্মে শক্তি পূজাতে যে 'পশুবলি' দেওয়া হত, জৈনধর্ম মতে, সেটি দেখাও অপরাধ। পশুবলি কখনই কোন ধর্মের নির্দেশ হতে পারে না। যেহেতু সকল বস্তুতেই জৈনরা প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সেহেতু তাঁরা মূলতঃ নিরামিষাশী।হিন্দুধর্মের জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল জৈনরা বিশ্বাস করেন। কর্মফলের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য জৈন ধর্মে তিনটি রত্ন পালন করার নির্দেশ আছে। এই তিনটি রত্ন হল ঃ (১) সৎ বিশ্বাস (২) সৎ জ্ঞান ও (৩) সৎ আচরণ। সিদ্ধিলাভই হল জৈনধর্মের মূল লক্ষ্য। তাই তিনটি রত্ন পালন করলে প্রতিটি মানুষ হবে সিদ্ধিশীল। মহাবীর বলে গেছেন যে আমাদের ইহকালের জীবনকে পাপমুক্ত করবার জন্যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন। নীরম্বু উপবাস থেকে শরীরকে কষ্ট দিয়ে তপস্যা করলে মানুষ অবশ্যই মুক্তি পাবে। কোন বস্তুর ওপর লোভ করা পাপ। আসক্তি ধর্মপথে সব থেকে বড় বাধা। সেইজন্যে আসক্তি ছেড়ে সংযমী ও সর্বস্বত্যাগী হতে হবে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জৈন ধর্মগুরু ভদ্রবাহু কোন সুস্পষ্ট ধারণার কথা বলেন নি। তবে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে জৈনরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা করেন নি। সরল, অনাড়ম্বর ও অমিতব্যয়িতা জৈন ধর্মের অন্যতম প্রধান নীতি।

প্রথম দিকে জৈনধর্ম মূলতঃ মগধ (দক্ষিণ বিহার), কোশল (অযোধ্যা), বিদেহ (উত্তর বিহার) এবং অঙ্গ (পূঃ বিহার) প্রভৃতি রাজ্যগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে এই ধর্মমত গুজরাট, কাথিয়াওয়াড়, মাড়ওয়ার, পশ্চিম-মালব, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু প্রায় একই সময়ে পূর্ব-ভারত থেকে জৈনধর্ম বিলুপ্ত হতে থাকে। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে খুব সম্ভব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই সর্বপ্রথম জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। মৌর্য শাসনকালে জৈন ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীরা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। একটি সম্প্রদায় ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে বসতি করেন। অপর সম্প্রদায় স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে উত্তর-ভারতে বাস করতে থাকেন। ভদ্রবাহু মহাবীর প্রবর্তিত অনুশাসন কঠোর ভাবে মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রবক্তা। আর স্থূলভদ্র ছিলেন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রবক্তা। যাঁরা দিগম্বর সম্প্রদায়ের লোক, তাঁরা কোন পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করতেন না। তাঁরা ছিলেন পুরোপুরি নগ্ন। আর যাঁরা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের লোক তাঁরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতেন। তবে একথা ঠিক যে, জৈনরা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও মূল বিষয়ে তাঁরা এক ও অভিন্ন।

পরবর্তীযুগে পাটলিপুত্রে এক মহাসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় জৈন ধর্মমতের বারোটি অনুশাসন গ্রহণ করা হয়। এর নাম হয় দ্বাদশ অঙ্গ। এর কিছুকাল পরে বলভীতে আর একটি মহাসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে আগের অনুশাসনগুলির কিছু সংশোধন করে নতুন বারোটি অনুশাসন যোগ করা হয়। একে বলা হয় **দ্বাদশ উপ-অঙ্গ**।

পরবর্তীকালে জৈনরা হিন্দুধর্মের মূলনীতিগুলি মেনে নিয়েছেন। এর ফলে জৈনধর্ম সাধারণের কাছ থেকে দূরে সরে যায় নি। আজও ভারতবর্ষের বিরাট সংখ্যক মানুষ জৈনধর্মে বিশ্বাষী।

বৌদ্ধধর্ম (Buddhism) ঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতা, সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে যে প্রতিবাদী আন্দোলনের উদ্ভব হয় তার মধ্যে প্রধানতম ছিল বৌদ্ধধর্ম। জৈনধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মও পূর্ব-ভারতেই জন্ম নিয়েছিল। ঐতিহাসিক ওল্ডেনবার্গ মনে করেন যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের কয়েক'শ বছর আগেই ভারতীয় চিন্তাজগতে এমন অগ্রগতি ঘটেছিল যার ফলে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

উপনিষদের যুগে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যকে ক্ষত্রিয়গণ পুরোপুরি মেনে নিতে পারে নি। মানুষের প্রতি মানুষের চরম অবহেলা, জাতিভেদের চরম নিষ্ঠুরতা এগুলি তখনকার জনসমাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। পশ্চিমে সবস্বতী নদীর অববাহিকা থেকে পূর্বে প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজব্যবস্থার করতলগত। একমাত্র ব্যতিক্রম হল পূর্ব-ভারত। এইখানেই জন্মেছিলেন জৈনধর্মের প্রবক্তা বর্ধমান মহাবীর আর তারই সঙ্গে আবির্ভূত হন আর এক প্রতিবাদী ধর্মমতের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ। উভয়ের ধর্মমত মূলতঃ উপনিষদেরই বাণী থেকে গৃহীত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধদেব ও মহাবীরের জীবনী ও বাণী ঃ (Lives and teachings of Buddha and Mahavira) ঃ

মৌর্যসম্রাট অশোকের রুম্মিণীদেয়ি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু রাজ্যের অন্তর্গত লুম্বিনী গ্রামে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। একসময় তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ ছিল। কিন্তু এখন সাধারণভাবে প্রায় সব ঐতিহাসিকই ৫৬৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দকে গৌতম বুদ্ধের জন্ম তারিখ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও বাণী সম্পর্কিত মৌলিক উপাদানগুলি হল ঃ (১) **সুত্তনিপাত** (২) সিংহলী ইতিবৃত্ত **দীপবংশ** ও **মহাবংশ**।

এই সমস্ত সূত্র থেকে জানা যায় যে, গৌতম বুদ্ধের নাম ছিল শুদ্ধোদন এবং মায়ের নাম ছিল মায়াদেবী। পিপ্পলিবনে যে শাক্য জাতি বাস করত তার একটি গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। সুতরাং গৌতম ছিলেন শাক্য-বংশীয় রাজপুত্র। খুব ছোটবেলায় গৌতমের মা মারা যান। সেহেতু তিনি তাঁর মাসীর কাছে মানুষ হন। মাসীর নাম ছিল প্রজাপতি গৌতমী। এই জন্যই তাঁর নাম হয় গৌতম। শাক্যরা জাতি হিসেবে ছিল ক্ষত্রিয়। গৌতমের আর একটি নাম ছিল সিদ্ধার্থ।

প্রাচীন যুগে কোন একটি রাজপরিবারের সদস্য যেভাবে মানুষ হত গৌতমও সেভাবে

রাজপ্রাসাদের ভেতরে অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত হতে লাগলেন। কিন্তু জীবনের প্রথম থেকেই তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধার্থ ছিলেন একনিষ্ঠ ভাবুক। তিনি রাজার ছেলে অথচ পরদুঃখে কাতরতাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

গৌতম বুদ্ধ

সিদ্ধার্থের বয়স যখন ষোল বছর তখন, যশোধরা বা গোপা নামে এক বালিকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সিদ্ধার্থের বয়স যখন ২৯ বছর তখন তিনি পিতা হলেন। পুত্রের নাম রাহুল। এবার তিনি ভাবলেন যে, নিজেকে আর সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ রাখবেন না। তাই তিনি এক গভীর রাতে রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দি পেরিয়ে বাইরের জগতে চলে এলেন। এরই মধ্যে তিনি এক জরাগ্রস্ত রোগী, একটি মৃতদেহ এবং সবশেষে একজন সন্ন্যাসীকে দেখে কেবলই চিন্তা করতে লাগলেন যে, কোন মানুষই জরা, দুঃখ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত নয়; অথচ মানুষ যদি তার কামনা-বাসনা থেকে নিবৃত্ত থাকে তাহলেই সকল দুঃখের অবসান ঘটতে পারে। আর এই কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হচ্ছে সন্ন্যাসীরা। তাই

সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণে ব্রতী হলেন। তাঁর ঐ সংসার ত্যাগকে বলা হয় **মহানিষ্ক্রমণ**।

কিছুদিন তিনি তাঁর সন্ন্যাসী-সঙ্গীদের নিয়ে উপবাসী থেকে কৃচ্ছ্রসাধন করেন। কিন্তু অচিরেই উপলব্ধি করেন এভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে না। অতঃপর তিনি গয়ার কাছে উরুবিল্ব গ্রামে অশ্বত্থ গাছের নিচে সাধনায় বসলেন। গৃহস্থকন্যা সুজাতা তাঁকে এক বাটি পায়েস দেন। তা গ্রহণ করে আবার তিনি আসনে ফিরে যান। দীর্ঘ বারো বছর সাধনার পর চল্লিশ বছর বয়সে গৌতম তাঁর সকল প্রশ্নের উত্তর পান। ঐ অশ্বত্থ গাছ বা 'বোধি বৃক্ষের' নীচে সাধনা করে দিব্যজ্ঞান লাভ করার জন্য তিনি 'বুদ্ধ' (পরম জ্ঞানী) বা 'তথাগত' (যিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন) নামে পরিচিত হন।

এবার তিনি বারাণসীর কাছে সারনাথে এসে তাঁর সন্ন্যাস জীবনের পাঁচ সতীর্থদের কাছে সর্বপ্রথম তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে এ ঘটনাকে **'ধর্মচক্র-প্রবর্তন'** নামে অভিহিত করা হয়। সারনাথের পর তিনি বিহারের অন্তর্গত "রাজগৃহে" আসেন। সেখানে মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিম্বিসারকে তিনি তাঁর ধর্মমতে দীক্ষা দেন। সারিপুত্ত ও মৌদ্গললায়ন নামে দুই ব্যক্তিকে তিনি দীক্ষা দেন। কপিলাবস্তুতে তিনি বাবা ও মা, স্ত্রী, দেবদত্ত প্রভৃতিকে স্বীয় ধর্মমতে দীক্ষা দেন। তাঁর মাসী গৌতমীর অনুরোধে তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের জন্য একটি আলাদা সম্প্রদায় গঠন করেন। তিনি শাক্য ও কালীয় এই দুই বিবাদমান উপজাতিকে পারস্পারিক বিবাদ থেকে রক্ষা করেন।

গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ধর্মমত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যেসব জায়গায় ধর্মপ্রচার করেছিলেন তার মধ্যে প্রধান হল পাটলিপুত্র, গয়া, নালন্দা এবং কোশল। একথা ঠিক যে, বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি মগধে স্থাপিত হলেও এর বিকাশ হয়েছিল কোশল রাজ্যে। কিংবদন্তী আছে যে, কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বয়ং বুদ্ধদেব এখানে একুশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন। কোশলের রানী মল্লিকা ছিলেন গৌতম বুদ্ধের শিষ্যা। কথিত আছে যে, বুদ্ধ বছরে আট মাস বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন। তিনি প্রাকৃত কিংবা পালি কিংবা অর্ধ-মাগধি ভাষায় তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন। সাধারণ মানুষ যাতে তাঁর ধর্মের সারকথা বুঝতে পারে তার জন্যে তিনি খুবই সহজ করে ধর্মমত প্রচার করতেন। বুদ্ধ দেহরক্ষার পূর্ব মুহূর্তে তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন, "সকল দেহের ক্ষয় হয়, জন্মের সঙ্গে মৃত্যু অনিবার্য; সুতরাং এই চক্রের হাত থেকে মুক্তির জন্যে নিরন্তর চেষ্টা চালাও।" আনুমানিক ৪৮৬ খ্রীঃপূঃ অব্দে আশি বছর বয়সে বুদ্ধদেব কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন।

বুদ্ধদেবের বাণী জানতে হলে আমাদের সব থেকে বড় উপকরণ হল বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র **'ত্রিপিটক'**। এটি পালি ভাষায় রচিত। এই ত্রিপিটক হল : (১) **বিনয় পিটক :** এতে আছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠ-র্জ বনসংক্রান্ত বিধান (২) **সূত্তপিটক :** এতে আছে বৌদ্ধধর্মের নৈতিক দিক নিয়ে আলে চনা (৩) **অভিধম্ম পিটক :** এতে আছে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক দিক। বৌদ্ধ দর্শনে পণ্ডিত রিস ডেভিড্ মনে করেন যে, বিনয় পিটকের সব বক্তব্যই বুদ্ধের নিজস্ব নয়।

বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য হল মানবজীবনে চারটি সত্যকে উপলব্ধি করা। সেগুলি 'আর্যসত্য' বলে পরিচিত। সেই চারটি সত্য হলঃ (১) অস্তিত্ব দুঃখের (২)

কামনা-বাসনাই অস্তিত্বের উৎস (৩) কামনা-বাসনার অবসান ঘটলে তবেই অস্তিত্বের অবসান ঘটবে। (৪) কামনা-বাসনার অবসানের জন্যে একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করতে হবে।

বুদ্ধদেব বিশ্বাস করতেন জন্মই মানবজীবনের দুঃখের কারণ। সেই দুঃখের উৎস পার্থিব ভোগতৃষ্ণা। এই তৃষ্ণাই মানুষকে মুক্তি দেবার বদলে বারবার তার জন্মান্তর ঘটায়। কাজেকাজেই তৃষ্ণার অবসান ঘটানো দরকার। আর তা হতে পারে যে উপায়ে তার জন্য তিনি আটটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ-অষ্টকই 'অষ্টপন্থা' বা 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলে অভিহিত। সেই আটটি মার্গ হল ঃ সৎ বাক্য, সৎ কার্য, সৎ জীবিকা, সৎ চেষ্টা, সৎ চিন্তা, সৎ সচেতনতা, সৎ সংকল্প ও সৎ দৃষ্টি বা সম্যক সমাধি।

ধর্মানন্দ কোশাম্বী অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রতিটি মার্গকে বিশ্লেষণ করে এর সামাজিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বুদ্ধ-প্রবর্তিত চারটি সত্যেরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি তাঁর বিশ্লেষণে বলেছেন যে, গৌতম বুদ্ধ যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করে সে-যুগের মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক নেতা। এর সব থেকে বড় প্রমাণ হল বুদ্ধের নির্দেশিত সঙ্ঘ ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক।

জৈনদের মতো বৌদ্ধরাও ছিল জীবের প্রতি ভালবাসা এবং অহিংসা পরম ধর্ম—উভয় নীতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল। বুদ্ধ বলতেন **'নির্বাণ' বা 'মোক্ষ'** লাভই প্রতিটি মানুষের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। 'নির্বাণ' বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায় সে-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবে বুদ্ধ স্বয়ং বলেছেন যে, নির্বাণ হল পার্থিব সকল বন্ধন থেকে মুক্তি এবং পুনর্জন্ম গ্রহণ না করা।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং কখনও কখনও ব্রাহ্মণ্য চিন্তার সঙ্গে এই ধর্মকে আপোস করতে হয়েছিল। এরই ফলস্বরূপ আমরা পরবর্তীকালে প্রাচীনপন্থী **'হীনযান'** ও নব্যপন্থী **'মহাযান'** এই দুটি ভাগে বিভক্ত বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব দেখতে পাই।

ঐতিহাসিক ওয়ার্ডার বলেছেন যে, বুদ্ধের অহিংসার একটি বিরাট সামাজিক দিক ছিল। যেমন—২০ থেকে ২৪টি বলদ দিয়ে ভারী লাঙ্গল টানা হত। একটি অশ্বমেধ যজ্ঞে কম করেও ৬০০ ষাঁড় বধ করা হত। এর দরুণ কৃষকদের খুবই ক্ষতি সহ্য করতে হত। তাই বৌদ্ধধর্মে প্রাণীহত্যার নিষেধাজ্ঞাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।ব্রাহ্মণ্যধর্মের জাতিভেদ প্রথাকে বুদ্ধদেব অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জন্ম নয়, কর্মই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। তাই তিনি জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করে সকল মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস করেন।

বুদ্ধদের বৈদিক যাগ-যজ্ঞের সাথকতা স্বীকার করেন নি। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কিনা সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু বলে যান নি। তবে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে তিনি স্বীকার করেন নি বলেই তিনি চারটি আর্যসত্য ও 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'কেই পার্থিব দুঃখভোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় বলে উল্লেখ করেছেন।

বুদ্ধদেব মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতেন; যে সমস্ত

শিষ্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলে পরিচিত হতেন তাঁদের এবং সন্ন্যাসিনীদের জন্য সংঘ তৈরি করা হত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বলা হত ভিক্ষু এবং সন্ন্যাসিনীদের নাম ছিল ভিক্ষুণী। প্রতিটি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিশিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করতে হত, ' বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'।

বর্ধমান মহাবীরের জীবনী ও বাণী (Life & teachings of Bardhaman Mahavira) :

জৈনধর্মের ২৪তম বা সর্বশেষ তীর্থংকর হলেন বর্ধমান মহাবীর। ঐতিহাসিকদের অনুমান ৫৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিহারের অন্তর্গত বৈশালী নগরের কাছে কুন্দপুর গ্রামে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে মহাবীরের জন্ম হয়। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ 'জ্ঞাত্রিক' গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। মাতার নাম ছিল ত্রিশলা। তিনি ছিলেন লিচ্ছবিদের নেতা চেতকের বোন। মহাবীরের পূর্ব নাম ছিল বর্ধমান। 'যশোদা' নামে এক মহিলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। কিন্তু সংসার ধর্মে তাঁর একেবারেই মন না থাকায় তিনি ত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন।

মহাবীর বারো বছর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন পালন করেন। তারপর তিনি একমাত্র পরিধেয় ত্যাগ করে গ্রন্থিহীন হন। এই অবস্থায় তিনি সত্যজ্ঞান লাভ করেন। তখন তাঁর নাম হয় 'জিন' বা জিতেন্দ্রিয়। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন রাজ্যে ধর্মমত প্রচার করেন। এখানে লক্ষণীয় যে, যে-সব রাজা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তাঁরাও মহাবীরের প্রবর্তিত ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। অনেকের ধারণা মহাবীর ছিলেন। আবার সত্তর বছর বেঁচে অনেকের অনুমান মহাবীর আশি বছর বেঁচে ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে, বাহাত্তর বছর বয়সে তিনি মগধের অন্তর্গত পাবা নামক নগরীতে দেহত্যাগ করেন। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের অনুমান মহাবীর খ্রীঃ পূঃ ৪৬৮ অব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

এ, এল, ব্যাসমের মতে, গৌতম বুদ্ধের তুলনায় বর্ধমান মহাবীরের আকর্ষণ কম। তবে একথা অনস্বীকার্য যে মহাবীর প্রবর্তিত জৈনধর্ম ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদের যুগ ও রাজনৈতিক ঐক্যের সূচনা (The Age of Imperialism and Political Unific: tion)

ষোড়শ মহাজনপদ ঃ

ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকের শুরুতে উত্তর-ভারতে কোন একচ্ছত্র সার্বভৌম রাজার শাসন ছিল না। সমগ্র উত্তর-ভারত কয়েকটি খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। কোনটি ছিল রাজতন্ত্র, কোনটি বা প্রজাতন্ত্র। ঐসব রাষ্ট্রগুলি প্রায়ই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, উত্তর-ভারত তখন অসংখ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এইসব রাষ্ট্রের মধ্যে ষোলটি রাষ্ট্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জৈন ধর্মগ্রন্থ 'ভগবতী-সূত্ত' থেকেও তখনকার ভারত সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যায়। তবে সবথেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আমরা পাই বৌদ্ধ গ্রন্থ 'অঙ্গুত্তরনিকা'য় থেকে। উক্ত গ্রন্থে ষোলটি রাষ্ট্রের নাম ও তাদের শাসকদের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কিরূপ সম্পর্ক ছিল তার অতি সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে। 'অঙ্গুত্তরনিকায়' গ্রন্থে এই ষোলটি রাজ্যকে সামগ্রিকভাবে **'ষোলস মহাজনপদ'** নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ১৬টি রাষ্ট্র বা মহাজনপদ হল (১) কাশী (২) কোশল (৩) অঙ্গ (৪) মগধ (৫) বজ্জি বা বৃজ্জি (৬) মল্ল বা মালব (৭) চেতি অথবা চেদী (৮) বৎস বা বংশ (৯) কুরু (১০) পাঞ্চাল (১১) মৎস্য (১২) শূরসেন (১৩) অস্মক বা অস্সক (১৪) অবন্তী (১৫) গান্ধার (১৬) কম্বোজ। এই ষোলটি রাজ্য নিজ নিজ প্রশাসনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট-পূর্ব ৬০০ শতক ছিল সাম্রাজ্যবাদের যুগ। তাই বড় বড় রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে গ্রাস করবার চেষ্টা করত। এই পারস্পরিক সংঘর্ষে ছোট ছোট রাজ্যগুলি বড় বড় শক্তির অঙ্গীভূত হয়। সর্বশেষে মগধ একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তারে সফল হয়।

(১) কাশী—বর্তমান উত্তর-প্রদেশের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত নগর। এর রাজধানী ছিল বারাণসী। এখানকার রাজারা ছিলেন খুব আগ্রাসী।

(২) কোশল—এটি অন্যতম বৃহৎ রাজ্য ছিল। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত অযোধ্যা, সাকেত এবং শ্রাবস্তী—এই তিনটি প্রধান নগর নিয়ে কোশল রাজ্য গঠিত হয়েছিল। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে প্রসেনজিৎ ছিলেন একজন প্রতাপশালী রাজা।

(৩) অঙ্গ—বর্তমান বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুর ও তার সন্নিহিত অঞ্চল নিয়ে অঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়েছিল। রাজা ব্রহ্মদত্ত ছিলেন এখানকার খুব প্রতিপত্তিশালী শাসক।

(৪) মগধ—বর্তমান বিহারের দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ পাটনা ও গয়া জেলা। ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মগধ রাজ্যটিই উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য

বিস্তারের প্রথম প্রতিভূ হিসেবে পরিগণিত। এর প্রধান রাজধানী ছিল গিরিব্রজ বা রাজগীর।

(৫) বজ্জি—রিস ডেভিডসের মতে আটটি গোষ্ঠীর সঙ্ঘ নিয়ে বৃজি বা বজ্জি গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে বিদেহ, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক ও শাক্য প্রধান।

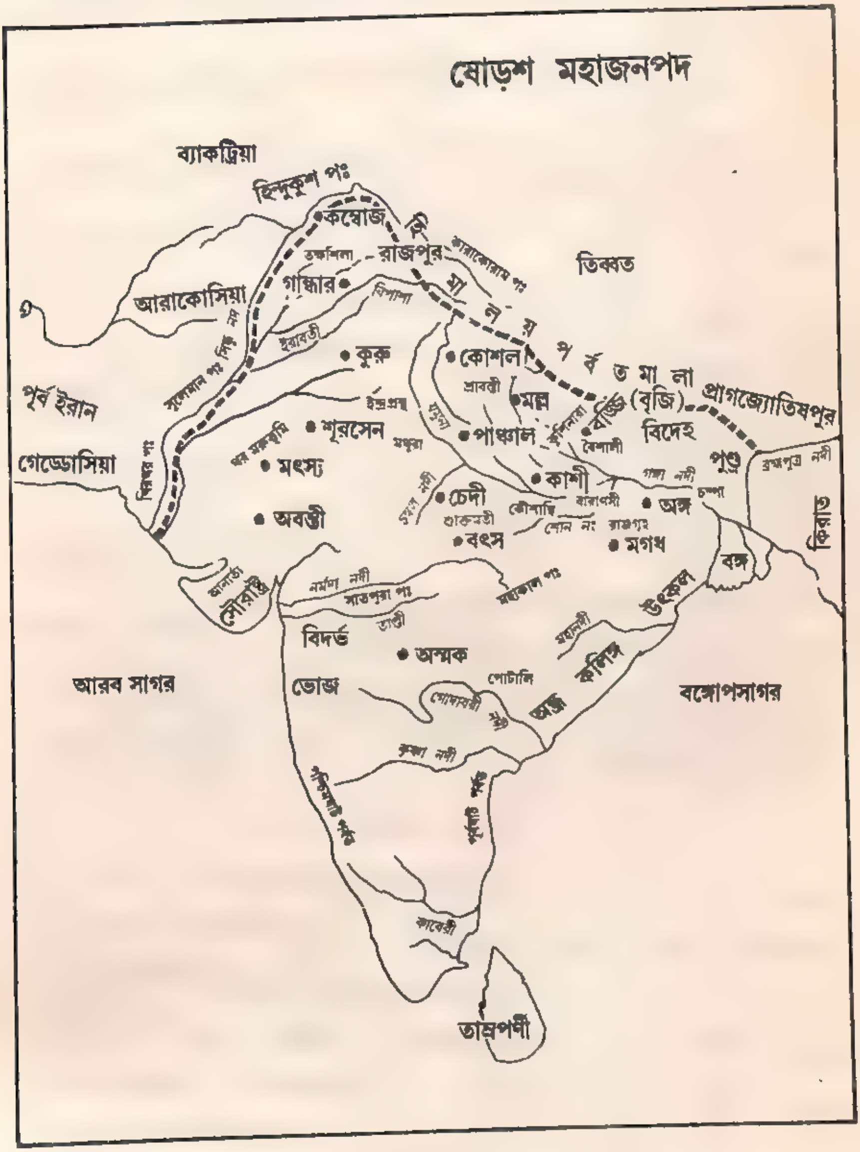

(৬) মল্ল—দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। একটির রাজধানী ছিল কুশীনগর, অপরটির রাজধানী ছিল পাবা।

(৭) চেদি—বর্তমান বুন্দেলখণ্ড রাজ্যটির প্রাচীন নাম চেদি। ভারতের প্রাচীন উপজাতিদের মধ্যে চেদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৮) বৎস—যমুনা নদীর তীরে এলাহাবাদের কাছে কৌশাম্বী (=কোশম) এর রাজধানী ছিল। এখানকার রাজা উদয়ন, গৌতম বুদ্ধ এবং মগধরাজ বিম্বিসারের সমসাময়িক ছিলেন।

(৯) কুরু—বর্তমান দিল্লীর কাছে ছিল কুরু রাজ্য। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে এই রাজ্যটি মগধের অধিকারভুক্ত হয়।

(১০) পাঞ্চাল—বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের কিছু অংশ ও রোহিলখণ্ড নিয়ে এ রাজ্য গঠিত ছিল।

গঙ্গার উত্তর তীরের নাম ছিল উত্তর-পাঞ্চাল ও দক্ষিণ তীরের নাম ছিল দক্ষিণ-পাঞ্চাল।

(১১) মৎস্য—বর্তমান জয়পুর অঞ্চলটি প্রাচীন মৎস্যকে বোঝাত।

(১২) শূরসেন—যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল শূরসেনর রাজধানী মথুরা।

(১৩) অস্মক—এই রাজ্যটির ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নন, তবে অনেকের ধারণা এই রাজ্যটি গোদাবরী নদীর তীরে ছিল।

(১৪) অবন্তী—মালব ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে এই রাজ্যটি গঠিত ছিল। এখানকার রাজা প্রদ্যোত গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।

(১৫) গান্ধার—বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ারের প্রাচীন নাম ছিল গান্ধার।

(১৬) কম্বোজ—বর্তমান পাকিস্তানের হাজারা জেলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে কম্বোজ রাজ্য গঠিত ছিল।

ষোলটি মহাজনপদের বেশির ভাগ রাজ্যেরই অবস্থান ছিল বিহার, উত্তরপ্রদেশে এবং মধ্যভারতে। এ থেকে মনে হয় গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাই ছিল তখনকার রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মগধের অভ্যুত্থান ঃ (Rise of Magadha)

বিম্বিসার থেকে মৌর্যদের উত্থান পর্যন্ত বৌদ্ধগ্রন্থ 'অঙ্গুত্তরনিকায়' থেকে আমরা খ্রীঃপূঃ ষষ্ঠ শতকের যে রাজনৈতিক চিত্র পাই তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, সেই সময় ভারতে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ষোলটি মহাজনপদের বা ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে যে চারটি রাজ্য ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে তারা হল মগধ, বৎস, কোশল ও অবন্তী। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সংগ্রামের দ্বন্দ্বে এই চারটি রাজ্য সর্বদাই পরস্পরে সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হত। এভাবে অনবরত সংগ্রামের পর মগধ রাজ্যটিই অন্যান্য রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করে নিজরাজ্যের ভৌগোলিক সীমা বৃদ্ধি করে। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই মগধ একটি 'সাম্রাজ্য'-এ রূপান্তরিত হয়। রাজা বিম্বিসার ছিলেন মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলা প্রাচীনকালে মগধ নামে অভিহিত ছিল।

বিম্বিসার—পুরাণ ও বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশ' থেকে আমরা প্রাচীন মগধ রাজাদের সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাই। ভারতীয় রাজনীতিতে মগধ রাজ্যই সর্বপ্রথম এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনে সফল হয়েছিল। আনুমানিক ৫৪৪ খ্রীঃ পূঃ অব্দে বিম্বিসার মগধের রাজা হন। তিনি হর্যঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহাবংশের বিবরণ অনুযায়ী মাত্র পনের বছর বয়সে বিম্বিসার মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর পিতা তাঁকে অভিষিক্ত করেন। কোনও কোনও উপকরণে বিম্বিসারকে 'শ্রেণিক বিম্বিসার' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিম্বিসারের পিতার রাজনৈতিক পদমর্যাদা কি ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

বিম্বিসারের রাজত্বের শুরু থেকে মগধের উত্থানের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছিল। প্রথম থেকেই তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি অঙ্গ রাজাকে পরাজিত করে অঙ্গ রাজ্যটি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। আবার মদ্র, কোশল , বৈশালী রাজ্যের সঙ্গে তিনি বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। কোশলের রাজা প্রসেনজিতের কন্যাকে বিয়ে করে যৌতুক হিসেবে তিনি কাশীগ্রাম লাভ করেন। প্রসেনজিৎ বিম্বিসারের মিত্রশক্তি ছিলেন। বিম্বিসারের প্রথম রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। নদীপথে মগধের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের ব্যবসা চলত। বুদ্ধ ছিলেন বিম্বিসারের সমসাময়িক।

বিম্বিসার কেবলমাত্র রাজ্যজয়ী বীর ছিলেন তাই নয়, তিনি একজন সুশাসকও ছিলেন। রাজ্যে জলসেচের সুবন্দোবস্ত তিনি করেছিলেন। রাজ্যে প্রচুর কৃষিযোগ্য জমিতে ফসল ফলিয়ে উৎপন্ন শস্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তাঁর সময় চিকিৎসাবিদ্যারও উন্নতি হয়েছিল। অবন্তীর রাজা প্রদ্যোত যখন কঠিন পীড়ায় ভুগছিলেন তখন বিম্বিসার তাঁর রাজবৈদ্য জীবককে রাজা প্রদ্যোতের চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছিলেন। প্রজার কল্যাণের জন্য তিনি বহু প্রশাসনিক সংস্কার করেন। তিনি সামরিক বিভাগের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। আনুমানিক ৪৯৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বিম্বিসারের মৃত্যু হয়।

অজাতশত্রু—আনুমানিক ৪৯২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে অজাতশত্রু মগধের রাজা হন। বৌদ্ধগ্রন্থে অজাতশত্রুকে পিতৃঘাতক বলা হয়েছে। তাঁকে বৌদ্ধধর্মের বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরাণে অবশ্য অজাতশত্রুকে 'কুণিক' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য কোন উপাদানের কোথাও কিন্তু লেখা নেই যে, অজাতশত্রু তাঁর পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন। বিম্বিসারের সময় কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন মগধের মিত্র। কিন্তু অজাতশত্রুর সময়ে কোশল মগধের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

এর কারণ, রাজা প্রসেনজিতের কন্যা ছিলেন অজাতশত্রুর মা। 'মহাবংশে' উল্লেখ আছে যে, রাজা প্রসেনজিৎ বিম্বিসারকে যৌতুক হিসাবে কাশী অঞ্চলটি দান করেন। কিন্তু যেহেতু অজাতশত্রু পিতৃঘাতক এবং যেহেতু তার মা এই শোকে মারা যান সেহেতু প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর কাছ থেকে যৌতুক পাওয়া কাশী ফিরিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। শুরু হল মগধের সঙ্গে কোশলের লড়াই। প্রসেনজিৎ পরাজিত হলেন। কাশী অঞ্চলটির ওপর অজাতশত্রুর অধিকার স্বীকৃত হল। অজাতশত্রু তাঁর বাবার মতই একের পর এক রাজ্য জয় করতে লাগলেন। তিনি বজ্জি ও মল্লগণকে পরাজিত করে বৈশালী ও পাবা অঞ্চলটিকে মগধের অধিকারভুক্ত করে নেন। কোশলরাজ তাঁর সঙ্গে একাধিকবার

যুদ্ধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত অজাতশত্রুর কাছে পরাজিত হলে অজাতশত্রু কোশল রাজ্যটিকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। তিনি 'পাটলী' গ্রামটিকে একটি দুর্গে রূপান্তরিত করেন। কথিত আছে, এই 'পাটলী' গ্রামটিই পরে পাটলিপুত্রে রূপান্তরিত হয়। অজাতশত্রুর সময়ে মগধের ভৌগোলিক সীমা আরও বেশি বৃদ্ধি পায়। তাঁর রাজত্বের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল গৌতম বুদ্ধের 'মহাপরিনির্বাণ' (আনুমানিক ৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দে) এবং রাজগৃহে একটি বৌদ্ধ সম্মেলন ডাকা হয়। এখানে মঠের কয়েকজন প্রসিদ্ধ সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সংকলন করা হয়। অজাতশত্রুর পরবর্তী রাজাগণ দুর্বল ছিলেন। তাঁদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষে শিশুনাগ নামে একজন মন্ত্রী মগধের রাজা হলেন।

শিশুনাগ একটি বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইতিহাসে তাকে শৈশুনাগ বংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিশুনাগ ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী। তাই প্রথমেই তিনি অবন্তীর রাজা প্রদ্যোতকে আক্রমণ করেন ও তাঁকে পরাজিত করে অবন্তী রাজ্যটিকে মগধ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করেন। তাঁর পুত্র কালাশোক বৎস রাজ্য জয় করেন। কালাশোকের রাজত্বকালে দ্বিতীয় বৌদ্ধ ধর্মসম্মেলন বৈশালীতে হয়েছিল। এই কালাশোকের সময়তেই মগধ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ মগধ বলতে এখন শুধুমাত্র দক্ষিণ-বিহারকেই বোঝায় না, সমগ্র উত্তর-ভারতের বিশাল ভূখণ্ডই হল মগধ সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তার। বাণভট্ট এবং কার্টিয়াসের রচনা থেকে জানা যায় যে, কালাশোককে হত্যা করা হয়েছিল। অনেকের ধারণা মহাপদ্মানন্দ কালাশোককে হত্যা করে (আঃ ৩৬৪ খ্রীঃপূঃ অব্দ) মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

নন্দবংশ ঃ শৈশুনাগ বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দ মগধের রাজা হন (আঃ ৩৬৪ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)। মহাপদ্মনন্দ নামটি পুরাণে উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশটীকা মহাপদ্মকে 'উগ্রসেনা' নামে অভিহিত করেছে। পুরাণ অনুসারে তাঁর পিতা ছিলেন শৈশুনাগ বংশের সর্বশেষ রাজা মহানন্দিন এবং তাঁর মাতা ছিলেন একজন শূদ্রা রমণী। আবার জৈন ধর্মগ্রন্থ ও গ্রীক লেখক কুইন্টাস কার্টিয়াসের মতে মহাপদ্মনন্দ ছিলেন একজন ক্ষৌরকারের সন্তান। অর্থাৎ প্রাচীন সবকটি উপাদান মহাপদ্মনন্দকে হীনবংশের সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। যদি মহাপদ্মনন্দ হীনবংশের সন্তান হয়ে থাকেন তবে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে মহাপদ্ম সর্বপ্রথম ব্যতিক্রম, যিনি ক্ষত্রিয়বংশের সন্তান না হয়েও বীরবিক্রমে মগধের রাজা হয়েছিলেন।

বৌদ্ধগ্রন্থ কথাসরিৎসাগর থেকে জানা যায় যে, মহাপদ্মনন্দ পশ্চিম দিকে কোশল বা অযোধ্যা পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। পুরাণে মহাপদ্মকে 'দ্বিতীয় পরশুরাম', 'সর্বাক্ষত্রান্তক' এবং 'একরাট' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি এক অশেষ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি যে সকল ক্ষত্রিয় বংশগুলির উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন সেগুলি হল ইক্ষবাকু, পাঞ্চাল, কাশী, হৈহয়, কলিঙ্গ, অস্মক, কুরু, মৈথিল, শূরসেন এবং বীতিহোত্র। "হাতিগুম্ফা" লিপি (কলিঙ্গরাজ খারবেলের বিজয়কাহিনী) থেকে জানা যায় যে, মহাপদ্ম কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। গোদাবরী নদীর তীরে 'নব নন্দ ডেহরা' আবিষ্কৃত হয়েছে। এ

থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, মহাপদ্মনন্দ দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন অংশ জয় করেছিলেন। তিনি এক বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী হয়েছিলেন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে মহাপদ্মনন্দই হলেন ঐতিহাসিক যুগে ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা।

নন্দবংশীয় রাজাদের মোট সংখ্যা ছিল নয়জন। পুরাণের বর্ণনা অনুসারে মহাপদ্ম ছিলেন পিতা আর পরবর্তী আট জন তাঁর উত্তর পুরুষ। বৌদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থ অনুসারে মহাপদ্ম ছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অন্যারা সব ভাই।

এই বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। তাঁর প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যখন মগধের রাজা তখন গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে)। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ধননন্দকে 'আগ্রামেস' নামে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের লেখা থেকে জানা যায় যে, ধননন্দের ২০,০০০ অশ্বারোহী আর দুই লক্ষ পদাতিক, ২০০০ রথ এবং ৩০০০ হাতি ছিল। তবে ক্ষমতাশীল রাজা হয়েও তিনি প্রজাদের খুব বিরাগভাজন ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যাচারী শাসক। অর্থের প্রতি তাঁর এত লালসা ছিল যে তিনি প্রজাবর্গকে অত্যধিক করভারে জর্জরিত করেন। তাঁর বিরুদ্ধে চারিদিকে এক অসন্তোষের বীজ ছড়িয়ে পড়ল। আনুমানিক ৩২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চাণক্যের সহায়তায় ধননন্দকে পরাজিত করে নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করেন। এই চন্দ্রগুপ্তই ছিলেন মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মগধের নন্দবংশের অবদান অপরিসীম। এক অখ্যাত কুলহীন পরিবারের সন্তান হয়েও তাঁরা পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পূর্বে কলিঙ্গ এবং উত্তরে অহিচ্ছত্রা থেকে দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের একচ্ছত্র শাসক হয়েছিলেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এঁরা প্রতিভার সাক্ষ্য রেখেছেন। পাটলিপুত্র তাঁদের সময় থেকেই প্রাচীন ভারতের একটি বিশিষ্ট নগরে পরিণত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস (History of the Maurya Empire)

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যঃ আনুমানিক ৩২৪ খ্রীঃপূঃ অব্দে মগধের নন্দবংশ ধ্বংস করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন চন্দ্রগুপ্তের মাতা বা মতান্তরে মাতামহীর নাম ছিল মুরা। তিনি ছিলেন শূদ্রা নারী। এই মুরার নাম অনুসারেই চন্দ্রগুপ্তের বংশের নাম হয় মৌর্য বংশ। পুরাণে চন্দ্রগুপ্তকে শূদ্র বংশের সন্তান বলে অভিহিত করা হয়েছে। বৌদ্ধগ্রন্থ **'মহাপরিনির্বাণ সূত্তন্ত'** থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত পিপ্‌লিবনের 'মোরিয়' নামক ক্ষত্রিয় রাজবংশের সন্তান। এই মোরিয় থেকেই মৌর্য নামের উৎপত্তি। বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বংশ-জাত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সর্বপ্রথম কাজ হল ভারতের পশ্চিম সীমান্ত থেকে আলেকজাণ্ডার-মনোনীত গ্রীক সেনাপতিদের ভারতের মাটি থেকে বিতাড়ন। আর একটি প্রধান কাজ হল ভারতে একটি সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

ঐতিহাসিক জাস্টিন-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর স্যাণ্ড্রোকোট্রস্ নামে একজন ভারতীয় পশ্চিম-ভারতে গ্রীক সেনাপতিদের সঙ্গে একের পর এক যুদ্ধ করে গ্রীক সেনাপতিদের পরাজিত করেন এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ও পাঞ্জাবকে গ্রীক অধিকার থেকে মুক্ত করেন। গ্রীক লেখকের এই 'স্যাণ্ড্রোকোট্রস' হলেন ভারতের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, গ্রীক বীর আনুমানিক ৩২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ভারত ছেড়ে ম্যাসিডনের দিকে যাত্রা করেন। পথে ব্যাবিলনে খ্রীঃপূঃ ৩২৩ অব্দে আলেকজাণ্ডার মারা যান। চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত চাণক্যের সহায়তায় ৩২৩ খ্রীঃপূঃ অব্দ থেকেই গ্রীক সেনাপতিদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতে ৩১৭ খ্রীঃপূঃ-এর মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত সকল গ্রীক সেনাপতিকে পরাজিত করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল গ্রীক-মুক্ত করেন।

চন্দ্রগুপ্ত কোনো পৈতৃক সূত্রে রাজ্য বা সেনানী পান নি। নিজ প্রতিভাবলে তিনি রণবিদ্যায় পারদর্শী হন। অনেকে মনে করেন পাঞ্জাবের যে-সমস্ত উপজাতি আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত সেই সমস্ত স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমী সৈন্যদের নিয়ে চাণক্যের নির্দেশে এক সেনাবাহিনী তৈরি করেছিলেন। এই সৈন্যরাই চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং ভারতের মাটি থেকে তাদের পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছিল।

বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' থেকে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দরাজ ধননন্দের রাজধানী মগধ আক্রমণ করে ধননন্দকে পরাজিত করেন ও নন্দবংশের উচ্ছেদ করেন। ঐ গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্তের প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়। পরের বছর চন্দ্রগুপ্ত সফল হন। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ মনে করেন, চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পাঞ্জাব থেকে গ্রীক সৈন্যদের বিতাড়িত করেন, পরে মগধের নন্দ বংশ ধ্বংস করেন। তবে কোন্ অভিযান আগে ও কোন্‌টি পরে হয়েছিল এ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ এখনও একমত হতে পারেন নি।

গ্রীক লেখক ডিওডোরাস, কার্টিয়াস প্রমুখের রচনা থেকে জানা যায় যে, সেলুকাস নামে এক গ্রীক অধিপতি আনুমানিক ৩০৫ খ্রীঃপূঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত আক্রমণ করেন। সেলুকাস ছিলেন আলেকজাণ্ডার-অধিকৃত সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের অধিপতি। তিনি সোজা ব্যাক্‌ট্রিয়া থেকে হিন্দুকুশ অতিক্রম করে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণ করেন। ভারতীয় কিংবা গ্রীক কোন সূত্রেই এ যুদ্ধের কোন বিস্তৃত বিবরণ নেই। তবে এর ফলাফল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে একটি সন্ধি করেন। এই সন্ধির শর্ত হিসেবে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে হিরাট, কাবুল, কান্দাহার ও মাকরান এই চারটি প্রদেশের অধিকার দান করেন। পক্ষান্তরে, চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে ৫০০ হাতি উপহার দেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ এক জায়গায় বলেছেন যে, সন্ধির বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকাস পারস্পরিক কোন বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এর বেশি কিছু জানা যায়নি। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে সেলুকাস পরাজিত হন। বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ সেলুকাসের

কন্যাকে বিবাহ করেন। চন্দ্রগুপ্ত পরাজিত সেলুকাসকে নিজের রাজধানী পাটলিপুত্রে থাকতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধে সেলুকাস মেগাস্থিনিস নামে একজন গ্রীক দূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় পাঠিয়ে দেন। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় থেকে মৌর্য রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁর রচিত বইটির নাম "ইণ্ডিকা"। চন্দ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে সেলুকাস ভারতে গ্রীক-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা পরিত্যাগ করে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

গ্রীকদের বিতাড়ন এবং নন্দবংশের পতন—এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সফল সামরিক অভিযানের পর চন্দ্রগুপ্ত একের পর এক রাজ্য জয় করেন। তামিল কবি মামুলনা-র রচনা থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ-ভারতে তিনেভেলি জেলা পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। পরোক্ষ প্রমাণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের শিলালিপিগুলির ভৌগোলিক বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার যে পশ্চিমে পারস্য থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। অশোক কেবলমাত্র কলিঙ্গ যুদ্ধ জয় করেছিলেন; সুতরাং কলিঙ্গ ছাড়া বাকী রাজ্যগুলি নিঃসন্দেহে অশোকের পিতা বিন্দুসার অথবা পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। বিন্দুসার ইতিহাসে রাজ্যবিজেতা ও সেনানী হিসেবে পরিচিত নন। সুতরাং চন্দ্রগুপ্তই ঐ সমস্ত রাজ্যগুলি জয় করে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক ও জাস্টিনের লেখা থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা ঃ নিম্নলিখিত মৌলিক উপকরণগুলি থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায় ঃ

(১) চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ গ্রীক্‌দূত মেগাস্থিনিসের **ইণ্ডিকা**— এই মূল বইটি গ্রীক ভাষায় লিখিত। পরে এটি জার্মান ও ইংরেজীতে অনূদিত হয়। তবে, বইটির প্রথম দিকের কয়েকটি পৃষ্ঠা নেই। 'ইণ্ডিকা' মৌর্য শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল।

(২) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র— এটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। ধরে নেওয়া হয় এটি মৌর্যযুগে লিখিত। এর লেখক চাণক্য। মৌর্য শাসন ও অর্থনীতির একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

(৩) অশোকের শিলালিপি ঃ উপরি-উক্ত উপাদানগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে, মৌর্য শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজা হলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা। তাঁর ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ। তিনি ছিলেন মুখ্য প্রশাসক, মুখ্য আইন-প্রণেতা, মুখ্য বিচারক এবং প্রধান সেনাপতি। চন্দ্রগুপ্ত বিকেন্দ্রীকরণ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

শাসনতন্ত্রের দুইটি দিক ছিল—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক। তাঁকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন অমাত্য, মন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ। রাজা ব্যক্তিগতভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তিনি কখনই নিজেকে ঈশ্বরদত্ত প্রতিনিধি বলে মনে করতেন না। তিনি 'পুরাণ-প্রকৃতি' অর্থাৎ পুরানো রাজনীতিকে অনুসরণ করেন। প্রধান সেনাপতি হিসেবে তিনি যুদ্ধ পরিকল্পনাগুলি বিচার করে দেখতেন এবং যদি দরকার হত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতেন।

রাজাকে শাসনকার্যে সহায়তা করবার জন্যে তিনি মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হলেও তিনি কখনই স্বেচ্ছাচারী হন নি। মন্ত্রীদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য পদ হল 'মহামন্ত্রী'। আর ছিলেন হিসাবপরীক্ষক, পুরোহিত, নগরাধ্যক্ষ, প্রদেশপাল, প্রধান বিচারপতি, নৌ-সেনাপতি। তাছাড়া মৌর্য রাজা গোপনে সংবাদ নেবার জন্যে বহু গুপ্তচর নিয়োগ করেন।

প্রদেশের শাসনব্যবস্থা ঃ মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, নগরের শাসনের জন্য ত্রিশ জন সদস্য নিয়ে একটি 'নগর-পরিষদ' গঠিত ছিল। পরিষদটি ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি সমিতিতে পাঁচ জন করে সদস্য থাকত। নিম্নলিখিত বিভাগগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ (ক) শিল্পোৎপাদন (খ) বিদেশীদের অভ্যর্থনা (গ) জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা (ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের দেখাশোনা করা (ঙ) একদশমাংশ বিক্রয় কর আদায় করা।

উৎপন্ন ফসলের অংশ $^{১}/_{৬}$ রাজা 'ভাগ' হিসেবে গ্রহণ করতেন, আবার $^{১}/_{৪}$ থেকে $^{১}/_{৮}$ অংশ পর্যন্ত, রাজা 'বলি' হিসেবে গ্রহণ করতেন। ভূমিরাজস্বই ছিল মৌর্য শাসনতন্ত্রের আয়ের বড় উৎস। এ ছাড়াও অন্যান্য করের প্রচলন ছিল। যেমন ঃ জলকর, মামলা- মোকদ্দমায় জরিমানা কর ইত্যাদি।

সেনাবিভাগ ঃ চন্দ্রগুপ্ত নিজে ছিলেন জন্মগত যোদ্ধা। কাজেই একটি সুদক্ষ সেনাবাহিনী গঠনের জন্য চন্দ্রগুপ্ত ত্রিশ জন সদস্যের একটি পরিষদ গঠন করেন। পরিষদটি ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল ঃ (১) পদাতিক (২) অশ্বারোহী (৩) রথ (৪) হস্তী (৫)রসদ ও যানবাহন (৬) নৌবাহিনী। সৈন্যগণ বেতনভুক্ ছিল।

বিশাল সাম্রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করার জন্যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সাম্রাজ্যকে চারটি প্রদেশে ভাগ করেন ঃ (১) প্রাচ্য, (২) উত্তরাপথ, (৩) অবন্তী ও (৪) দক্ষিণাপথ। একমাত্র 'প্রাচ্য' প্রদেশটি প্রত্যক্ষভাবে রাজার শাসনাধীন ছিল। অন্য প্রদেশগুলি 'কুমার' বা 'মহামাত্রগণ' শাসন করতেন। 'কুমার' হতেন সাধারণতঃ রাজপুত্র স্বয়ং আর 'মহামাত্র' ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। প্রদেশগুলি কয়েকটি 'জনপদে' বিভক্ত ছিল। এই জনপদগুলি 'সমাহোর্তা' নামে এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী শাসনাধীন ছিল। 'গ্রামিক' নামে এক ধরনের কর্মচারী গ্রামের শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। চন্দ্রগুপ্তের দেহরক্ষীদের মধ্যে নারীবাহিনীও ছিল।

আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃপূঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্মানুসারে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলায় দেহরক্ষা করেন।

মহামতি অশোক ঃ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধের সম্রাট হন। এবং ২৭৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র অশোক মগধের সম্রাট হন। দক্ষতার সঙ্গে তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করে তিনি মৌর্যসাম্রাজ্যের সীমা দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। পশ্চিম-এশিয়ার সঙ্গেও তাঁর রাজনৈতিক সুসম্পর্ক ছিল। উত্তরাধিকারের সংগ্রামে অশোক তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সকল ভাইকে পরাস্ত করে সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর অভিষেক হয়েছিল আরও ৪ বছর পর অর্থাৎ (২৭৩ খ্রীঃপূঃ—৪=২৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।)

কলিঙ্গ বিজয় ঃ রাজা অশোকের শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে অর্থাৎ (২৬৯-৮) বা ২৬১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে তিনি কলিঙ্গ (বর্তমান দক্ষিণ-উড়িষ্যা) জয় করেন। কিন্তু অস্ত্রের দ্বারা রাজ্য জয় অশোকের মনে শান্তি আনতে পারে নি। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভীষিকা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও ধ্বংসলীলা প্রভৃতি অশোকের হৃদয়ে আমূল পরিবর্তন আনে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন আর কখনও কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। কারণ রাজ্যজয়ের থেকে মানুষের হৃদয় জয় করা অনেক বেশি শ্রেয়।

অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ ভারতের বাইরে ও দেশের মধ্যে রাজা অশোকের প্রচুর শিলালিপি পাওয়া গেছে। এর শ্রেণীবিভাগগুলি নিম্নরূপ ঃ (ক) পাথুরে অনুশাসন

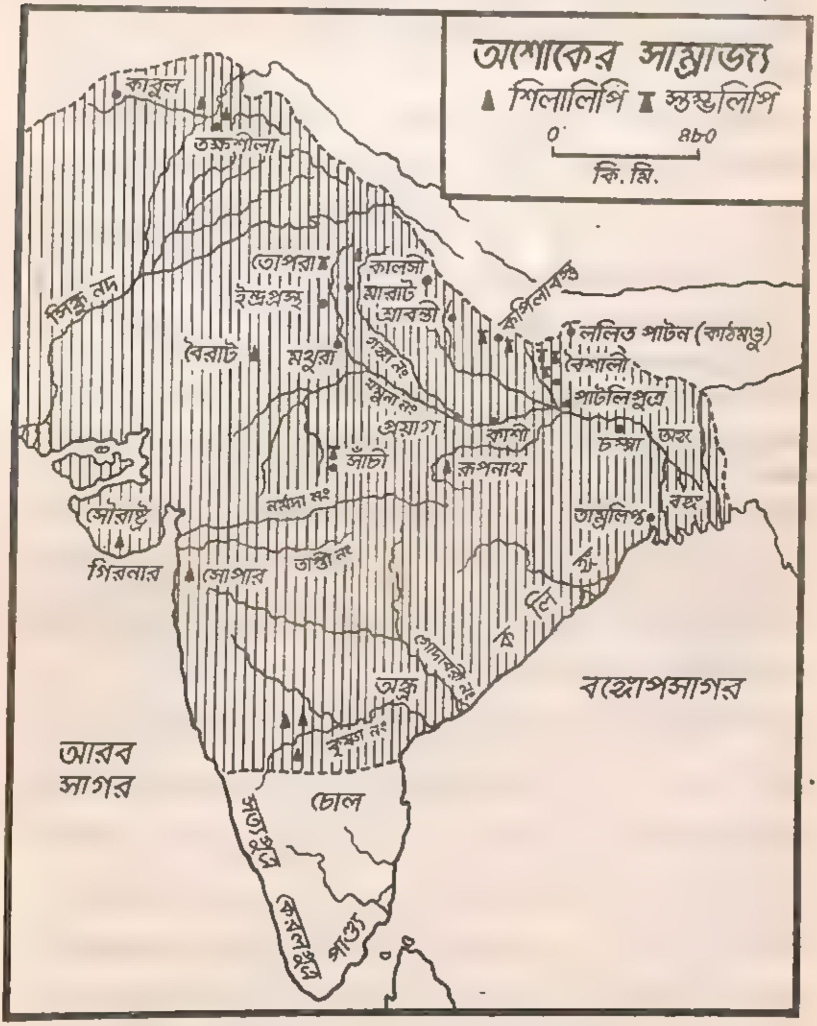

[১৪] (খ) স্তম্ভ অনুশাসন [৭] (গ) অপেক্ষাকৃত ছোট পাথুরে প্রমাণ [২] (ঘ) পৃথক কলিঙ্গ অনুশাসন [২]। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, অশোকের শিলালিপিগুলি

নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র 'শ্রেণী' সৃষ্টি করে। এই শিলালিপিগুলির ভৌগোলিক পুনর্গঠন বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, রাজা অশোকের রাজ্যসীমা উত্তরে হিন্দুকুশ থেকে দক্ষিণে মহীশূর এবং পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে পূর্বে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ ঃ অশোকের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে উপগুপ্ত নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। জীবে প্রেম ও অহিংসাই হল বৌদ্ধধর্মের মূল কথা। সম্রাট তখন থেকে এই অহিংস নীতি মেনে চলেন। রাজ্যজয়ের পরিবর্তে অশোক করেন ধর্মবিজয়। তাই সম্রাটের সিংহাসনে আসীন থেকেও তিনি ছিলেন প্রকৃতই রাজর্ষি। একজন যথার্থ বৌদ্ধধর্মানুরাগীর ন্যায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও নিরাসক্ত। "বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের" প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য রেখে আভিজাত্যপূর্ণ "বিহারযাত্রার" পরিবর্তে পবিত্র "ধর্মযাত্রার" প্রচলন করেন।

অশোকের 'ধর্ম' ঃ অশোকের ধর্ম (ধম্ম) কোন বিশেষ জাতি বা শ্রেণীর ধর্ম নয়। মানবিকতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রেম—এই নীতিগুলিই ছিল অশোকের ধর্মের মূল কথা। অশোক তাঁর দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে ধর্মের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন দয়া, দান, সত্য ও শৌচ, কল্যাণমূলক কাজ ও পাপের স্বল্পতা হল ধর্ম। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, অশোকের ধর্ম ছিল নৈতিক অনুশাসন। সকল ধর্মের সারকথাই ছিল তাঁর ধর্ম। তাঁর "ধর্ম" বা ধর্মচিন্তায় বিশেষ কোনও মৌলিকতা না থাকলেও কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। তিনি নেহাতই বৌদ্ধধর্মের নৈতিক কথাসমূহ 'অষ্টপথ নির্বাণ' প্রচারে অবতীর্ণ হননি। তার পরিবার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কিছু নৈতিক কর্তব্যপালনের সার্বিক আহ্বান জানান। ব্যক্তিগতভাবে গোঁড়া বৌদ্ধ অশোক বিশ্বাস করতেন, "সবে মুনিষে পজা মমা" অর্থাৎ সকল মানুষই আমার সন্তান। সেই মমত্ববোধ থেকেই নির্দেশ দেন—সকল সত্য ও পবিত্রতা রক্ষা করা; হিংসা-ক্রোধ ঈর্ষা ছেড়ে পরমধর্মকে শ্রদ্ধা করা ধর্ম ও পরধর্মকে হীন মনে করা পাপ। ধর্মবিজয়ে অশোকের নিজস্ব বক্তব্যের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্রগুলি খানিকটা আড়াল হয়ে পড়ায় সমালোচনা হলেও ডঃভাণ্ডারকরের মতে—তাঁর ধর্মমত ছিল লৌকিক বৌদ্ধধর্ম এবং তা সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল প্রচুর।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ঃ মৌর্য শাসনব্যবস্থায় অশোক 'ধর্মমহামাত্র' নামে এক নতুন শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। তিনি নিজে 'বিহারযাত্রার' পরিবর্তে 'ধর্মযাত্রায়' বেরিয়ে পড়তেন। রাজুক, যুত, মহামাত্র—প্রভৃতি রাজকর্মচারিগণকে ধর্মপ্রচারে সাহায্যের জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাহাড়ের গায়ে, পাথরখণ্ডে, স্তূপে ও স্তম্ভে ধর্মের মূল কথাগুলি লিখে রেখে প্রজাদের মধ্যে ধর্মভাব জাগাতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। রাজা অশোক বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষু পাঠিয়েছিলেন। বৌদ্ধ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি দেশের বাইরেও ধর্মদূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দূতকে দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে মতান্তরে ভাই ও

ভগিনীকে পাঠিয়েছিলেন সিংহলে। সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডনিয়া প্রভৃতি দেশেও তিনি প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। দুজন প্রচারককে তিনি ব্রহ্মদেশেও পাঠিয়েছিলেন। মানবকল্যাণই ছিল তাঁর ধর্মপ্রচারের একান্ত লক্ষ্য। তাঁর শিলালিপিতেও সেকথা বর্ণনা করা হয়েছিল। সেখানে অশোক সম্রাট হিসেবে জনসাধারণের প্রতি পিতার ন্যায় কর্তব্য অনুভব করেছেন। আধুনিক সমালোচকগণ অবশ্য তাঁর ধর্মপ্রচারের কিছু স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাও দিয়েছেন—তাঁদের মতে সামরিক শক্তিতে গঠিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে ভাবগত ঐক্য এনে ভারতবর্ষে মৌর্যশাসনকে জনপ্রিয় ও সেই সঙ্গে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলাই তাঁর ধর্মবিজয়ের আসল লক্ষ্য ছিল। ইতিহাসবিদ্ রোমিলা থাপারও অনুরূপ মত পোষণ করেন। সমালোচনা করে বলা হয়ে থাকে—কলিঙ্গ যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা তাঁর হৃদয়ে সর্বাত্মক পরিবর্তন ঘটালেও মানবতাবশতঃ বিদ্রোহী কলিঙ্গবাসীদের স্বাধীনতা তিনি ফিরিয়ে দেননি। পরবর্তীকালে অহিংসার মূর্তপূজারী হয়ে রাজ্যবিজয় ছেড়ে 'ধর্ম বিজয়ে' মনোনিবেশ করলেও—সমৃদ্ধ সৈন্যবাহিনীও ভেঙে দেননি। এসব নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতেরা আদৌ একমত নন। বরং বিশ্বময় মানবতাবাদ ও প্রজাহিতৈষণার নিরিখে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে অশোক আজও উজ্জ্বল অম্লান।

জনহিতকর কার্যাবলী ঃ অশোক তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল প্রজাদের সুচিকিৎসার জন্যে এবং পশুদেরও চিকিৎসার জন্যে তিনি দুরকমের হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়াও, পথের দুই ধারে গাছ পুঁতে, কুয়ো খুঁড়ে তিনি জনসাধারণের উপকার করেছিলেন।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ঃ দেশের বাইরে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে অশোক ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। তাঁরই নির্দেশে দূতেরা ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা অন্য দেশে প্রচার করেছিলেন।

বিশ্বের ইতিহাসে অশোকের স্থান ঃ বিশ্বের ইতিহাসে মহামতি অশোক একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। মানুষ ও শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন বরণীয়, মহান ও আদর্শস্থানীয়। ছিলেন যেমন একজন প্রজাবৎসল সম্রাট, তেমনি ছিলেন শান্তি-প্রেম ও করুণার প্রোজ্জ্বল পুরুষ। তাঁর ঔদার্য ও মহত্ত্ব অনবদ্য। বাস্তবিকই তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে অন্যতম। ধর্মকে প্রশাসনের মূল নীতি মেনে নিয়ে অশোক সমকালীন ইতিহাসে এক অভিনবত্বের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের রাজত্বে কখনই রাজকার্য থেকে দূরে সরে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন নি। প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় রেখে তবেই তিনি ধর্মপ্রচারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি রাজর্ষি জনকের চেয়েও মহত্তর। যুদ্ধে জয়ী হয়েও যুদ্ধের প্রতি অনীহা অশোকের মহত্ত্ব প্রকাশ করে। নিজের সন্তানের মতোই তিনি প্রজাদের ভালবাসতেন। নিজে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হয়েও অন্যধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল থাকা নিঃসন্দেহে অশোককে ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ রাজার আসন দান করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিদেশীদের আক্রমণ (Invasions of India by foreigners) : খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে অ্যাকামেনিয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কাইরাম ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের আশায় কাবুল ও সিন্ধুনদের মধ্যভাগে তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। এর প্রায় ত্রিশ বছর পর তাঁর পৌত্র ডারিয়াস পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি ও রাজপুতানা পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তার করেন। সিন্ধু-উপত্যকা ছিল সমকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের ২০তম সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ।

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান : খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারত আক্রমণ করেন। সেই সময় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই জটিল। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন কয়েকটি খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সব রাজ্যগুলি সবসময়েই প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকত। রাজনৈতিক ঐক্য বলতে কিছু ছিল না। কোনটি ছিল রাজতন্ত্র, আবার কোনটি বা গণতন্ত্র। সর্বদা বিবদমান রাজ্যগুলি দেশের ঐক্যের কথা ভাবতই না।

আলেকজাণ্ডার

আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদ পেরিয়ে যখন তক্ষশীলায় (বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ার) উপস্থিত হন তখন সেখানকার রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করলেন। পাশাপাশি আরও কয়েকটি রাজ্য আলেকজাণ্ডারের বশ্যতাস্বীকার করল। আলেকজাণ্ডার তাঁর সৈন্যদল নিয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে গেলেন। ঝিলাম নদীর তীরে ছিল ছোট্ট একটি রাজ্য। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন পুরু। তিনি যথাশক্তি গ্রীক সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পরাজিত হলেন। কথিত আছে, বন্দী অবস্থায় তাঁকে গ্রীক সৈন্যরা আলেকজাণ্ডারের কাছে নিয়ে এল। আলেকজাণ্ডার পুরুকে জিজ্ঞাসা

করেছিলেন, "আপনি আমার কাছ থেকে কিরকম ব্যবহার প্রত্যাশা করেন?" পুরু উত্তর দিয়েছিলেন, "রাজার মতো"। আলেকজাণ্ডার খুশি হয়ে পুরুকে মুক্তি দিলেন ও তাঁকে একজন ক্ষত্রপ বা প্রাদেশিক রাজা হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি পাঞ্জাবে

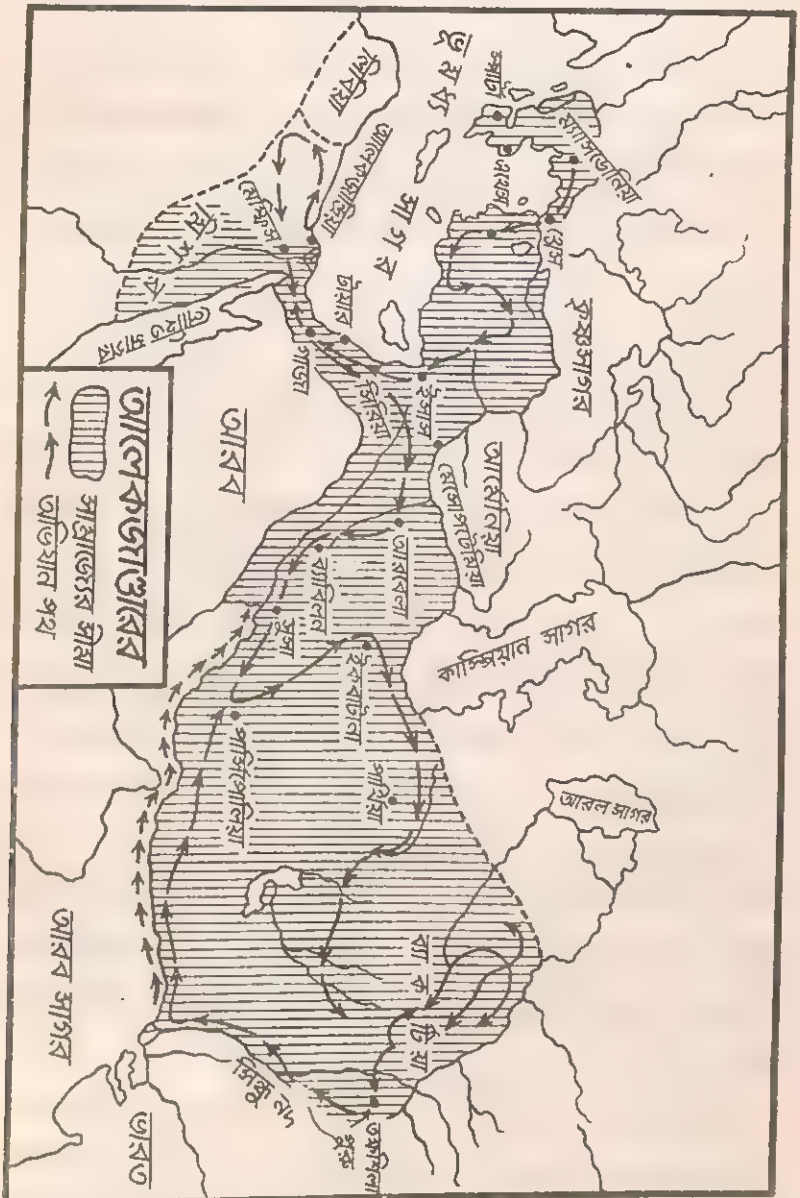

কয়েকটি শক্তির বিরোধিতা পেলেন। এই শক্তিগুলি হল মালব, ক্ষুদ্রক, শিবি। এঁরা ছিল খুবই স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক। দেশের স্বার্থে এঁরা আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে গড়ে

তুলেছিলেন শক্ত প্রতিরোধ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে যায়। তবে একনাগাড়ে যুদ্ধ করার ফলে আলেকজাণ্ডারের বাহিনী একসময়ে খানিকটা রণক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাঁর সৈন্যরা বিপাশা নদী পর্যন্ত এসে আর পূর্বদিকে এগোতে রাজী হল না। লোকপরম্পরায় গ্রীক সৈন্যরা মগধ রাজ্যের রাজার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা জেনেছিল। সেই কারণে মগধ জয়ের সংকল্প ছেড়ে বিপাশার পশ্চিম প্রান্ত থেকেই ফিরে গেল। ফিরবার সময় আলেকজাণ্ডার তাঁর সৈন্যদলকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। একদলকে জলপথে নৌ-সেনাপতি নিয়ারকম-এর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। আর একদলকে স্থলপথে নিজের অধীনেই পরিচালনা করে ফিরে চললেন। তিনি ৩২৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ভারত ছেড়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। ফিরবার সময় তিনি তাঁর অধিকৃত রাজ্যগুলির শাসনভার ১৭ জন ক্ষত্রপের হাতে তুলে দেন। ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ম্যাসিডোনিয়ার পথে ব্যাবিলনে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

ফলাফল ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফলকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। তা হল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল। প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে ঃ (১) ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সাময়িকভাবে কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশের স্থাপনা, (২) ভারত ও গ্রীসের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছিল, পাশ্চাত্য কয়েকটি দেশের মধ্যে স্থলপথ ও জলপথ আবিষ্কৃত হয়েছিল ।

কিন্তু পরোক্ষ ফলই বেশি। (১) উত্তর-পশ্চিম ভারতের ছোট ছোট পৃথক রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে একটি অখণ্ড ভারত গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সকল বিবদমান রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী সার্বভৌম ভারতবর্ষ গঠন করেন। (২) ভারতীয় চারুকলা ও শিল্পের উপর গ্রীক ও রোমান শিল্পের প্রভাব দেখা দিয়েছিল। কণিষ্কের সময় যে গান্ধার শিল্পের উন্নতি হয়েছিল তা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণেরই পরোক্ষ ফল। (৩) ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক পথ নতুনভাবে নাবিকদের কাছে খুলে যায়। (৪) প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার উপর কখনও কখনও গ্রীক দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি চিত্রিত হয়েছিল। (৫) ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রীক প্রভাব পড়ে। (৬) ভারতীয় ইতিহাসের অমূল্য উপাদান পাওয়া গেল গ্রীক মনীষীদের রচনায়।

মৌর্যদের পতনের পর ব্যাকট্রিয় গ্রীক শক ও পহ্লবদের শাসন ঃ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের পর থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত দিয়ে একে একে 'যবন', 'শক' ও 'পহ্লব'— এই তিন বিদেশী শক্তি ভারতে অনুপ্রবেশ করে। সর্বপ্রথম ব্যাকট্রিয় গ্রীকরা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে উপনিবেশ তৈরি করে। গ্রীক রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইউথিডেমাস ভারত অভিযান করেন এবং আনুমানিক ২০৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে কাবুল অধিকার করেন।

তাঁর পুত্র ডিমিট্রিয়াস উত্তর-পশ্চিম ভারতে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একটি গ্রীক-রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি আফগানিস্তান, পাঞ্জাব ও সিন্ধুনদের উপকূলবর্তী স্থানগুলি দখল করে নিয়েছিলেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকে জানা যায় যে মগধরাজ পুষ্যমিত্রের সঙ্গে ডিমিট্রিয়াস-এর যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে ডিমিট্রিয়াস পরাজিত হন। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৭১ অব্দে গ্রীক সেনাপতি ইউক্রেটাইডিস ব্যাকট্রিয়ার সিংহাসন দখল করেন

ডিমিট্রিয়াস আধুনিক শিয়ালকোট অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৬৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ডিমিট্রিয়াসের মৃত্যু হলে ইউক্রেটাইডিস তাঁর রাজ্যটি দখল করেন। ইউক্রেটাইডিসের মৃত্যু হলে গ্রীক সেনাপতিদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সমস্ত গ্রীক রাজ্যটি বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ব্যাকট্রিয় গ্রীক রাজাগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতেই রাজত্ব করতে থাকেন। এই সব রাজাদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হলেন মিনান্দার। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন, ১১৫ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৯০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত মিনান্দার রাজত্ব করেন। স্ট্রাবো, প্লুটার্ক প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মিনান্দারকে খুব পরাক্রমশালী রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রাগুলি পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্বে মথুরা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে পাওয়া গেছে। এছাড়াও রাজা অ্যান্টিয়েলকিডাস, হেলিওডোরাস, অ্যাপোলোডোটাস প্রভৃতি বহু গ্রীক রাজার নাম আমরা তাদেরই প্রবর্তিত মুদ্রা থেকে জানতে পারি।

ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের সম্বন্ধে জানার-ও একমাত্র উপায় এই মুদ্রা। ঐতিহাসিকদের অনুমান ব্যাকট্রিয় গ্রীক রাজারা প্রায় ২০০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ভারতে তাদের রাজত্ব শুরু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই এই গ্রীক রাজারা ইউথিডিমাস ও ইউক্রেটাইডিস্—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এরা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে শক ও পহ্লব জাতি ভারতে অধিকৃত গ্রীক-রাজ্য আক্রমণ করতে থাকে। নানা কারণে দুর্বল গ্রীকগণ এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না। অবশেষে পহ্লবরাজ মিথ্রিডেটাস (আঃ ১৭১ থেকে ১৩১ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)-এর অধীনে পহ্লব সৈন্যরা গ্রীক রাজা হারমিউয়েসকে পরাজিত করে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটান।

শক জাতি ঃ শকরা মূলতঃ একটি যাযাবর জাতি। অনেকের মতে শক জাতির আদি নিবাস ছিল মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত সিরদরিয়ায়। খ্রীষ্টপূঃ দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি এরা ব্যাকট্রিয়া ও পার্থিয়া দখল করে। তারপর আরও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে তারা 'সিস্তান' বা শকস্তানে বাস করে। আরও পরে তারা ভারত অভিযান করে পশ্চিম-ভারত ও সিন্ধু উপত্যকায় কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। ভারতের ইতিহাসে শকরাজগণ "ক্ষত্রপ" নামে পরিচিত ছিলেন। এই ক্ষত্রপরা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ উত্তরাঞ্চলীয় ক্ষত্রপ ও পশ্চিমী ক্ষত্রপ। মথুরা, পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি ক্ষত্রপদের উত্তরাঞ্চলীয়-ক্ষত্রপ এবং সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রপদের পশ্চিমী ক্ষত্রপ বলা হত।

উত্তরাঞ্চলে যে ক'জন শক ক্ষত্রপ ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হলেন ময়েস বা মোগ। তিনি 'মহারাজ', 'রাজাধিরাজ' প্রভৃতি সার্বভৌম উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। কাবুল, পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি ও পূর্ব-পাঞ্জাব পর্যন্ত তিনি রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন প্রথম আজেস এবং তারপর রাজা হয়েছিলেন দ্বিতীয় আজেস। ইতিমধ্যে পহ্লবদের রাজা গণ্ডোফার্নিস সিন্ধু-উপত্যকা দখল করে নেন।

শকদের একটি শাখা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে আর একটি শকরাজ্য স্থাপন করে নিজেদের 'ক্ষহরত' নামে পরিচয় দিত। এদের রাজধানী ছিল নাসিক। এই বংশের সবথেকে উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন নহপান। তাঁর উপাধি ছিল মহাক্ষত্রপ। প্রত্নতত্ত্বের

উপাদান থেকে জানা যায় যে, নহপান সাতবাহনরাজ গৌতমী-পুত্র সাতকর্ণীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তিনি সৌরাষ্ট্র, মালব, আজমীর, মহারাষ্ট্র ও কোঙ্কনের উত্তরাংশ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। রাজা ভূমক ছিলেন নহপানের পূর্বসূরী।

শকদের আর একটি শাখা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চষ্টন। এরা 'কার্দমর্ক' নামে পরিচয় দিতেন। অনেকের ধারণা এ-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন রুদ্রদামন। জুনাগড় থেকে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এর তারিখ হল ৭২ শকাব্দ অর্থাৎ (৭২+৭৮) বা ১৫০ খ্রীঃ অব্দে। এই লিপিটিতে রুদ্রদামনের বিজয়াভিযান সহ কিছু প্রশাসনিক সংস্কারের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিকদে ব অনুমান নহপান ১১৯ থেকে ১২৪ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আর রুদ্রদামন ৩০ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি সাতবাহনরাজ পুলমায়ীকে পরাজিত করে সমস্ত হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ঐ শিলালিপি থেকে আরও জানা যায় যে, রুদ্রদামন সুন্দর জলসেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। 'সুদর্শন হ্রদ' নামে একটি হ্রদকে তিনি সংস্কার করে পাশেই একটি বাঁধের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি একজন দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি মালব, কাথিয়াওয়ার, গুজরাট, মাড়ওয়াড়, সিন্ধু উপত্যকা এবং উত্তর কোঙ্কন জয় করে শক জাতির শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। রুদ্রদামনের পর আর কোন স্মরণীয় শক রাজার উল্লেখ আমরা পাই না। এরপর দক্ষিণ দিক থেকে সাতবাহন রাজাদের আক্রমণ ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে পারসিক আক্রমণে শকরা দুর্বল হয়ে পড়ে। সর্বশেষ আঘাত হানেন গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ইনি শকদের দমন করে 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন।

পহ্লব ঃ ভারত সীমান্তে ব্যাকট্রিয় গ্রীকগণের শাসনের অবদান ঘটিয়ে পহ্লবরা রাজত্ব শুরু করেন। আনুমানিক ১৭১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে মিথ্রিডেটাস্ সর্বশেষ গ্রীকরাজা ইউক্রেটাইডিসকে পরাজিত করে পহ্লবদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। পহ্লবরাজ ফ্রাওটিস যখন তক্ষশিলায় রাজত্ব করছিলেন তখন পেশোয়ার অঞ্চলটি শকদের কাছ থেকে পহ্লবরা দখল করে নেয়। পহ্লবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গণ্ডোফার্নিস। তিনি গ্রীকরাজা হারমিডসকে পরাজিত করে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দক্ষিণ- আফগানিস্তান, কাবুল, কান্দাহার, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতি দেশগুলি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁরই রাজত্বকালে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক সেন্ট টমাস ভারতে এসেছিলেন। তখৎ-ই-বহি লিপি থেকে গণ্ডোফার্নিস সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। তাঁর মৃত্যুর পর পহ্লবদের মধ্যে আর কোন উল্লেখযোগ্য রাজা রাজত্ব করেন নি। সমস্ত রাজ্যটি শেষ পর্যন্ত কুষাণদের অধীনে চলে যায়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প ঃ ভারতীয় জনসমাজে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ—বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগসাধন—মৌর্যশিল্প। (Social and economic condition—With reference to agriculture, trade and industry—Foreign elements in the population—contacts with the outside world—Mauryan art.)

আনুমানিক ৩২৪ খ্রীঃ পূঃ অব্দ থেকে (চন্দ্রগুপ্তর সিংহাসন প্রাপ্তি) আনুমানিক ১৮৭

খ্রীঃ পূঃ অব্দঃ (রাজা বৃহদ্রথের হত্যা) পর্যন্ত সময় ভারত ইতিহাসে মৌর্যযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর পর শুঙ্গ (১৮৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দ থেকে ৭৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) ও কান্ব (৭৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ থেকে ৩০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) বংশ রাজত্ব করে। তারপর একটি শাখা দক্ষিণ-ভারতে সাতবাহন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। আর উত্তর-ভারতে তখন কয়েকটি বিদেশী শক্তির ক্ষমতা লড়াইয়ের দ্বন্দ্ব।

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে একের পর এক ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে সাম্রাজ্যবিস্তার করে দেশীয় অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সামাজিক অবস্থা ঃ ভারতীয় সমাজে উপরি-উক্ত বিদেশীদের অনুপ্রবেশের ফলে এক মিশ্র সভ্যতার সৃষ্টি হয়। বিদেশীরা এখানকার সংস্কৃতি গ্রহণ করে ভারতীয় জনসমাজে মিশে যায়। আবার পক্ষান্তরে ভারতীয়রাও কিছু কিছু বিদেশী সংস্কৃতি গ্রহণ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, পশ্চিম-ভারতে রাজপুত জাতির মধ্যে শক ও হূণ জাতির প্রভাব বিশেষভাবে বোঝা যায়। বিদেশীদের সঙ্গে স্থানীয়দের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হল। দক্ষিণ-ভারতে সাতবাহনরা গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁরাও শেষ পর্যন্ত উক্ত বিদেশীদের বিশেষ করে শক রাজাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে রাজপুতগণ বিজাতীয় বংশ থেকে জন্মেছেন। অনেকের ধারণা এই সমস্ত বিজাতীয় শক্তিকে সংরক্ষণশীল হিন্দুরা ভালো চোখে দেখত না। সম্ভবত, সেই কারণেই গ্রীক ও কুষাণরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখায়। তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতা ও গোঁড়ামিকে সহ্য করতে পারত না। এদিক থেকে বৌদ্ধধর্ম ও ভাগবত- ধর্মকে তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করত।

গ্রীক রাজা মিনান্দার ও কুষাণ রাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়েছিলেন। 'মিলিন্দপইহো' গ্রন্থটিতে মিনান্দার বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের সঙ্গে যে-তত্ত্বগত আলোচনা করেছিলেন তার উল্লেখ আছে। কুষাণরাজ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তা প্রচারের জন্যে সবরকম ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি পেশোয়ারে সর্বাস্তবাদী ভিক্ষুদের জন্যে একটি বিখ্যাত বিহার নির্মাণ করান। আবার বেশনগর স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে, গ্রীক রাজা অ্যান্টিয়েলকাইডাসের গ্রীক দূত হোলিওডোরাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে একটি গরুড় স্তম্ভ তৈরি করান। কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম কদফিসেস-এর পুত্র দ্বিতীয় কদফিসেস এবং সর্বশেষ রাজা বাসুদেব তাঁদের প্রবর্তিত মুদ্রায় শিব ও তার বাহন ষাঁড়কে প্রতীকী হিসেবে মুদ্রিত করেন। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাঁরা শৈবধর্মে অনুরাগী ছিলেন। কুষাণদের বেশিরভাগ রাজাই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হলেও জৈনধর্মের প্রতিও তাঁদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। মথুরা ছিল কণিষ্কের সময় জৈনদের প্রধানকেন্দ্র। এখানে দিগম্বর সম্প্রদায়ের বহু মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ জুনাগড় পাথুরে লিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে শক রাজা রুদ্রদামন ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাঁধ দেবার জন্যে সুদর্শন হ্রদটিকে সংস্কার করেন। এ

থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, শকরাজারা জলসেচের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতেন। সেই সময় বেশির ভাগ লোকেরই জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। শকদের মতো কুষাণরাও জমিতে জলসেচের সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। জমির রাজস্ব সাধারণতঃ $^{১}/_{৬}$ থেকে $^{১}/_{৩}$ পর্যন্ত ধার্য করা হত।

শক ও পহ্লবদের যুগে কৃষির সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তবে কুষাণ যুগে বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে। এই সময়ে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য খোটানের মধ্য দিয়ে কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চল পর্যন্ত রপ্তানি হত। ব্যাক্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার সংযোগ স্থাপিত হলে এই বাণিজ্য আরও বেশি বিস্তার লাভ করে। ভৃগুকচ্ছ বা বর্তমান ব্রোচ বন্দরে পশ্চিম-এশিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে সরাসরি বাণিজ্য জাহাজ আসত। যেসব ব্যবসায়ী সিন্ধু অঞ্চলে থাকত—তারা তাদের ব্যবসা রক্ষার জন্যে কচ্ছ ও বোম্বাই অঞ্চলে চলে এসে ব্রোচ বন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা চালাত। এইভাবে শক-কুষাণদের আমলে ভৃগুকচ্ছ বন্দরের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১ম শতাব্দীর লেখা 'দি পেরিপ্লাস অব্ দি ইরিথ্রিয়ান সী'-তে লেখক উল্লেখ করেছেন যে 'বারিগর্জা'বা ভৃগুকচ্ছ বন্দরটি শক-ক্ষত্রপরা নিয়ন্ত্রণ করতেন। শক রাজাদের শাসনকালে সিন্ধুর বারবারিকাম বন্দরের গুরুত্ব কমে গিয়ে বারিগর্জা বা ভৃগুকচ্ছ বা বর্তমান ব্রোচ বন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যায়। এই বন্দর দিয়েই চীনদেশে রেশম রপ্তানি হত।

বহির্বিশ্ব ছাড়া অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও শক ও কুষাণ যুগে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। স্থলপথে এবং প্রয়োজনমতো জলপথে রাওয়ালপিণ্ডি পেশোয়ার, বারাণসী, মথুরা, উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি নগরগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ যুগে দাক্ষিণাত্যেও যথেষ্ট বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল। পণ্ডিচেরীর কাছে আরিকামেড়ু নামে এক শিল্পনগর ছিল রোমানদের বিশেষ বাণিজ্যকেন্দ্র।

তবে এই বাণিজ্য প্রসারের ফলে সমাজে বণিকশ্রেণীর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেড়ে ওঠে। শ্রেষ্ঠী বা শ্রেণী নামে বণিকসমাজ যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। বিভিন্ন পরিষদ ও নিগমগুলিতে শ্রেষ্ঠীদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

কুষাণযুগে বাংলাদেশে যথেষ্ট রোমীয় সোনার মুদ্রার আমদানি হয়। এ থেকে আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারি যে কুষাণযুগে রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলত। বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও বিকাশ ঘটল। নানা ধরনের কুটির-শিল্পের কাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। একই সঙ্গে নিগম ও সঙ্ঘ স্থাপিত হল। এই সময় পাথর খোদাই শিল্পের প্রসার ঘটে। তাছাড়া রেশম, সূতীবস্ত্র, হাতির দাঁতের কাজ, সোনা-রূপার গয়নার খোদাই কাজ, লোহার শিল্প, চামড়া শিল্পের কাজ প্রভৃতির দারুণভাবে প্রসার ঘটে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরোক্ষ ফল হিসেবে দেখা দিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সুদূর-প্রসারী যোগসূত্র। গ্রীক-সেনানীর যাতায়াতের পথ উত্তর-পশ্চিম ভারত হয়ে এশিয়া মাইনর ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের স্থলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হল। শুরু হল ব্যবসা-বাণিজ্য। ক্রমে তা থেকে এল সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদানপ্রদান। সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-শিল্পকলা সকল বিষয়ে ঘটে অকৃপণ দেওয়া-নেওয়া। যেমন ভারতীয় শিল্পে লাগে গ্রীক ঘরানার ছোঁয়া, তেমনি গ্রীক-শিল্প সাহিত্যও ভারতীয় সংস্কৃতির কাছে

হল ঋণী।

মৌর্য ও মৌর্যোত্তরকালে গ্রীকদের কাছ থেকে আমরা পেলাম ধ্রুপদী গ্রীক সাহিত্যের বিয়োগান্ত নাটক। ওদের পণ্ডিতেরা এ-দেশ থেকে আহরণ করল ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় ধর্ম। নজির আছে, বাহ্লীক গ্রীকসমাজে 'মহাভারত' জনপ্রিয় ছিল। পায়লী ভাষায় রচিত "নিলিপ্ত পঞ্চহো" মিনান্দারের বৌদ্ধ-ধর্মানুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। স্থলপথে পারস্য মিশরের সঙ্গে সার্বিক যোগবন্ধন গ্রথিত হয়েছিল।

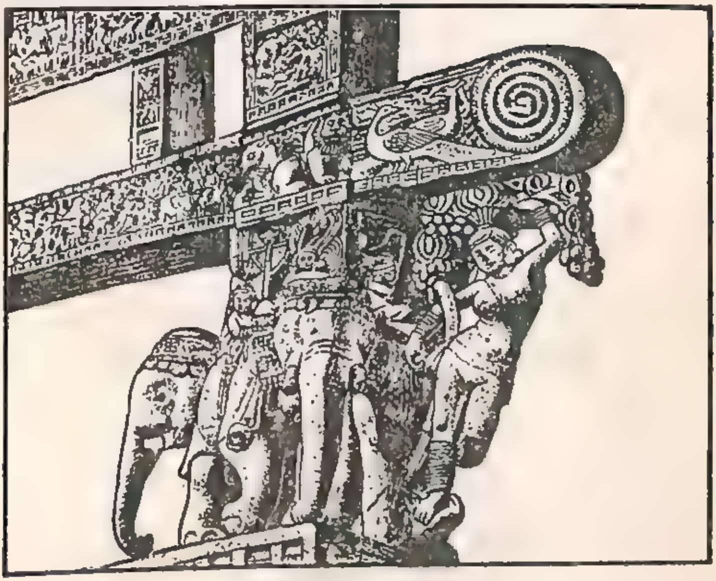

সাঁচীর তোরণ

পরবর্তী সময়ে এক সমৃদ্ধ বহির্বাণিজ্যের উত্তরাধিকার ভারতবর্ষ লাভ করেছিল। মৌর্যযুগে মিশর, সিরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেন-দেন ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমের সঙ্গেও ব্যাপক বাণিজ্যের নিদর্শন আছে।

শিল্পকলা ঃ মৌর্য শিল্পকলা নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিফলন। স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে স্তূপ, চৈত্য ও অসংখ্য গুহামন্দির এ-যুগে তৈরি হয়। মৌর্য-পরবর্তীযুগে পাহাড় কেটে মন্দির তৈরি করা হয়। সাঁচীর স্তূপ এ যুগের এক অতি উজ্জ্বল স্থাপত্যের নিদর্শন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সময় ভারতের শিল্পকলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মেগাস্থিনিস, স্ট্রাবো, অ্যারিয়াসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ মৌর্যযুগের এক অতি উচ্চমানের স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। এ-প্রসঙ্গে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ও নেপালের দেবপত্তন নগরীর প্রতিষ্ঠা উল্লেখ করা যেতে পারে। সমুদ্রের কাছাকাছি বাড়িগুলি ছিল কাঠের তৈরি আর রাজপথ, বাগানবাটী, সারনাথ, বুদ্ধগয়া, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি স্থানের স্তূপ ও স্তম্ভ প্রমাণ করে যে, মৌর্যস্থাপত্য আজও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য।

ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। সারনাথ স্তম্ভশীর্ষের সিংহমূর্তিগুলির সুন্দর গড়ন, দেহসৌষ্ঠব এবং মসৃণতা শিল্পীদের অনুপাত জ্ঞান ও শিল্পদক্ষতার উজ্জ্বল নিদর্শন। আজীবিক গুহাগুলিতে নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছিল। আজও সেগুলি মৌর্য শিল্পনিপুণতার পরিচয় দেয়। ঐতিহাসিকদের ধারণা যে, মৌর্যশিল্পে একদিকে গ্রীক ও আর একদিকে পারসিক প্রভাব পড়েছিল। প্রসিদ্ধ শিল্প বিশারদ মঁসিয়ে স্যেনার্তর মতে মৌর্য যুগে পাথরে যে মসৃণতা দেখা যায় তা অবশ্যই পারসিক শিল্প কৌশলের প্রভাব।

অশোক স্তম্ভ

শক, পহ্লব ও কুষাণ যুগে ভারতের বাইরের দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। এই যোগাযোগ অবশ্যই আত্মিক ও সাংস্কৃতিক। যে সব দেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলি ছিল আফগানিস্তান, মিশর, রোম, আলেকজান্দ্রিয়া, চীন ও মধ্য-এশিয়া, নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস (History of the Kushana Empire) :

আনুমানিক ১৬৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মধ্য-এশিয়ার উজবেকিস্তান থেকে এক যাযাবর জাতি জীবিকার সন্ধানে পূর্বদিকে যাত্রা করে। এই জাতির নাম ইউ-চি। ভারতে কুষাণরা ছিলেন এক ইউ-চি জাতির শাখা। এদের আদি নিবাস ছিল চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে, কান-সু প্রদেশে। সেখান থেকে অপর এক যাযাবর জাতি তাদের তাড়িয়ে দেয়। তখন তারা

পশ্চিম দিক ধরে অক্ষ নদীর উপত্যকায় বাস করতে থাকে। পরবর্তীকালে তারা মোট পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। ভারতে যে-শাখাটি সাম্রাজ্য গঠন করে সেই শাখাটি 'কুষাণ' নামে পরিচিত।

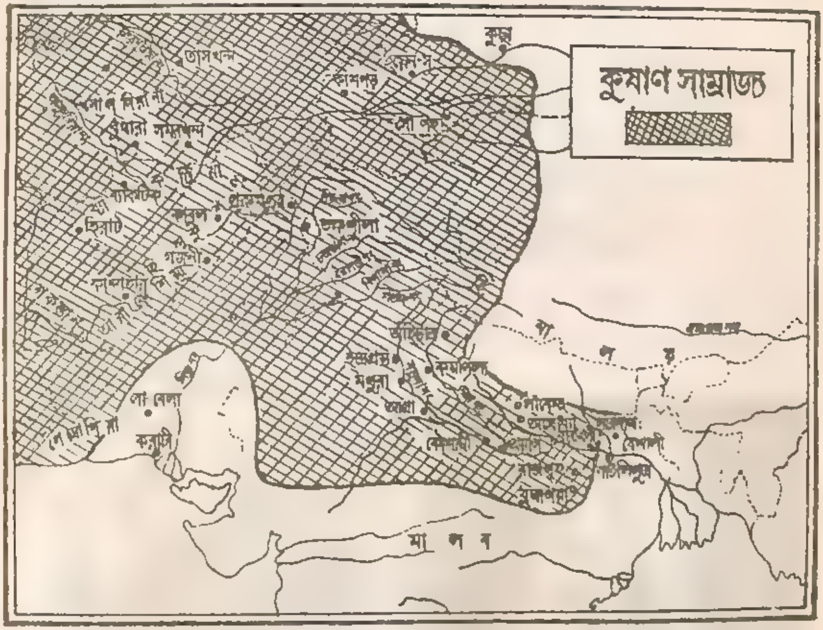

কুষাণ নেতা কুজুল কদফিসেস্ আনুমানিক ৪৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ দিক ধরে পহ্লবরাজাকে পরাজিত করেন এবং ভারতবর্ষের সীমান্তে কুষাণ আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনিই ভারতবর্ষে কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র বিম কদফিসেস আনুমানিক ৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিই প্রথম কুষাণ রাজা যিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তাঁর অধীনে সমগ্র পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশের কিছু অংশ ছিল। তিনি সোনার মুদ্রা প্রবর্তন করেন। সিন্ধু উপত্যকার ছোট ছোট রাজ্যগুলি জয় করে সেখান থেকে পহ্লবদের বিতাড়িত করেন। তিনি শৈবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কণিষ্ক রাজা হন।

কণিষ্ক ছিলেন কুষাণরাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। একসময় কণিষ্কের সিংহাসন প্রাপ্তির কালপঞ্জী নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। কণিষ্ক থেকে বাসুদেবের আমল পর্যন্ত যে ক'টি প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে তার সব ক'টিতেই তারিখ হিসেবে একটি অব্দকে অনুসরণ করা হয়েছে। এই অব্দটি নিয়েই পণ্ডিতদের মধ্যে নানারকম গবেষণা। কেউ বলেন কণিষ্ক থেকে যে অব্দের শুরু সেটি বিক্রমাব্দ, কারও কারও মতে এই অব্দটি পুরাতন শকাব্দ, কারও মতে এটি কালচুরি অব্দ, আবার কারও মতে এটি শকাব্দ। বর্তমানে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই শেষোক্ত মতটিকে গ্রহণ করেছেন। তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি কণিষ্কই শকাব্দের প্রতিষ্ঠা করেন ও ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে

আরোহণ করেন।

কুষাণ-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে কণিষ্ক ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, কণিষ্ক কাশ্মীর, তাসখন্দ, খোটান, কাশগড়, কাবুল, গান্ধার (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ার), গাজীপুর ও গোরখপুর প্রভৃতি রাজ্য জয় করে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি চীনসম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। হিউ-এন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে তিনি একজন চীন রাজকুমারকে তাঁর রাজসভায় বন্দী করে রেখেছিলেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে খোরাসান থেকে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে খোটান থেকে দক্ষিণে কোঙ্কণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা বর্তমান পেশোয়ার। বাংলাদেশে কণিষ্কের আমলের বহু সোনার মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, কণিষ্কের সময় বাংলাদেশ কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার অনেকে মনে করেন যে, কণিষ্কের সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বহির্ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ হয়েছিল।

কণিষ্ক

কণিষ্কের মুদ্রা

কণিষ্ক যেমন একদিকে রণনিপুণ ছিলেন, তেমনি সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রা, বৌদ্ধগ্রন্থ ও সমসাময়িক লিপি থেকে জানা যায় যে কণিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় পেশোয়ারে (মতান্তরে জলন্ধরে) একটি বৌদ্ধ ধর্মসম্মেলন হয়েছিল। এটিই চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ সংগীতি। এই সম্মেলনে 'মহাযান' মতবাদ স্বীকৃত হয় এবং 'হীনযান' মতবাদ পরিত্যক্ত হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বসুমিত্র। এই সময়ে

'ত্রিপিটক' গ্রন্থ তিনটির ওপরে প্রচুর টীকা তৈরি করা হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে তিনি চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি পেশোয়ারে একটি বিরাট বৌদ্ধমঠ তৈরি করেছিলেন। তখনকার দিনে এই মঠটিই ছিল আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

কণিষ্কের রাজসভায় ঘটেছিল কয়েকজন গুণী-ব্যক্তির সমাদর। তাঁদের মধ্যে বসুমিত্র, নাগার্জুন, চরক ও অশ্বঘোষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চরক ছিলেন আয়ুর্বেদ-বিশেষজ্ঞ ও স্বয়ং কণিষ্কের চিকিৎসক। কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ ছিলেন এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত 'বুদ্ধচরিত' একটি অমূল্য গ্রন্থ। কুষাণ যুগে সরকারী ভাষা ছিল পালি। শিল্পের দিক থেকেও কণিষ্কের অবদান যথেষ্ট। তাঁরই সময়ে বিখ্যাত গান্ধার শিল্পের ঘটে বিকাশ। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। শিক্ষা প্রসারের দিক থেকেও কণিষ্কের অবদান কম নয়। তক্ষশিলা শহরটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। এখানে ছিল সমসাময়িক ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়।

কণিষ্কের আমলের যে কটি শিলালিপি পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি অন্ততঃ ২৩ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। যোদ্ধা, প্রশাসক, শিল্পানুরাগী, সাহিত্যপ্রেমী ও একনিষ্ঠ ধার্মিক হিসাবে কণিষ্ক ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে একজন। এই সব কারণে তাঁকে কুষাণ সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়ে থাকে।

কুষাণ যুগে চীন, মধ্য-এশিয়া এবং রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও কুষাণ যুগ ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাশ্মীরের কণিষ্কপুর নগরী, অমরাবতীর বৃহৎ প্রস্তর, মথুরায় প্রাপ্ত কণিষ্কের মূর্তি নিঃসন্দেহে শিল্পকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাতবাহন সাম্রাজ্য (Satavahana Empire)ঃ আনুমানিক ৩০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে কাম্ব রাজবংশের সর্বশেষ রাজা সুশর্মনের মৃত্যু হলে দাক্ষিণাত্যে রাজা সিমুক সাতবাহন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মৎস্য পুরাণে সাতবাহন রাজাদের 'অন্ধ্রভৃত্য' বলা হয়েছে।

প্রত্নতত্ত্বের উপকরণ থেকে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠান নগরী (বর্তমান ঔরঙ্গাবাদ জেলার পৈঠান) ছিল সিমুক সাতকর্ণির রাজধানী। অবশ্য তাঁর কিংবা তাঁর পুত্র কৃষ্ণ সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় নি। এই বংশের তৃতীয় রাজা সাতকর্ণি কিছু রাজ্য জয় করে ভৌগোলিক সীমা বৃদ্ধি করেছিলেন। ইনি মালবের পূর্ব দিক জয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং 'দক্ষিণাপতি' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তারপর এই রাজ্যের বেশ কিছু অংশ শকজাতির অধীনে চলে যায়। কয়েক বছর এই রাজবংশের ইতিহাস আমাদের কাছে অজানা অবস্থায় থাকে।

নাগনিকার নানাঘাট লিপি থেকে জানা যায় যে, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি একের পর এক রাজাদের পরাজিত করে নিজের রাজ্যসীমা বাড়িয়ে তুলেছিলেন। আনুমানিক ১০৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণি রাজা হন। তিনি ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। নাসিক প্রশস্তি থেকে আমরা এই রাজার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি। তিনি শক ক্ষত্রপ নহপান ও তাঁর সেনাপতি ঋষভদত্তকে নিজ বাহুবলে পরাজিত করে মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, মালব, বেরার, উত্তর কোঙ্কন অধিকার করেন। এ ছাড়াও তিনি অনুপ বা নর্মদা উপত্যকা, মূলক বা প্রতিষ্ঠান বা বর্তমান পৈঠানের কাছাকাছি অঞ্চল জয় করেন। সভাকবির বিবরণ অনুসারে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি পূর্বঘাট থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। তবে অনেক ঐতিহাসিক এই ভৌগোলিক সীমাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন নি। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মনে করেন অন্ধ্রদেশে আলাদাভাবে শিলালিপিতে নামোল্লেখ না থাকলেও তা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির রাজত্বের অঙ্গ ছিল। উত্তরে-দক্ষিণে তাঁর রাজ্যসীমা ছিল বিন্ধ্যপর্বত থেকে ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত। নাসিক প্রশস্তি থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতা খর্ব করে ব্রাহ্মণজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কোন কোন সূত্রে তাঁকে সমাজসংস্কারক হিসেবেও চিত্রিত করা হয়েছে।

সাতবাহন রাজাদের মুদ্রা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। জগাল-থুম্বি সংগ্রহ ভাণ্ডারে যে সকল মুদ্রা আছে তার মধ্যে শক রাজা নহপানের প্রবর্তিত মুদ্রার অনেকগুলিতেই নহপানের নাম কেটে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি নিজের নাম অঙ্কিত করেছেন। নাসিক প্রশস্তিতে যা বলা হয়েছে এই মুদ্রার দ্বারা তা আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

যোদ্ধা হিসেবে গৌতমীপুত্র যতখানি সফল, শাসক হিসেবেও তিনি ততখানি সার্থক। প্রথমেই তিনি রাজস্ব বিভাগের পুনর্বিন্যাস করেন। এ ক্ষেত্রে রাজা অশোকের মতোই তিনি সকল প্রজার মঙ্গল সাধনে ব্রতী ছিলেন। তিনি দরিদ্র শ্রেণীর উপর করভার কমিয়ে দেন। তাঁরই রাজনৈতিক প্রতিভাবলে দক্ষিণ ও মধ্য-ভারতে শক জাতিরা কোন আক্রমণ করতে পারেনি। তিনি যেমন বর্ণাশ্রমের সমর্থক ছিলেন তেমনি বৌদ্ধধর্মেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি যেসব বৌদ্ধ বিহারে ভূমিদান করতেন তার মধ্যে কার্লে ও নাসিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবে রাজত্বের শেষ দিকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি শকদের কাছে পরাজিত হন। সাহিত্যের উপকরণ থেকে জানা যায় যে, শকরাজ চষ্টন ও রুদ্রদামন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণিকে পরাজিত করে মালব ও অন্যান্য রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আনুমানিক ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির মৃত্যু হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস (History of The Gupta Empire)ঃ

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর (আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টাব্দে) উত্তর-ভারতের রাজনীতি প্রায় ১০০ বছর ধরে অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার ইতিহাসের সাক্ষ্য

বহন করে। কোন একচ্ছত্র সাম্রাজ্য এই সময়ে ছিল না। আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগুপ্তের নেতৃত্বে মগধে গুপ্ত রাজবংশের শাসন কায়েম হয়।

চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে মহারাজ শ্রীগুপ্ত নামে এক ব্যক্তি মগধে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ গুপ্ত। ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। আনুমানিক ৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজেকে পরমভট্টারক পরম ভাগবত মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত নামে পরিচয় দিতেন। তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে একমাত্র উপকরণ হল এলাহাবাদ প্রশস্তি। এটি লিখেছেন তাঁর সভাকবি হরিষেণ। প্রশস্তটি একটি পাথুরে স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এ প্রশস্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, সমুদ্রগুপ্ত রাজা হবার অব্যবহিত পরেই রাজ্যজয়ের দিকে মন দিলেন। তিনি প্রথমে উত্তর-ভারতের রাজাদের পরাজিত করে তাদের রাজ্যগুলি কেড়ে নিলেন এবং নিজের সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা বৃদ্ধি করেন। পরাজিত রাজাদের তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দিলেন। এদের মধ্যে নয় জনের নাম আমরা প্রশস্তি থেকে জানতে পারি। অচ্যুত, নাগসেন, গণপতি নাগ, রুদ্রদেব, মত্তিল, নাগদত্ত নন্দিন, বলবর্মন ও চন্দ্রবর্মন। পরাজিত রাজারা রাজ্যহারা সমুদ্রগুপ্তের আশ্রিত হয়ে বাস করতেন। এরপর তিনি অটবীক রাজ্য জয় করেন। অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্য-অঞ্চল তিনি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে আমরা সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যন্ত রাষ্ট্র সম্বন্ধে জানতে পারি। এই রাষ্ট্রগুলি হলঃ সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপালক, কর্তৃপুর। এই রাজ্যগুলি ছিল অনেকটা সামন্ত রাজ্যের মতো। এরা সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল না, আভ্যন্তরীণ শাসনক্ষেত্রে এরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তকে এরা প্রত্যেকে বাৎসরিক কর দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে ও যখন রাজা দরবার করবেন তখন অবশ্যই সশরীরে সেই দরবারে উপস্থিত থাকতে হবে।

উত্তর-ভারত জয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ-ভারত জয় করতে সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। হরিষেণ প্রশস্তি থেকে জানতে পারি যে, সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের বারো জন রাজাকে পরাজিত করেন। এই পরাজিত রাজারা হলেনঃ (১) কোশলের মহেন্দ্র (২) মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ (৩) কৌরলের মণ্টরাজ (৪) পিষ্ঠপুরমের মহেন্দ্রগিরি (৫) কোত্তুরের স্বামীদত্ত (৬) এরণ্ডপল্লের দামন (৭) কাঞ্চির বিষ্ণুগোপ (৮) বেঙ্গীর হস্তিবর্মন (৯) অবমুক্তার নীলরাজ (১০) পলাক্কের উগ্রসেন (১১) দেবরাষ্ট্রের কুবের (১২) কুস্থলপুরের ধনঞ্জয়। দক্ষিণ-ভারতের রাজাদের কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় স্বাধীনতা প্রদান করলেন। পরাজিত রাজাদের তিনি স্ব স্ব রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। এক কথায়, সমুদ্রগুপ্ত তাদের প্রত্যেককে স্বপদে বহাল রাখলেন। কেবলমাত্র বাৎসরিক কর ও দরবার হলে সেখানে উপস্থিত হবার চুক্তিতে দাক্ষিণাত্যের রাজাদের পুরোপুরি স্বাধীনতা দিলেন। অথচ উত্তর-ভারত বা আর্যাবর্তের পরাজিত রাজাদের ক্ষেত্রে সমুদ্রগুপ্ত সম্পূর্ণভাবে তাদের ক্ষমতা

নির্মুল করে দিলেন। দুটি অভিযানে দুরকম ব্যবস্থা নিলেন সমুদ্রগুপ্ত। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ব্যাখ্যা করেছেন যে, সমুদ্রগুপ্ত উত্তর-ভারতে দিগ্বিজয়ীর ভূমিকা এবং দক্ষিণ-ভারতে ধর্ম-বিজয়ীর ভূমিকা পালন করেছেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা আর্যাবর্তের প্রতিটি রাজা সমুদ্রগুপ্তের প্রাসাদের নিকটবর্তী ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের রাজাগণ ছিলেন বহু দূরে। সেইহেতু নিকটবর্তী রাজাদের স্বাধীনতা খর্ব করে রাজ্যগুলিকে নিজের অধীনে রেখে সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। আর দূরবর্তী রাজ্যগুলিকে নিজের অধীনে রাখা প্রশাসনের দিক থেকে অসুবিধাজনক ছিল। সুদক্ষ কূটনীতিবিদ সমুদ্রগুপ্ত তাই দুইটি অভিযানে দুইরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কয়েকটি উপজাতির নাম দেওয়া আছে। এঁরা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করতেন। সমুদ্রগুপ্ত এই সকল উপজাতিকে পরাজিত করে তাদের রাজ্যগুলি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এইসব উপজাতি হল (১) মালব [রাজস্থান] (২) আর্জুনায়ন [জয়পুর] (৩) যৌধেয় [পাঞ্জাবের শতদ্রু-বিপাশা অঞ্চল] (৪) মদ্রক [পাঞ্জাবের ইরাবতী] (৫) আভীর [পাঞ্জাব] (৬) সনকানিক (৭) প্রার্জন [মধ্যপ্রদেশ] (৮) কাক [মধ্যপ্রদেশ] (৯) খরপরিক [উত্তর-পশ্চিম ভারত]।

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা ছিল কয়েকটি রাজ্য বাদে সমগ্র উত্তর-ভারত। যেগুলি তিনি জয় করতে পারেন নি বা যেসব জায়গায় তিনি কোন অভিযান করেন নি সেগুলি হলঃ কাশ্মীর, পশ্চিম-রাজপুতানা, সিন্ধু ও গুজরাট। দক্ষিণে তাঁর রাজ্যসীমা উড়িষ্যার ছত্তিসগড় থেকে তামিলনাড়ুর চিঙ্গেলকোট জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের মিত্রশক্তি হিসেবে সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ, শক, মুরণ্ড, শাহানুশাহী এদের উল্লেখ করেছেন।

শক ক্ষত্রপদের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্ত কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নি। এরা পশ্চিম-ভারতে গুজরাট ও পশ্চিম-মালয়ে বাস করতেন। দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত শকদের পরাজিত করেন নি। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের পরাজিত করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত নানা ধরনের মুদ্রার প্রবর্তন করেছিলেন। এগুলি সবই সোনার। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত অশ্বমেধ প্রতীকী মুদ্রা মুদ্রাজগতে এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

সিংহলের রাজা মেঘবর্ণের সঙ্গেও সমুদ্রগুপ্তের মিত্রতা ছিল, এই মেঘবর্ণ ৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি নিয়ে বুদ্ধগয়ায় একটি মঠ গড়েছিলেন। হরিষেণ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে 'কবিরাজ' বলা হয়েছে। আবার 'বীণাবাদনরত রাজা' এই চিত্রণে সমুদ্রগুপ্ত মুদ্রা প্রবর্তন করেছেন। অনেকে মনে করেন সমুদ্রগুপ্ত সঙ্গীতচর্চা করতেন।

নিজের বাহুবলে সমুদ্রগুপ্ত একটি আঞ্চলিক ভূখণ্ডকে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক সমুদ্রগুপ্তকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়েছেন। ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঃ

মথুরা লিপি থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত বংশের রাজা হন। তিনি সমুদ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। বিশাখদত্তের 'দেবীচন্দ্রগুপ্তম্' নাটক থেকে জানা যায় যে, সমুদ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামগুপ্ত।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁকে খুব বেশি রাজ্য জয় করতে হয় নি। তাঁর রাজত্বের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শকদের সঙ্গে যুদ্ধ। তাঁর পিতা সমুদ্রগুপ্ত শকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে আসেন নি। সেইহেতু পশ্চিম-মালব এবং তার পশ্চিমদিকের রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্ত জয় করতে পারেন নি। উদয়গিরি লিপি থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রী বীরসেন ও সেনাপতি আম্রকাবিকে সঙ্গে নিয়ে শকদের রাজধানী উজ্জয়িনী আক্রমণ করে শক রাজা ক্ষত্রপ তৃতীয় রুদ্রসিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করে আরবসাগর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি মালব জয় সম্পন্ন করে উজ্জয়িনীতে সাময়িকভাবে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। শকরাজাকে পরাজিত করে তিনি 'শকারি বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন।

গুপ্ত-রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রথম রূপার মুদ্রার প্রবর্তন করেন। এই রূপার মুদ্রা প্রচলনের মধ্যস্থতায় তিনি গুজরাট জয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ধাতু হিসেবে রূপা পশ্চিম-ভারতের কোন কোন জায়গায় এখনও অধিক গ্রহণীয়। তাঁর মুদ্রাতে সিংহ-শিকাররত যোদ্ধার প্রতিমূর্তি আছে। এই মুদ্রাটিও অনেকের মতে গুজরাট, কাথিয়াওয়াড়, পশ্চিম-মালব প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর জয় ঘোষণা করে। ভারতের মধ্যে সিংহ একমাত্র গুজরাট, কাথিয়াওয়াড় ঐ সমস্ত স্থানেই বেশি পরিমাণে দেখা যায়। তিনি বাকাটকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নিজকন্যা প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে বাকাটক রাজপুত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ দিয়েছিলেন।

দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে মেহেরৌলি গ্রামে একটি লোহার স্তম্ভে কোন এক রাজার বিজয়কাহিনী লেখা আছে। ঐ স্তম্ভে কোন তারিখ উল্লেখ নেই। রাজার নাম হিসেবে শেষের দুইটি অক্ষর 'চন্দ্র' পড়া যাচ্ছে। এই 'চন্দ্র' রাজা কে হতে পারেন এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে বেশির ভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, মেহেরৌলি গ্রামে প্রাপ্ত লৌহস্তম্ভের রাজা চন্দ্র ও গুপ্তবংশের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এক ও অভিন্ন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ঘটেছিল অনেক জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ। এঁদের বলা হত নবরত্ন। কালিদাস, ঘটকর্পর, শঙ্কু, বেতালভট্ট, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ক্ষপর্ণক, বররুচি ও ধন্বন্তরী ছিলেন সেই ন'জন রত্ন। এঁদের মধ্যে কালিদাস ছিলেন সর্বোত্তম। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করায় অনেকে মনে করেন তিনি কিংবদন্তীর 'বিক্রমাব্দের' প্রবক্তা। কিন্তু যিনি 'বিক্রমাব্দের' প্রবক্তা তিনি খ্রীঃ পূঃ ৫৮ অব্দে সিংহাসনে বসেন। সুতরাং কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নন। তাঁর সময়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় গুপ্ত শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে এক সুন্দর বর্ণনা লিখে গেছেন। তাঁর এই বিবরণ তখনকার দিনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার এক মূল্যবান দলিল। ফা-হিয়েন ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে যান। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় সাহিত্য, শিল্পকলা, জ্যোতিষ-বিজ্ঞান ইত্যাদি নবজন্মের রূপ নেয়। ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মারা যান।

কুমারগুপ্ত ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। কুমারগুপ্ত নিজেকে 'মহেন্দ্রাদিত্য' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বহু মুদ্রার প্রবর্তন করেন। তাঁর পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের মতো তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি সামগ্রিকভাবে 'পরমভাগবত' নামে নিজেকে পরিচয় দিলেও কার্তিকেয়-র প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। দাক্ষিণাত্যের সাতারা সংগ্রহভাণ্ডার থেকে কুমারগুপ্তের মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে কুমারগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের একটি অংশ জয় করেন। অনেকের ধারণা কুমারগুপ্ত দাক্ষিণাত্য জয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ডঃ গয়াল মনে করেন যে নল রাজবংশের সঙ্গে জোট বেঁধে কুমারগুপ্ত বাকাটকদের আক্রমণ করেছিলেন। গণ্ডার প্রতিকৃতি মুদ্রার প্রবর্তনে অধ্যাপক ব্রতীন মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, খুব সম্ভব কুমারগুপ্ত আসাম জয় করেন।

কুমারগুপ্ত দীর্ঘ ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। ভিতরি লিপি থেকে জানা যায় যে কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ ভাগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কিছু রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয়। 'পুষ্যমিত্র' নামে একটি উপজাতি এবং হুন জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে আঘাত হানে এবং কুমারগুপ্ত এই আক্রমণের সঠিক জবাব দিতে না পেরে রাজ্যশাসন ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে মনস্থ করেন। এটি তাঁর 'অপ্রতিঘ' প্রতীকী মুদ্রায় প্রতিফলিত হয়েছে। তবে তাঁর সুযোগ্য পুত্র যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত খুব নিপুণতার সঙ্গে হুনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাম্রাজ্যটিকে শত্রুমুক্ত করেন। কুমারগুপ্ত ৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

স্কন্দগুপ্ত ঃ কুমারগুপ্তের পর যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত, ৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। তিনিও নিজেকে 'বিক্রমাদিত্য' নামে পরিচয় দিতেন। স্কন্দগুপ্তই গুপ্তরাজগণের মধ্যে সর্বশেষ পরাক্রমশালী রাজা। তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির ব্যাপারে অনেকে মনে করেন যে স্কন্দগুপ্ত কুমারগুপ্তের প্রধানা মহিষী অনন্তদেবীর পুত্র নন, সেইহেতু স্কন্দগুপ্তের সিংহাসন প্রাপ্তির ন্যায্য অধিকার নেই। অনেকে মনে করেন স্কন্দগুপ্তের সময় সিংহাসন নিয়ে কোন ভ্রাতৃ-বিরোধ হয়েছিল। স্কন্দগুপ্ত স্বীয় প্রতিভাবলে অপর ভাইদের দাবি নস্যাৎ করে সিংহাসন অধিকার করেন। যাই হোক, স্কন্দগুপ্ত রাজা হয়েই রাজ্য জয়ে এবং প্রশাসনিক সংস্কারে মন দিলেন। জুনাগড় পাথুরে লিপি ও ভিতরি স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় স্কন্দগুপ্ত একদিকে হুন ও আর একদিকে পুষ্যমিত্র দুই উপজাতিকে পরাজিত করে গুপ্ত রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশগুলি সুরক্ষিত করেন।

জুনাগড় লিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্কন্দগুপ্ত জলসেচের সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। সৌরাষ্ট্র যে সুদর্শন হ্রদ ছিল তার সংস্কারের জন্য তার কর্মচারী পর্ণদত্ত তা মেরামত করে কৃষিকাজের সহায়ক অবস্থা সৃষ্টি করেছেন।

হূনদের পরাজিত করা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের সব থেকে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। স্কন্দগুপ্ত পর্যন্তই পশ্চিম মালব গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা এমন কোন মুদ্রা বা শিলালিপি পাইনি যার দ্বারা আমরা প্রমাণ দিতে পারি যে, স্কন্দগুপ্তের পরেও পশ্চিমে মালব গুপ্ত সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। স্কন্দগুপ্তের সময় কিছু রূপার বাঁটে তাম্রমুদ্রার প্রবর্তন হয়। অনেকে মনে করেন যে, স্কন্দগুপ্তের সময়ে কিছুটা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভাটা পড়ে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। অধিকন্তু প্রমাণ পাওয়া গেছে যে স্কন্দগুপ্তের আমলে মুদ্রায় সোনার পরিমাণ বেশি ছিল। সুদক্ষ সৈন্য ও কর্মচারীদের সাহায্যে স্কন্দগুপ্ত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমগ্র সাম্রাজ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কারণ ঃ কোন একটি বিশেষ কারণে কোন রাজ্য বা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে না। অনেকগুলো শক্তি একত্রিত হয়ে একটি বড় সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। শিলালিপি, মুদ্রা ও সাহিত্য গ্রন্থ থেকে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত কারণগুলিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী বলে মনে করি ঃ (১) বহিঃশত্রুর আক্রমণ (২) আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অস্বীকার করা (৩) প্রাসাদ-বিদ্রোহ।

আমরা প্রত্নতত্ত্বের উপাদান থেকে জানতে পারি যে কুমারগুপ্তের শাসনকালের শেষদিক থেকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। মধ্য-এশিয়া থেকে হূন জাতির লোকেরা এসে প্রত্যক্ষ আঘাত হানল গুপ্ত সাম্রাজ্যের একাংশে। তবে তাদের এই সাময়িক আক্রমণ যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত চিরতরে প্রতিরোধ করেন। হূনরা পালিয়ে গেল। তখনকার মত টিকে গেলেও পরবর্তী গুপ্তরাজগণ কোন বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে নি। স্কন্দগুপ্তের বৈমাত্রেয় ভাই পুরুগুপ্তের (৪৬৭-৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বের পর থেকে গুপ্তরাজগণ ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ে। পশ্চিমে মালব, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যায়।

বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করতে যখন গুপ্ত সম্রাটরা অসহায় বোধ করছেন তখন কেন্দ্রীয় সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক কর্মচারী ও সামন্তগণ নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। দশপুরে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে জানতে পারি যে যশোবর্মন যিনি গুপ্তদের অধীন সামন্ত ছিলেন নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন এবং নিজের আদেশ বলে ভূমিদান করতে লাগলেন। ঠিক অনুরূপভাবে বলভী রাজ ও মৈত্রক জাতি স্বাধীন হল; মৌখরী সামন্তরা গুপ্ত আনুগত্য অস্বীকার করলেন। হূন আক্রমণের সময় যশোবর্মন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিল। সেই যশোবর্মন গুপ্তরাজাদের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। ফলে গুপ্ত

সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

স্কন্দগুপ্তের সময় কোন ভ্রাতৃবিরোধ হয়েছিল কিনা তা অদ্যাবধি অজানা থাকলেও একথা ঠিক যে, স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর থেকে খোদ রাজপ্রাসাদেই পরবর্তী গুপ্তরাজগণ পারস্পরিক ঈর্ষা ও আত্মকলহে দুর্বল হয়ে উঠল। প্রথম দিকের রাজারা সবাই 'পরমভাগবত'; কিন্তু পুরুগুপ্তের পর কয়েকজন রাজা মুখ্যতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়ে রাজ্যের সামরিক গঠন একেবারেই শিথিল করে তুললেন। যেমন বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত ইত্যাদি রাজারা পতনোন্মুখ রাজ্যকে আর আগের স্থানে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না।

গুপ্ত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যঃ সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে গুপ্তদের শাসনকাল ভারত ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঐক্যসাধনই গুপ্তরাজগণের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না; শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে এক অস্বাভাবিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতি গুপ্তযুগকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

গুপ্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও অভাবনীয় নান্দনিক বিকাশ লক্ষ্য করেই ঐতিহাসিকেরা ভারতের ইতিহাসে এই যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করে থাকেন। শুধু সাম্রাজ্যবাদী শ্রীবৃদ্ধি নয়, গুপ্ত সম্রাটদের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মানবিক প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ ও সর্বোত্তম বিকাশ এইযুগে পরিলক্ষিত হয়। সেদিক থেকে দেখলে গুপ্তসম্রাটদের কালকে 'হিন্দু রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণের যুগ' আখ্যা দেওয়া বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। তাই পণ্ডিত বারনেট-এর ভাষায়, প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লীয় যুগের মতোই ভারতের ইতিহাসেও গুপ্তযুগ বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

গুপ্তযুগেই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ যুগেই রামায়ণ ও মহাভারত নতুন করে সংকলিত হয়। প্রথিতযশা লেখকেরা তাদের সাহিত্য সাধনার দ্বারা এই যুগকে সমৃদ্ধ করেছেন। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, কুমারসম্ভবম, মেঘদূতম্ প্রভৃতি নাটক ও কাব্য সাহিত্যজগতের অমূল্য সম্পদ। শূদ্রক, বিশাখদত্ত, বসুবন্ধু, হরিষেণ নিঃসন্দেহে তাঁদের সার্থক লেখনী দিয়ে বিশ্বের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

এমনিভাবে সাহিত্য-ঐশ্বর্যেও গুপ্তযুগ এক গৌরবোজ্জ্বল বিশিষ্টতা দাবি করতে পারে। পূর্ববর্তী মৌর্য রাজত্বে আমরা দেখেছি পালি ভাষা পেয়েছিল রাজ-আনুকূল্য মূলতঃ বৌদ্ধের প্রভাবে। স্বাভাবিকভাবেই সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষাকে হতে হয়েছিল অনাদৃত-অবহেলিত। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত আবার স্ব-মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠল; সাহিত্যের বাহন হল সংস্কৃত। আমরা পেলাম কিছু কালজয়ী অমর ধ্রুপদী সাহিত্যের উত্তরাধিকার। উল্লিখিত শ্রুতকীর্তি সাহিত্যিকগণ ছাড়াও দেখা যায় গুপ্ত সম্রাটগণও সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন প্রতিভাবান কবি। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা ও কাব্যচর্চার জন্য তাঁকে "কবিরাজ" উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া বীণা-বাদনরত যে মুদ্রা পাওয়া গেছে তা থেকে আমরা বুঝতে পারি সঙ্গীতেও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। অনুরূপভাবে দ্বিতীয়

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভাও বিখ্যাত "নবরত্ন" দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছিল। এবং উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন মহাকবি কালিদাস। তাছাড়া শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক ও বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটক দুখানি বিশ্বসাহিত্যের বিরল সম্পদ। এই যুগে গদ্যসাহিত্যে দণ্ডীন-এর অবদান উল্লেখের দাবি রাখে। তাছাড়া দর্শনচর্চাও এযুগের বিকাশের পূর্ণতায় এক সফল সংযোজন। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা, পক্ষিল স্বামীনের ন্যায়সূত্র, বসুবন্ধুর পরমার্থ সপ্ততি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দর্শন ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত—এই ষড়দর্শনে বিভক্ত করা হল।

আর্যভট্ট ছিলেন সমসাময়িক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গণিত বিশারদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। দেশের সঙ্গে বিদেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ গ্রীক ও রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই আর্যভট্ট ছিলেন ভারতের নিউটন স্বরূপ, ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ। বহু সফল গবেষণায় তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান-পদার্থবিজ্ঞান-গণিত তথা ভারতীয় বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন। আর্যভট্ট প্রমাণ করেছিলেন পৃথিবী আপন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। গণনা করে দেখান—এক বৎসরের ৩৬৫ দিন এবং চন্দ্রগ্রহণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তিনিই দিয়েছিলেন। তাছাড়া গণিতের প্রভূত উন্নতি ঘটে। প্রমাণ আছে সংখ্যাতত্ত্বে দশমিক ও শূন্যের ব্যবহার ভারতীয় গণিতবিদেরই সৃষ্টি। এছাড়া গুপ্ত যুগেই রচনা করেন আর এক দিক্‌পাল ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির, তাঁর অসাধারণ গবেষণার ফসল—পঞ্চসিদ্ধান্ত। আর অমরসিংহ লেখেন বিজ্ঞানের ওপর অভিধান। প্রসিদ্ধ শল্য-চিকিৎসক সুশ্রুত খুবসম্ভব এই গুপ্তযুগেই জন্মেছিলেন। ভেষজ বিদ্যারও প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। ভারতীয় ভেষজবিদ্যা ও আয়ুর্বেদ তৎকালে সুদূর গ্রীস ও মধ্যপ্রাচ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও গুপ্ত শাসনকাল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। গুপ্তযুগের চিত্রশিল্পের যে বিকাশ হয়েছিল ঔরঙ্গাবাদে অবস্থিত অজন্তার গুহাচিত্র তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চন্দ্ররাজের মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভ ও তার কারুকার্য দর্শকদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। নালন্দা থেকে গৌতম বুদ্ধের একটি তামার মূর্তি ওঅসংখ্য মুদ্রা এ যুগের ধাতুশিল্পের চরম উৎকর্ষের পরিচয় বহন করেছে।

স্থাপত্যশিল্প এ যুগে বিস্ময়কর বিকাশ লাভ করে। পাহাড় কেটে ও খোদাই করে নির্মিত অজন্তার ইলোরার গুহাচিত্র আজও দৃষ্টিনন্দন। খাঁটি ভারতীয় শিল্পরীতিতে নির্মিত। ভারতীয় ভাস্করদের অনবদ্য কীর্তিগুলি ভাস্কর্যে এ-যুগের অভূতপূর্ব অগ্রগতিরই প্রস্তর-স্বাক্ষর। এর মধ্যে সারনাথ, ভারহুত বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

ধাতুশিল্পের পাশাপাশি চিত্রকলাও বিকাশের শিখর স্পর্শ করেছে। অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থানে দেওয়ালের গায়ে আঁকা মূর্তিগুলির পেলবভঙ্গি আজও বিশ্বের পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

এমনিভাবে সর্বতোমুখী সফল বিকাশ ও উৎকর্ষের বিচারে গুপ্তসংস্কৃতির ইতিহাস একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। বলাবাহুল্য, একটি সমৃদ্ধ সামাজিক তথা অর্থনৈতিক সর্তই এর পটভূমি রচনা করেছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ষমতার লড়াই
(Struggle for Domination)

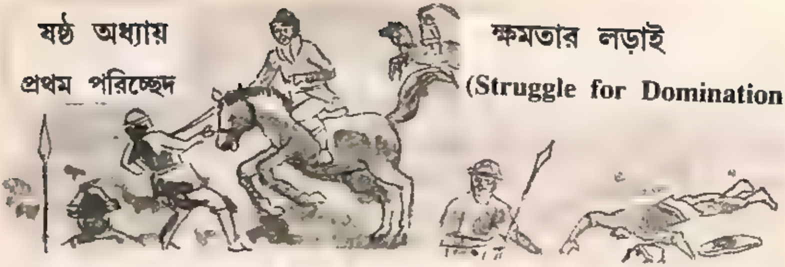

(ক) উত্তর-ভারত—হূন জাতি ও যশোধর্মন:

মধ্য এশিয়ার এক অতি দুধর্ষ জাতি এই হূন। মূলতঃ তারা ছিল যাযাবর। রাজ্য জয় করার থেকেও পররাজ্যে লুঠতরাজ, অত্যাচার এটাই ছিল হূনদের বিশেষত্ব। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই হূন জাতির একটি শাখা ভারতের সীমান্তে এসে খুব উপদ্রব সৃষ্টি করে। গুপ্তরাজ স্কন্দগুপ্ত তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের পরাজিত করেন, তখনকার মতো তারা ভারত থেকে চলে যায়। আবার তারা ভারতের উপকণ্ঠে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে আসে। গুপ্তরাজ ভানুগুপ্ত যখন মগধের রাজা তখন হূন সম্রাট মিহিরকুল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এসে বহু রাজ্যে উপদ্রব শুরু করেন। শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে ৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মিহিরকুল গুপ্তরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। দুর্ধর্ষ এই হূন নেতাকে প্রতিহত করবার জন্য গুপ্তদের অধীনস্থ সামন্তরা একত্রিত হন। সবথেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল মৌখরি রাজ যশোধর্মনের।

প্রাচীন দশপুর বা বর্তমান ম্যাণ্ডাসোরে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে যশোধর্মন নামে একজন স্থানীয় শাসক প্রথমে গুপ্তরাজাদের অধীনে সামন্ত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গুপ্তরাজারা যখন দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন তিনি গুপ্তদের অধীনতা অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। এই শিলালিপির তারিখ ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। আমরা অনুমান করতে পারি যে ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই যশোধর্মন স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। সেই সময় মালবে তিনি একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। যশোধর্মন খুব দক্ষতার সঙ্গে হূন নেতা মিহিরকুলকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। হূনজাতি চেষ্টা করেছিল মধ্য-ভারত ও অন্যান্য স্থানে কিছু রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করতে, যশোধর্মন তাদের সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেন। এরজন্যে তাঁর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এই শিলালিপি থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে আরব সাগর ও উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে পূর্বঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি আনুমানিক ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

গৌড়ের উত্থান—শশাঙ্ক (Rise of Gauda under Sasanka)ঃ

প্রাচীন গৌড় বলতে সমস্ত উত্তরবঙ্গ এবং অজয় নদীর উত্তরাঞ্চল বোঝাত।

শশাঙ্ক ছিলেন প্রাচীন গৌড়ের সর্বপ্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার 'কর্ণসুবর্ণ' অঞ্চলটিতে। আনুমানিক ৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পরবর্তী গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর পর তিনি গৌড় বা বঙ্গদেশের রাজা হন।

বিহারে রোটাসগড় দুর্গে একটা পাথুরে ফলক পাওয়া গেছে। তার ওপর 'মহাসেন-সামন্ত শশাঙ্কদেবস্য' এই কথাটি লেখা আছে। এ থেকে অনেকে অনুমান করেন যে শশাঙ্ক প্রথমে সামন্ত হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। খুব সম্ভব তিনি গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের অধীনে সামন্ত ছিলেন। শশাঙ্কের রাজ্যসীমা বঙ্গদেশ ছাড়িয়ে দক্ষিণ উড়িষ্যার কঙ্গোদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা আরও বেশি সময় পর্যন্ত কঙ্গোদ রাজ্যটি শশাঙ্কের অধীনে ছিল। এ তথ্য আমরা পাই কঙ্গোদ শিলালিপি থেকে। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউ-এন-সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানতে পারি যে, শশাঙ্ক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত গৌড় ছাড়াও মগধ তাঁর অধীনে ছিল। হিউ-এন-সাঙ মগধে এসেছিলেন শশাঙ্কের মৃত্যুর ঠিক পরেই। তাই ঐতিহাসিকরা মনে করেন শশাঙ্ক বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কিছু অংশ নিয়ে অটুটভাবে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

শশাঙ্কের পূর্বদিকের প্রতিবেশী ছিলেন কামরূপ বা বর্তমান আসামের রাজা ভাস্করবর্মা। তিনি শশাঙ্কের শত্রু ছিলেন। কনৌজ ও থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন ছিলেন শশাঙ্কের প্রবল শত্রু। ফলে শশাঙ্ক সবসময়েই সচেতন থাকতেন যে পশ্চিম দিকে রাজা হর্ষ ও পূর্বে রাজা ভাস্করবর্মা এই দুই দিকেই তাঁর শত্রু। সেইজন্যে, তিনি সীমান্ত সবসময়েই সুরক্ষিত রাখতেন।

কনৌজের রাজা গ্রহবর্মা শশাঙ্ক কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হলে আপন শ্যালকের হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন শশাঙ্ককে আক্রমণ করেন। কিন্তু রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। বড়ভাই রাজ্যবর্ধনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের চিরশত্রুতে পরিণত হন। হিউ-এন-সাঙ-এর বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের সঙ্গে যতবার যুদ্ধ করেছেন কখনই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) হর্ষ ও ভাস্করবর্মার মধ্যে তাঁর সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়।

হর্ষবর্ধন—রাজ্যজয় (Conquests of Harshavardhana)ঃ

৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হলে হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। এর ঠিক আগেই কনৌজের রাজা গ্রহবর্মা নিহত হলে রানী রাজ্যশ্রী বিন্ধপর্বতে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবার সব বন্দোবস্ত করেছিলেন। এমন সময় হর্ষ তাঁকে উদ্ধার করে রাজধানী থানেশ্বরে নিয়ে এলেন। হর্ষের প্রথম কাজ হল তাঁর শত্রু গৌড়-রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করা।

প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসে হর্ষবর্ধনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি এদেশে ১৪ বছর ছিলেন। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনে ফিরে যান। তিনি এদেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়ে গেছেন। এই বিবরণ থেকে জানা যায়

যে হর্ষ সিন্ধুরাজ দ্রোণসিংহকে পরাজিত করেছিলেন। গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তিনি বহুবার যুদ্ধে নেমেছিলেন। কিন্তু যতদিন শশাঙ্ক জীবিত ছিলেন ততদিন হর্ষ তাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা ছিলেন হর্ষের মিত্রশক্তি। আইহোল শিলালিপি থেকে জানা যায় যে বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। কাশ্মীরে হর্ষ অভিযান করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি।

হর্ষ নিজেকে 'শিলাদিত্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি কনৌজ বা বর্তমান কান্যকুব্জেরও অধিপতি ছিলেন। তাই, তাঁর দুটি রাজধানী ছিলঃ থানেশ্বর ও কনৌজ। রাজ্যবিজেতা হিসেবে হর্ষ খুব উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন না। তাঁর রাজ্যসীমা পশ্চিমে সিন্ধুপ্রদেশ থেকে পূর্ব–কনৌজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাসক হিসেবেও হর্ষবর্ধন খুব সুখ্যাতির পরিচয় দিতে পারেন নি। হিউ-এন-সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল, স্বয়ং হিউ-এন-সাঙ একাধিকবার চোরের কবলে পড়েছেন। অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। হর্ষ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে একটা মেলার আয়োজন করতেন। তিনি মেলার শেষ দিনে উপস্থিত থাকতেন। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। এর অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। হিউ-এন-সাঙ নিজেই এখানে ছাত্র হিসেবে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়।

প্রতিহার ও পালরাজ্যের উত্থানঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে গুর্জর প্রতিহারদের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিচন্দ্র ছিলেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মারওয়াড় অঞ্চলে ভিলমালে ছিল তাঁর রাজধানী। আবার ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নাগভট মালবে এক নতুন গুর্জর প্রতিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। তিনি কয়েকটি প্রতিবেশী রাজ্য জয় করেছিলেন।

পাল সাম্রাজ্যঃ বাংলার রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে ১০০ বছরেরও বেশি সময় বাংলার কোন একক সার্বভৌম রাজশক্তি ছিল না। তিব্বতীয় পণ্ডিত লামা তারনাথের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে বাংলার চারদিকে তখন অরাজকতার অবস্থা। দুর্বলদের প্রতি সবলের অত্যাচার। এ অত্যাচারের শেষ নেই। বহুধাবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জনপদ পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত। ইতিহাসে এই সময়টিকে 'মাৎস্য ন্যায়' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তখন এই অরাজকতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য বাংলার প্রধানগণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে গোপাল নামে একজন রাজাকে নির্বাচিত করলেন। দেখা গেল গোপাল শক্ত হাতে সকল অনিশ্চয়তা দূর করে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন।

ত্রিশক্তির দ্বন্দ্বঃ ধর্মপাল যখন বাংলার রাজা (৭৭০ থেকে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) তখন পশ্চিম-ভারতের গুর্জর প্রতিহার রাজা ছিলেন বৎসরাজ (৭৭৫-৮০০) খ্রীষ্টাব্দ) এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা ছিলেন ধ্রুব। এই তিন শক্তিই চেষ্টা করেছিল উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে। উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল

কনৌজ। সুতরাং কনৌজের উপর আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য বাংলার পালবংশ, রাজপুতানার গুর্জর প্রতিহার বংশ ও দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশ—এই তিনটি শক্তির মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব হয়। বৎসরাজ প্রথমে ধর্মপালকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু নিজে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের কাছে হেরে গেলেন। বৎসরাজের ছেলে নাগভট্ট (২য়) বাংলার রাজা ধর্মপালের মনোনীত চক্রায়ুধকে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ তাঁকে পরাজিত করেন। নাগভট্টের পৌত্র মিহিরভোজ কনৌজ অধিকার করে পাল আধিপত্য খর্ব করেন। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের কাছে পরাজিত হন।

উল্লেখযোগ্য পাল ও সেন রাজগণঃ

ধর্মপাল (৭৭০-৮১০)ঃ গোপালের পুত্র। পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। মালদার অন্তর্গত খালিমপুর তাম্রফলক থেকে জানা যায় যে তিনি ভোজ, অবন্তী, মৎস্য, কুরু, মদ্র, পাঞ্চাল প্রভৃতি নয়টি রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এক ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাজ্য থেকে তিনি এই পালরাজ্যকে সাম্রাজ্যের মর্যাদায় তুলেছিলেন। তাঁর একাধিক সামন্ত ছিল। তবে সব থেকে উল্লেখযোগ্য সামন্ত হল চক্রায়ুধ। ধর্মপাল কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করে চক্রায়ুধকে তাঁর আশ্রিত হিসেবে কনৌজের সিংহাসনে বসান। তার পর থেকেই বাংলার পাল বংশ, রাজপুতানার প্রতিহার বংশ এবং মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রকূট বংশ কনৌজের আধিপত্য নিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

দেবপাল (৮১০-৮৫০)ঃ ধর্মপালের পুত্র। তিনি হূন, দ্রাবিড়, উৎকল ও কামরূপ রাজাদের পরাজিত করেন। উড়িষ্যা ও আসাম তিনি স্বীয় রাজ্যের অঙ্গীভূত করেন। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্বে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। দেবপাল শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মহীপাল (৯৭২-১০২৭)ঃ পালবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ছিলেন এই বংশের দশম রাজা। বানগড় লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি পিতৃরাজ্যের প্রায় সবটাই উদ্ধার করেছিলেন। কাম্বোজ পালদেবকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে গজনীর সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেছিল। সকল হিন্দুরাজা একত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু মহীপাল নিজের রাজ্য গড়তে গিয়ে এ ব্যাপারে তিনি হিন্দুসংঘে যোগ দেন নি। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বারাণসীর মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন। অনেকের অনুমান মহীপাল বারাণসী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

রামপাল (১০৭২ থেকে ১১২৬)ঃ পালবংশের সর্বশেষ রাজা। তিনি যখন রাজা হলেন তখন পাল সাম্রাজ্য কেবলমাত্র মগধেই সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তরবঙ্গ পুরোপুরি বিদ্রোহী কৈবর্তদের দখলে। সন্ধ্যাকর নন্দী ছিলেন তাঁর সভাকবি; তিনি 'রামচরিত' নামে একটি বই লিখেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, কি অশেষ পরিশ্রম করে রামপাল তার সকল সন্তানকে রাজী করিয়ে কৈবর্ত নেতা ভীমকে পরাজিত করে রাজ্যে আবার হারানো গৌরব ফিরে পেলেন।

বিজয়সেন (১০৯৫-১১৫৮)ঃ প্রথম জীবনে পাল রাজার সামন্ত ছিলেন। পরে নিজ বাহুবলে তিনি সমগ্র বাংলার রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তিনি বাংলাদেশে পাল আধিপত্য উচ্ছেদ করেছিলেন। তিনি মিথিলার নান্যদেব, আসামের গোবর্ধনকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি বর্মনদের পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ এবং পালদের পরাজিত করে উত্তরবঙ্গ অধিকার করেছিলেন।

বল্লালসেনঃ বিজয়সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বল্লালসেন বিশেষ করে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে আজও স্মরণীয়, মুখ্যত তাঁর প্রবর্তিত আভিজাত্যের স্মারক 'কৌলীন্য' প্রথার কারণেই। তিনি নিজে ছিলেন পণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী। তাঁর রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ দুটিও উল্লেখের দাবি রাখে। তাছাড়া রাজা হিসেবে তিনি পিতৃরাজ্য খানিকটা আয়তনে বৃদ্ধি করেছিলেন।

লক্ষ্মণসেন (১১৭৯-১২০৫)ঃ লক্ষ্মণসেন ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা। তিনি ছিলেন বল্লালসেনের পুত্র। তিনি গৌড়, কামরূপ ,কলিঙ্গ এবং কাশীর রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষদিকে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীন-বিন-বখতিয়ার খিলজী তাঁর রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(খ) দাক্ষিণাত্য (Deccan)ঃ বাতাপির চালুক্যবংশ—ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান বিজাপুর অঞ্চলের বাতাপিনগরে প্রথম পুলকেশী একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর দুই পুত্র কীর্তিবর্মা ও মঙ্গলেশ রাজ্যটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। মঙ্গলেশ মালবের কলচুরিদের পরাজিত করেছিলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৮-৬৪২)ঃ মঙ্গলেশকে পরাজিত করে তিনি চালুক্য-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি চালুক্যবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি উত্তর-কানাড়ার কদম্বরাজ, মহীশূরের গঙ্গরাজ, কোঙ্কনের মৌর্যরাজ, মালব ও গুজরাটের রাজন্যবর্গকে পরাজিত করেছিলেন। দক্ষিণের চোল, কেরল ও পাণ্ড্য রাজ্যগুলি পুলকেশীর অধীনতা স্বীকার করে নেয়। উত্তরের রাজা হর্ষবর্ধনকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। নিজ বাহুবলে তিনি সমগ্র দক্ষিণ-ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

বিদেশেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পারস্যের সম্রাট দ্বিতীয় খসরু ও পুলকেশী পারস্পরিক দূত বিনিময় করেন। হিউ-এন-সাঙ পুলকেশীকে একজন প্রজাহিতৈষী রাজা বলে মনে করেন। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মন বাতাপি আক্রমণ করলে পুলকেশী প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পল্লবদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি মারা যান।

রাষ্ট্রকূটঃ অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি দক্ষিণ ভারতের মান্য-খেতা বা বর্তমান মহারাষ্ট্র অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম দন্তিদুর্গ। তিনি কলিঙ্গ, কোশল, কাঞ্চি, মালব ও দক্ষিণ গুজরাট জয় করেছিলেন।

তৃতীয় গোবিন্দঃ তিনি ধ্রুবের পুত্র ছিলেন। ৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজা হন। তিনি প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতে চোল,

পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতির রাজারা মিলিতভাবে তৃতীয় গোবিন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু রাজা তৃতীয় গোবিন্দ তাঁদের মিলিত ষড়যন্ত্র ধ্বংস করে দেন। তখন থেকে সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে তাঁর আধিপত্য স্বীকৃত হয়। তৃতীয় গোবিন্দ ছিলেন রাষ্ট্রকূটদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা।

তৃতীয় কৃষ্ণ ঃ তৃতীয় ইন্দ্রের পুত্র তৃতীয় কৃষ্ণ খুব প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তিনি চোলদের পরাজিত করেছিলেন। রাষ্ট্রকূট বংশে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য রাজা।

কল্যাণের চালুক্যরাজ ঃ বাতাপির চালুক্য রাজবংশ থেকে উদ্ভূত দ্বিতীয় চৈল দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কল্যাণীর চালুক্য রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি রাষ্ট্রকূট রাজাকে পরাজিত করে, মালব জয়ের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর পরবর্তী রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ সত্যাশ্রয়, পঞ্চম বিক্রমাদিত্য, জয়সিংহ ও সোমেশ্বর। শেষ দুজন রাজাদের আমলে চোলেরা বহুবার কল্যাণ আক্রমণ করেছেন। এঁদের পর ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য রাজা হলেন।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৮)ঃ কল্যাণীর চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর সময়ে চালুক্যদের খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ-ভারত (South India)ঃ

(গ) **কাঞ্চির পল্লবগণ ঃ** পল্লবদের মৌলিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কোন উপকরণ নেই। তবে, প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন থেকে জানা যায় যে শিবস্কন্দবর্মণ ছিলেন পল্লব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে সিংহবিষ্ণু নামে এক রাজার আমলে পল্লবদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। তিনি চোল, চের, পাণ্ড্য ও সিংহলের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মন যখন রাজা, তখন থেকেই বাতাপির চালুক্যদের সাথে পল্লবদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করলে, তিনি বেঙ্গী প্রদেশ চালুক্যরাজকে প্রত্যর্পণ করেন।

এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হলেন নরসিংহবর্মন। তিনি ছিলেন মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চালুক্যরাজ পুলকেশীকে (২য়) পরাজিত ও নিহত করে বাতাপি দখল করেন। এর ফলে পল্লবরা দক্ষিণ-ভারতে রাজনীতিগতভাবে একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ তাঁর রাজত্বকালে কাঞ্চিতে এসেছিলেন। হিউ-এন-সাঙের বিবরণ থেকে আমরা পল্লবদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারি। হিউ-এন-সাঙ তাঁদের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথা বলেছেন। নরসিংহবর্মন সিংহলে একাধিকবার সেই অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। পল্লব রাজারা ধর্মের ব্যাপারে উদারপন্থী ছিলেন। পাশাপাশি হিন্দু মন্দির, জৈন মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ বিরাজ করত। তিনি শিল্প, সাহিত্য ও চারুকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় মহাবলিপুরমের পাথর থেকে খোদাই করা 'সপ্তপথ'

মন্দিরগুলি তৈরি হয়েছিল।

নরসিংহবর্মনের পর পল্লববংশে আর কোন উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন না। চালুক্যদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বে তারা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লবরাজ নন্দীবর্মনকে পরাজিত করেছিলেন। এর পরবর্তী অধ্যায়ে দুর্বল পল্লবরাজারা চোলদের হাতে পরাজিত হন। ধীরে ধীরে পল্লববংশের অবসান হয়।

তাঞ্জোরের চোলরাজগণঃ চালুক্য-পল্লব প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত পল্লবরাজারা পরাজিত হলে দক্ষিণ ভারতে চোলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়ালয় ছিলেন চোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র আদিত্য (৮৭১-৯০৭) চোলরাজাদের মর্যাদা ফিরিয়ে এনে তাঞ্জোরে একটি স্বাধীন চোলরাজ্য স্থাপন করেন। পরবর্তী রাজা প্রথম পরান্তক পাণ্ড্য রাজ্য দখল করেছিলেন ও সিংহল আক্রমণ করেছিলেন।

রাজরাজঃ ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজরাজ চোল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা এবং শ্রেষ্ঠ রাজাদের একজন। চোলদের সুযোদ্ধা করে তুলে চের ও পাণ্ড্য রাজগণকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। চালুক্যদের হারিয়ে দিয়ে বেঙ্গী দখল করেছিলেন। সিংহলের উত্তরাংশ জয় করেছিলেন। তিনি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করে এর সাহায্যে লাক্ষা দ্বীপের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

শিল্প ও সাহিত্যেও রাজরাজের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় তাঞ্জোরের বিখ্যাত শিবমন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে রাজরাজ ছিলেন শৈবধর্মে বিশ্বাসী, কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু।

রাজেন্দ্র চোল (১০১৪-১০৪৪)ঃ রাজরাজের পুত্র ও চোল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। একের পর এক রাজ্য জয় করে তিনি চোল সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। তিনি সিংহল জয় করেন। পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য জয় করে নিজের অধিকারে রাখলেন। তিনি দক্ষিণ-ভারতের রাজা হয়েও উত্তর-ভারত জয়ের আশায় এগিয়ে গিয়েছিলেন। পালবংশের রাজা প্রথম মহীপালকে পরাজিত করে তিনি 'গঙ্গইকোণ্ড' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করেছিলেন। এই নৌ-বাহিনীর সাহায্যে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের ঢোণ্ড ও মালয় উপদ্বীপ জয় করেছিলেন। স্থপতিকার হিসেবে রাজেন্দ্র চোলের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি গঙ্গইকোণ্ড চোলপুর নামে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই শহরটি নানারকমের সুন্দর অট্টালিকায় সজ্জিত ছিল এবং এর মাঝখানে খনন করা হয়েছিল একটি কৃত্রিম হ্রদ।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

(৭ম শতাব্দী থেকে ১২শ শতাব্দী)

(Social, Economic and Cultural life from 7th Century—12th Century)

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাল-সেন যুগ (The Palas and The Senas)

সামাজিক অবস্থা (Social condition)ঃ বিভিন্ন মৌলিক উপকরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, পাল ও সেন যুগের সমাজ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শুদ্র এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। জাতিভেদের কঠোরতা ও গোঁড়ামি ছিল। বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। সমাজে নারীজাতির স্থান ছিল উচ্চে। পর্দা প্রথার কোন প্রচলন ছিল না। পুরুষদের পোশাক ছিল ধুতি ও চাদর, পায়ে ছিল কাঠের পাদুকা বা চামড়ার চটি। মেয়েরা পরত শাড়ি। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরত। সাধারণ লোকের ঘরে সোনা, রূপা এবং ধনীর ঘরে মণি-মুক্তা থাকত। তবে সমাজে নারী-স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল না। কৌলীন্য প্রথার বাড়াবাড়ির কারণে সমাজে সহমরণ ও সতীদাহের প্রচলন ছিল। পুরুষের পক্ষে বহু বিবাহে বাধা ছিল না। বিশেষ করে কুলীন বর্ণের পাত্রের বহুবিবাহ কৌলীন্যেরই পরিচায়ক ছিল। পাল ও সেন-সমাজে নিঃসন্তান ও বিধবা নারীর অবস্থা ছিল খুবই দুঃসহ। ধনীদের মধ্যে ছিল যথেচ্ছ ব্যভিচার। ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে চলত কুরুচিপূর্ণ নৃত্যগীত এবং প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানেই নাচ-গান-বাজনা প্রভৃতির ব্যবস্থা হত। সাধারণভাবে খাদ্য তালিকার মধ্যে ছিল ভাত, মাছ, মাংস, দুধ, পিঠা প্রভৃতি। প্রাত্যহিক ফলের মধ্যে কলা, কাঁঠাল, আম, নারকেল আঁখের পরিচয় পাওয়া যায়। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর টেরাকোটা (Terracota) বা পোড়ামাটির ফলকে বাঙালির চিরকালীন মৎস্য-প্রীতির উল্লেখ দেখা যায়। মাংস নিষিদ্ধ ছিল না। সকল স্তরেই সমাজে ছাগমাংসের চল ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে হস্তী ও অশ্বক্রীড়ার প্রচলন ছিল।

ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলায় এই সময় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন থাকার দরুণ সামাজিক বৈষম্য ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। সমাজে বর্ণ-প্রথা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। শূদ্র সম্প্রদায়ের অবস্থা দুঃসহ হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ পাল ও সেন যুগে কৃষিকে কেন্দ্র করে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছিল। ধান, পাট, আখ, সরষে, কার্পাস যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হত। নানারকমের পশু ছিল গৃহস্থের সম্পদ। সে যুগের মানুষ মাটির কাজ এবং ধাতুর কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিল। তাদের তৈরি জিনিসপত্র দেশ-বিদেশে চালান যেত এবং এই ব্যবসা-বাণিজ্য ও তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে সমৃদ্ধিশালী

করত। তাছাড়া নদীমাতৃক বঙ্গে স্বভাবতই মৎস্যের প্রাচুর্য ছিল। সেকারণে মাছ ছিল একটি অর্থকরী সম্পদস্বরূপ। পাহাড়পুর অঞ্চলের টেরাকোটায় যে সমস্ত জীবজন্তুর নিদর্শন আছে তাদের মধ্যে গরু, শূকর, বানর, হরিণ, উট, ঘোড়া, হস্তী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলি সমাজে অর্থকরী সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হত। শিল্প-সামগ্রীর মধ্যে কার্পাস-বস্ত্র-বয়নেরই মুখ্য ভূমিকা দেখা যায়। গুটিপোকার চাষের উল্লেখ থেকে রেশমের ব্যবহারের কথা জানা যায়। উন্নত অন্তর্বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। তবে সেন ও পাল যুগের মুদ্রার বিশেষ কোনও পরিচয় আমরা পাই না। এ থেকে ঐতিহাসিকেরা তৎকালীন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও মুদ্রাসঙ্কটের আশঙ্কা করেন।

পাল ও সেন যুগের রাজারা দেশে জমিদারী বা জায়গিরদারীর বন্দোবস্ত দিতেন। রাজকর্মচারীরাও নগদ অর্থের বিনিময়ে জমি ভোগ করতেন। ফলে সামন্তপ্রথা অস্বাভাবিক ব্যাপকতা লাভ করে। কৃষি-নির্ভর সমাজে ঐ চরম ব্যবস্থার পরিণতি হিসেবে দেখা দিত কৃষকের দুরবস্থা। সমাজজীবন মূলতঃ কৃষিনির্ভর ও গ্রামকেন্দ্রিক হলেও নগরের সংখ্যাও কম ছিল না। বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদেই বিভিন্ন নগরের জন্ম হয়েছিল। তাদের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—একটি ব্যস্ত জনপদ রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে এর খ্যাতি ছিল। তাছাড়া কোটিবর্ষ, রামাবতী, লক্ষণাবতী প্রভৃতি নগর-নগরীগুলি উল্লেখের দাবি রাখে। ব্যবসা-বাণিজ্য-তীর্থ-শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে পাল-সেন রাজাদের আমলে নগরীগুলি হয়ে উঠেছিল বিশেষ ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তাছাড়া বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে পালযুগে বাংলার বিশেষ উন্নতি হয়। চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে পূর্ব-ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত ও হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে ব্যবসায়ীরা সমুদ্রপথে পণ্যদ্রব্য নিয়ে দেশবিদেশে পাড়ি দিত। স্থলপথে নেপাল, তিব্বত, মধ্য-এশিয়া ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকত। বাংলাদেশে প্রস্তুত কার্পাস কাপড়ের চাহিদা ছিল সর্বত্র। আরব বণিক সুলেমানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ব্যবসায়ীরা গণ্ডারের শিং চীনদেশে রপ্তানি করত।

সাংস্কৃতিক জীবনঃ পাল ও সেন রাজারা ছিলেন শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। চর্যাপদ নামে বৌদ্ধ দোঁহা ও গান তৈরি করা হয়েছিল, এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন লুইপাদ ও কাহ্নপাদ। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী, চক্রপাণি দত্ত, অভিনন্দ, হলায়ুধ প্রভৃতি লেখক এই যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্বয়ং শ্রীকর এই যুগেই স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাছাড়া বাঙালীর আপন মাতৃভাষা বাঙলাকে কেন্দ্র করে বাঙালীর জাতীয় চেতনার উন্মেষ এই যুগে পরিলক্ষিত হয়। পাল যুগে বঙ্গদেশ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র রূপেও আপন শ্রেষ্ঠত্বের জোরালো দাবি রাখে। বহু বাঙালী প্রতিভা বিভিন্ন রাজার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। শৈলেন্দ্র রাজবংশের কুলগুরুও ছিলেন কুমারঘোষ নামে একজন শ্রুতকীর্তি বাঙালী।

বল্লাল সেন নিজে 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুইটি গ্রন্থ লিখেছেন। কবি জয়দেব, ধোয়ী প্রভৃতি সাহিত্যিক এই যুগেই জন্মেছিলেন। সেইজন্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগকে 'নবযুগ' বলা যায়।

পাল-সেন যুগে শিল্পকলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের আশাতীত উন্নতি হয়েছিল। ওদন্তপুরী বৌদ্ধ বিহারস্থাপত্য-শিল্পের এক অতি সুন্দর নিদর্শন। তাছাড়া যে সমস্ত বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপ পাল রাজদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল সেগুলো নির্মাণ-কৌশল ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে পাল যুগের রাজাদের উন্নত শৈল্পিক-বোধ ও রুচির উৎকর্ষতারই পরিচায়ক। চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েনের বিবরণে এ বিষয়ের বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য সে-সমস্ত নান্দনিক কীর্তির অধিকাংশই আজ বিলুপ্ত। শুধুমাত্র তৎকালীন শিল্প, তথা স্থাপত্য ভাস্কর্যের নীরব সাক্ষী হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। একটি উদাহরণ স্বরূপ আমরা সোমপুরী মহাবিহারের নামোল্লেখ করতে পারি। অনন্যসাধারণ শিল্পী ধীমান ও বীটপাল এক অভিনব শিল্পরীতির

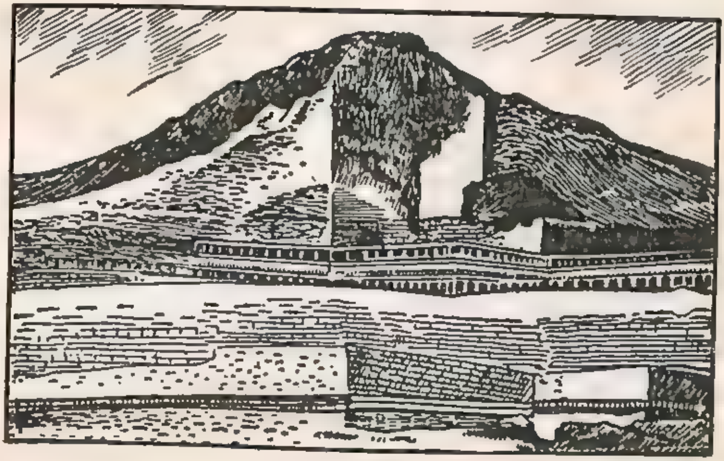

সোমপুরী মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ

প্রবর্তন করেছেন। সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন শূলপাণি। প্রাচীন উত্তরবঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজসাহী ও দিনাজপুর জেলায় এই ধরনের শিল্পকর্মে অনেক চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। টেরাকোটা (Terracota) বা পোড়ামাটির চিত্রশিল্প রীতি এ যুগের শৈল্পিক ধারায় আর একটি সমৃদ্ধ সংযোজন। পালযুগে টেরাকোটা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাছাড়া কালো পাথর কেটে মূর্তি তৈরি প্রসার লাভ করে। বিভিন্ন লৌকিক তথ্যে ধাতু শিল্পের অগ্রগতিরও নিদর্শন পাওয়া যায়। পালযুগের শিল্পকলায় বিশেষভাবে লোকশিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শৈল্পিক বোধের একান্ত পরিচায়ক হিসেবে।

পালরাজগণের উৎসাহে নতুন নতুন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহার রাজা ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়েছিল। এতে ১০৭টি মন্দির

ও ৬টি মহাবিদ্যালয় ছিল। ১৯৮ জন পণ্ডিত এখানে অধ্যাপনা করতেন। বৌদ্ধ দার্শনিক হরিভদ্র, আচার্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ, দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান এই মহাবিহারে অধ্যাপনা করতেন। এযুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও খ্যাতি অর্জন করেছিল। দেবপাল নিজে নালন্দায় কয়েকটি মঠ তৈরি করিয়েছিলেন। এ থেকে অবশ্যই আমরা অনুমান

পাল যুগের চিত্রশিল্প

সেন যুগের পোড়া মাটির কাজ

করতে পারি যে, পাল-সেন রাজারা বিদ্যা ও বিদ্বানকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ধর্মীয় ধ্যানধারণায়ও এ-যুগ একটু বেশি করেই আপন স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল এবং উল্লেখযোগ্য। পাল রাজারা ছিলেন ধর্মীয় বিশ্বাসে বৌদ্ধানুরাগী। তাঁদের যথার্থ আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধধর্ম শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে পূর্ব-ভারতে পরবর্তী তিন-চারশত বছর অস্তিত্ব বাঁচাতে পেরেছিল। অবশ্য পাল যুগে আমরা সনাতন হিন্দুধর্মেরই বিকাশ বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করে থাকি। এবং পাল বংশের রাজত্বের শেষ লগ্নে বেদ ও সংস্কৃতচর্চার পাশাপাশি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রসারিত হয় এবং পাল রাজাদের সঙ্গে তাদের নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

অনুরূপভাবেও সেন রাজাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বাঙ্গীণ এক সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছিল।

পল্লব ও চোল সংস্কৃতি : সুদূর দক্ষিণের চোল-শিল্প ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত। এই শিল্প পল্লব শিল্পকেই অনুসরণ করে উন্নত হয়েছিল। চোল-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে তাঞ্জোরের বিরাট শিবমন্দির এবং গঙ্গোইকোণ্ড

চোলপুরমের মন্দিরগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধাতু দিয়ে মূর্তি নির্মাণেও চোল শিল্পীগণ অশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। চোল শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য এর

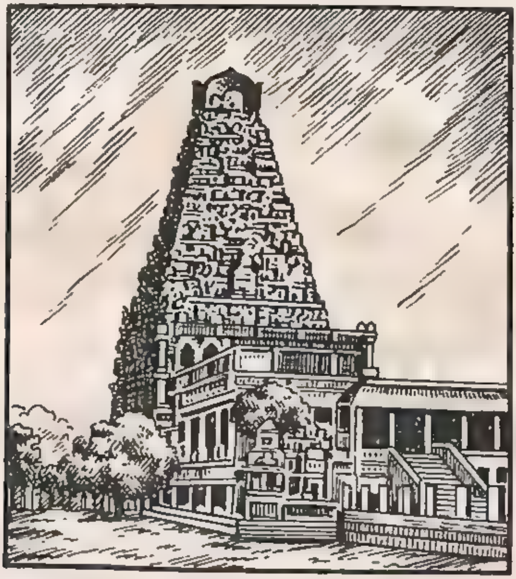

তাঞ্জোরের শিবমন্দির

বিশিষ্টতা। বড় বড় পাথরের পাহাড় কেটে তৈরি মন্দির এবং তারে সূক্ষ্ম কারুকার্য অনেক ঐতিহাসিকের বিস্ময় উৎপাদন করেছে।

তাছাড়া চিদাম্বরমের মন্দির, ত্রিচিনপল্লীর মন্দির, চোল স্থাপত্যশিল্পের অভিনবত্বের এক উজ্জ্বল প্রদর্শন চোলশিল্পের একটি স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। সেক্ষেত্রে পল্লবশিল্পের অনুগামী হলেও এদের বৈচিত্র্য হল বিশালাকৃতির মাঝে শৈল্পিক সুষমার বিকাশ। পক্ষান্তরে পল্লব শিল্পরীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ক্ষুদ্র পরিসরে শিল্পের পূর্ণতা। তাই দেখা যায় চোল স্থাপত্য—কীর্তি আকাশছোঁয়া।

চোল-পল্লব স্থাপত্য রীতির পাশাপাশি চান্দেল্ল শিল্পের ধারাও অনন্য বিশিষ্টতা উল্লেখের দাবি রাখে। ৯৫০—১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালে চান্দেল্ল রাজগণের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্যশিল্প অসধারণত্ব লাভ করে। যার জ্বলন্ত নিদর্শনরূপে খাজুরাহোর মন্দির গাত্রের শিল্পকীর্তির উল্লেখ করা যায়।

উড়িষ্যার গঙ্গরাজদের আমলেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। ১১০০ অব্দে গঙ্গরাজ অনন্তবর্মন পুরীতে জগন্নাথদেবের বিশ্বখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণ করান। স্থাপত্য-মুন্দিয়ানায় সেটি ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরকেও ছাপিয়ে যায়। গঙ্গশ্রেষ্ঠ নরপতি প্রথম নরসিংহ কোনারকের যে সূর্যমন্দিরখানি নির্মাণ করান তা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নান্দনিক মূল্যে আজও বিশ্বের বিস্ময়।

শিল্পক্ষেত্রে পল্লবরাজগণ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাঞ্চি ছিল একটি সুসজ্জিত নগরী। প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের আমলে ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি স্থানে পাথরের পাহাড় কেটে সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয়

নরসিংহবর্মনের আমলে কাঞ্চির কৈলাসনাথ মন্দির তৈরি হয়। মামল্লপুরমের (মহাবলীপুরম্) মন্দিরের গায়ে খোদিত মূর্তিগুলি পল্লব ঘরানার ভাস্কর্য রীতির

মহাবলীপুরমের মন্দির

প্রকৃষ্ট নিদর্শন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যবদ্বীপে ও কাম্বোজে পল্লবরীতির স্থাপত্যের বহু উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে যা আজও বিশ্বের পর্যটকদের কাছে বিশেষ দৃষ্টিনন্দন।

দক্ষিণ-ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিঃ প্রাকৃতিক দিক থেকে দক্ষিণ-ভারতকে দুটি অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। বিন্ধ্যপর্বতমালার দক্ষিণাংশ থেকে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার তীরভূমি অবধি নিকট দক্ষিণ, আর কৃষ্ণার দক্ষিণবর্তী অঞ্চল হল সুদূর দক্ষিণ। সুদূর অতীতে, দক্ষিণ দেশে আর্য-সভ্যতার ঢেউ এসে লাগার আগেও সেখানে উন্নত দ্রাবিড় সভ্যতার বিস্তার ছিল। কথিত আছে, প্রথম আর্য হিসেবে অগস্ত্য মুনিই বিন্ধ্য অতিক্রম করে দক্ষিণে প্রবেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক যুগের শেষ লগ্নেই আর্য সভ্যতা স্বাভাবিক গতিতে দক্ষিণে প্রবাহিত হলে উত্তরের আর্যের সঙ্গে দক্ষিণের অনার্য দ্রাবিড়ের সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে মৌর্য সম্রাটদের সাম্রাজ্য সুদূর দক্ষিণে বিস্তার লাভ করেছিল।

সাতবাহন যুগ থেকে দক্ষিণ ভারতের সমাজে ব্রাহ্মণ জাতির আধিপত্য স্থাপিত হয়। সমাজে নারীরা সম্মানের পাত্রী ছিল। মল্লযুদ্ধ, নাচ, শিল্প ও গানেতে নারীরা তাদের যোগ্যতা দেখাত। পুরুষের বহুবিবাহ এবং সদ্য বিধবার সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল। দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এদের প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। শৈব সাধুগণের দক্ষিণী নাম ছিল 'নায়নার' এবং বৈষ্ণব সাধুগণের নাম ছিল 'আলভার'। পল্লব, রাষ্ট্রকূট, ও চালুক্য রাজ্যে এই সকল সাধু ও তাদের সম্প্রদায় বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। বৈষ্ণব ধর্মগুরুগণের মধ্যে কুলশেখরের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দক্ষিণী সঙ্গীতের গুরু ও সাধক ছিলেন বিখ্যাত ত্যাগরাজন।

দক্ষিণ-ভারতে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠায় জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য, কুমারিলভট্ট রামানুজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শঙ্করাচার্য ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তিনি ছিলেন

একাধারে কবি ও দার্শনিক। রামানুজ ছিলেন বৈষ্ণব ধর্ম ও ভক্তিবাদের প্রবর্তক। চান্দেল্ল যুগে ছিল বৈদেশিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য। বহু শিব ও বিষ্ণু মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে চান্দেল্ল রাজগণ প্রধানতঃ শৈব হলেও গোড়ায় অনেকেই বৈষ্ণব ছিলেন। জৈন বৌদ্ধরাও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে।

দক্ষিণ-ভারতের সাহিত্য ঃ দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত ভাষার খুব চাহিদা ছিল। রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ষ একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি কবিরাজমার্গ নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। রাষ্ট্রকূট রাজারা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তাঁদের রাজসভা জিনসেন, মহাবীরচার্য প্রভৃতি হিন্দু ও জৈন পণ্ডিতেরা অলংকৃত করতেন। পল্লবদের রাজধানী ছিল কাঞ্চি। এই কাঞ্চির বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণের সংস্কৃতচর্চার এক বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। সে যুগের প্রসিদ্ধ লেখক দণ্ডিন, ভারবি, দিগ্নাগ কাঞ্চিতেই থাকতেন। রাজা মহেন্দ্রবর্মা পল্লবমল্ল নিজেও ছিলেন এক খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও সঙ্গীতবিশারদ। চোলের রাজধানী তাঞ্জোর সংস্কৃত চর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। সংস্কৃতের রাজানুকূল্য থাকার ফলে তৎকালে ঐ দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলোতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে। দণ্ডিন, দিগ্নাগাচার্য, ভারবি, সর্বোপরি স্বয়ং রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ষ এবং পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মা ছাড়াও চালুক্য তৃতীয় সোমেশ্বর রচিত 'মানসোল্লাস' ও চোলরাজ প্রথম পরান্তকের পৃষ্ঠপোষকতায় বেঙ্কটমাধব বিরচিত ঋক্ বেদের ওপর টীকা-গ্রন্থখানি তৎকালে বেদচর্চার এক প্রামান্য দলিল ও সাহিত্যমূল্যেও অসাধারণ। রাষ্ট্রকূট আমলে গদ্য-পদ্যের যৌথছন্দে রচিত ত্রিবিক্রম ভট্টের 'নলচম্প' গ্রন্থখানিও উল্লেখের দাবি রাখে। চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের জীবনপঞ্জী লেখেন বিহ্লন তাঁর 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত'-এ। রচনাটি ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বিজ্ঞানেশ্বর রচনা করেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপর মিতাক্ষরা নামে একখানি টীকা গ্রন্থ। গ্রন্থটি হিন্দু-আইনের এক-প্রাধান্য খসড়াও বলা যেতে পারে। তাছাড়া চোড় গঙ্গের রাজত্বকালে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত মূল্যবান গ্রন্থ সদানন্দ রচিত 'ভাস্বতী'ও সেই যুগে দক্ষিণে সংস্কৃত ভাষার পরিপুষ্টিতে আরও একটি সমৃদ্ধ সংযোজন।

স্থানীয় ভাষা ছিল তামিল। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন তামিল ভাষায় 'মত্তবিলাস', রচনা করেন। এটি একটি ব্যঙ্গরচনা। এই পল্লব যুগেই রচিত হয় প্রসিদ্ধ তামিলগ্রন্থ 'তামিলকুরাল'। রাষ্ট্রকুটরাজাদের আনুকূল্যে কানাড়ী ভাষারও উন্নতি ঘটে। 'রত্নমালিকা' নামে গ্রন্থটি রাষ্ট্রকূট যুগে রচিত হয়। এটি একটি দার্শনিক গ্রন্থ।

তামিল সাহিত্যের অসাধারণ সমৃদ্ধি লক্ষ্য করেই চোল যুগকে তামিল সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে। রাজকবি জয়গোণ্ডর, কুট্টন ও রাজকর্মচারী সেক্কিলা রচিত গ্রন্থসমূহও তামিল সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল। কানাড়ীর পাশাপাশি তেলেগু সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তাছাড়া উড়িষ্যার গঙ্গরাজগণও তৎকালীন দক্ষিণী সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(২) বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক (Commercial and Cultural Contacts with outside World) ঃ

স্মরণাতীতকাল থেকেই ভারতবর্ষ তাঁর প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও পশ্চিম-এশিয়ার সুমেরীয়-মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সাথে তাঁর সংযোগ ছিল। হরপ্পা সভ্যতায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়। তেমনিভাবেই একদিন সম্ভবতঃ ভিন্‌দেশী আর্যের সাথে ভারতীয় অনার্য দ্রাবিড়ের মিলন ঘটে যায়। দুর্লঙ্ঘ পর্বতমালা ও সমুদ্রে বেষ্টিত হয়েও ভারতবর্ষ কখনও নিজেকে প্রতিবেশী দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেনি। মৌর্যরাজগণের সঙ্গে সিরিয়ার গ্রীক রাজাদের যোগাযোগ ছিল। কুষাণ যুগেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মাধ্যমে মধ্য-এশিয়ার খোটান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক বন্ধন গড়ে ওঠে।। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ও ফা-হিয়েনের বিবরণে তার উল্লেখ আছে। কুষাণদের আমলে চীনের সঙ্গেও ভারতের সভ্যতা ও সংস্কারগত ব্যাপক ভাব-বিনিময় ঘটে। তেমনিভাবে একদিন বৌদ্ধধর্ম প্রসারের মধ্যদিয়ে জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ক্রমে একদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। জাভা, বালি, বোর্নিও, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপে গড়ে ওঠে ভারতের বাণিজ্যিক উপনিবেশ। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, সিংহলে বাণিজ্যিক পথ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুমহান প্রভাব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাভায় গড়ে উঠেছিল এক প্রভাবশালী শক্তিধর হিন্দু রাজবংশ। কিছু ইতিহাসবিদের অনুমান জাভায় ঐ হিন্দু রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতীয়রাই এবং একদা তাঁদের প্রভূত প্রতিপত্তি

ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য আপন শৌর্য ও সামর্থ্যের পরিচায়ক রূপে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। জানা যায় জলপথে কৌণ্ডিন্য নামক এক ব্রাহ্মণ কম্বোজ বা বর্তমান কম্বোডিয়ার উপস্থিত হয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেখানে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, একদা শক্তিশালী এক হিন্দুরাজ্য গঠন করেন। সেই

বংশের বিখ্যাত রাজাদের মধ্যে জয়বর্ধন ও যশোবর্মনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রাজধানী ছিল আঙ্কারধাম। কম্বোজ রাজ সূর্যবর্মনের পৃষ্ঠ-পোষকতায় নির্মিত হয়েছিল, বিশ্বের বিস্ময় অভূতপূর্ব স্থাপত্যকীর্তি, আঙ্কোরভাটের মন্দির। চম্পায় গড়ে উঠেছিল কোন এক ভারতীয় বণিকের প্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য। সুদীর্ঘ তেরো শত বছর তাঁরা তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। হরিবর্মন, জয়সিংহবর্মনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত দ্বীপ ও উপদ্বীপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে মালয়, সুমাত্রা, বলীদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু উপনিবেশ ও রাজ্যসমূহ গড়ে উঠেছিল। সুমাত্রাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এখানে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষদিকে যবদ্বীপ, বোর্নিও, সেলিবিস প্রভৃতি বহু অঞ্চল শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। শৈলেন্দ্রবংশের রাজগুরু ছিলেন কুমারঘোষ। তিনি একজন বাঙালী। শৈলেন্দ্রবংশের রাজত্বকালেই যবদ্বীপের প্রসিদ্ধ বরবুদুরের মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল—এই মন্দিরটি ভারতীয় শিল্প-কৌশলের এক অভিনব নিদর্শন। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ বাংলার

বরবুদুরের বৌদ্ধ মঠ

পাল রাজসভায় দূত প্রেরণ করতেন। নৌ-বলে তাঁরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। দেশ-বিদেশে তাঁদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। তাঁরা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন।

বহির্বিশ্বে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তার ও যোগাযোগের পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা ছিল ধর্মবিজয়, রাজ্যবিজয় ও বহির্বাণিজ্যের সংমিশ্রিত ঐকান্তিক প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি। পশ্চিম-এশিয়া, মধ্য-এশিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে পারস্পরিক বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে একদিন ভাবের আদান-প্রদান ঘটে যায়। লক্ষণীয় যে উক্ত দেশগুলি কখনও ভারতীয় সংস্কৃতির যান্ত্রিক প্রতিরূপ হয়ে যায়নি; গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অপরপক্ষে, ভারতীয় সভ্যতা থেকে কৃষ্টির নানা উপাদান আহরণে আপন-সংস্কৃতিকেই সমৃদ্ধ করেছে।

বহির্ভারতে ভারত-সংস্কৃতি
সিরিয়া

মধ্যযুগ

[—১৭০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত]

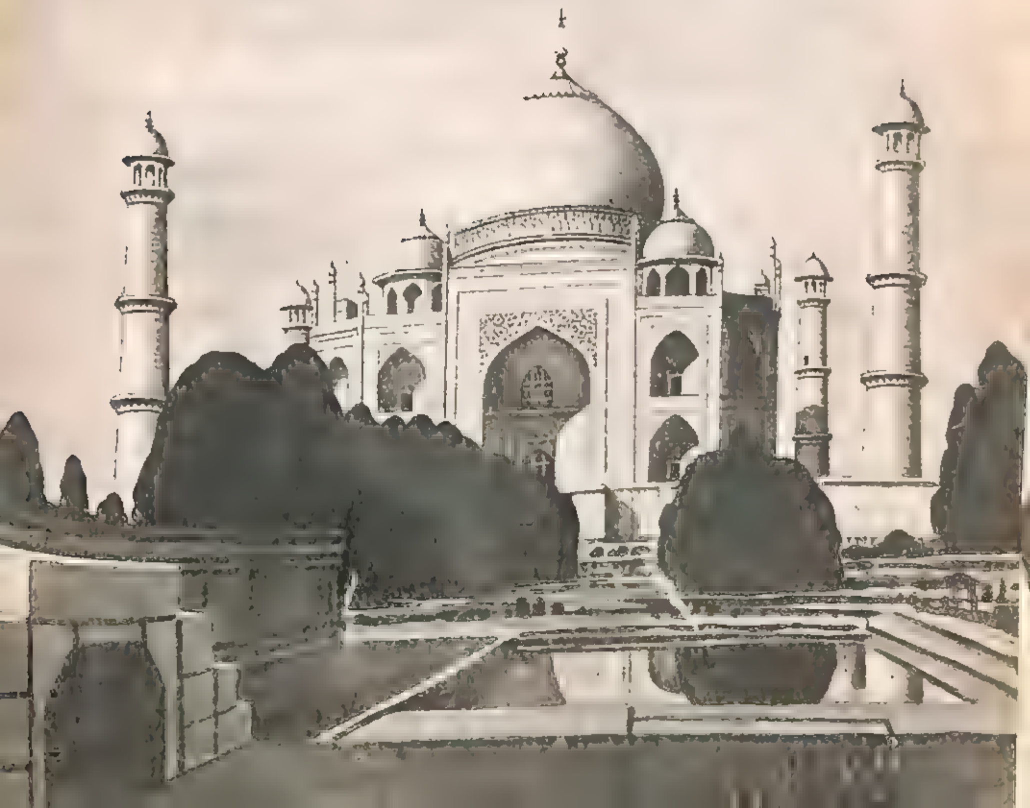

MEDIEVAL INDIA till 1707

(1). Why should we call it 'Medieval India' rather than Muslim India ?

(2). A brief note on the types of sources ; the Sultanate period.

(3). Advent of Islam in India : the Arab conquest of Sind—its impact negligible.

(4). Beginning of Muslim rule : condition of Northern and Western India on the eve of the Muslim invasion—Sultan Mahmud—Results of his invasions—Al-Biruni on Indian culture and Civilisation.

(5). From Invasion to Empire—building ; Foundation of the Delhi Sultanate by Qutbuddin—Iltutmish and Balban : nature of the external and internal threats—consolidation of the Sultanate.

(6). Khalji Imperialism : growth of the empire under Alauddin (no detailed account of his campaigns) his attempts at consolidating the authority of the Central Government—his economic measures and their results.

(7). A short assessment of Muhammad bin Tughluq's rule—Nature of the changes during Firuz Shah's rule : some of his beneficient measures.

(8). Invasion of Timur—effects—disintegration of the Sultanate : the Sayyids and Lodis (only a brief outline).

(9). Rise of some regional powers :

(a). Bengal under Ilias Sahi rulers : Hussain Shah and Nasarat Shah ; cultural developments.

(b). The Bahmani Kingdom (no detail)—split up into five kingdoms.

(c). The nature of the Bahmani—Vijayanagar conflict (details of the wars to be omitted).

d). Vijaynagar empire—Dev Rai and Krishna Rai—special emphasis on the administrative system—and the social, cultural and economic life.

(10.) Impact of Islam on India during this period—with particular stress on the impact on the cultural life—the initial orthodox reaction ; gradual synthesis of cultures—the Bhakti cult—Sufism—Religious reference—their message. Art and architecture—development of vernacular literature and regional art and culture—patronage of literature etc. by the ruling groups—growth of Urdu.

THE MUGHAL AGE : 1526—1707 :

(1). A brief note of the types of sources.

(2). Origins of the Mughals : foundation of the Padshahi by Babar,—Panipath, Khanua and Ghogra— (Detail of wars to be omitted) Babar's memories.

(a). Mughal—Afghan contest—its nature—a brief narrative of the building up of an empire by Sher Shah—special stress on the administrative and revenue systems. Sher Shah's contributions—a brief reference to the reestablisment of the Mughal power.

(b). Widening of the empire and its consolidation by Akbar : Stress on the methods by which Akbar achieved it : (detail of the wars to be omitted)—foundation of a new administrative system—Jagirdari system—revenue system—cultural life ; Din-i-ilahi—Akbar's Court—His building activities.

(c). Jahangir and Shahjahan : Assessment as rulers : particular stress on their patronage of art and architecture :—Their policy towards European traders.

(d). Aurangzeb : a short note on the wars of succession—stress on two developments in the political sphere further widening of the empire on the one hand, and the emergence on the other of certain conditions which tended to weaken the imperial authority : Roots and nature of his troubles in Northern and North-Western India ; the Deccan policy—Shivaji and the first phase of the Mughal—Maratha conflict—organisation of the civil and military administration by Shivaji—assessment of Shivaji as a ruler—the far-reaching consequences of Aurangzeb's Deccan Wars—organisation by Aurangzeb of the civil and military administration—His religious policy—his character and personality— a brief estimate as a ruler.

(e). Activities of the European Trading Companies (a brief outline).

(3). India under the Mughals : Political unification of a large part of India—measures in connection with the assertion of the Central Authority—the Mughal rulers and Jagirdars— land revenue system—the ruler society of India in the eyes of foreigners—trade, industry and commerce—European traders—special emphasis on the cultural life : art, architecture, paintings, literature—history writing—music—some reference to some distinctive regional cultures.

মধ্য যুগ

১) মুসলিম ভারত না বলে মধ্যযুগীয় ভারত বলা উচিত কেন ?

২) সুলতানী যুগের ইতিহাসের উপাদানের কারণ।

৩) ভারতে ইসলাম আবির্ভাব ঃ আরবগণের সিন্ধু বিজয়

৪) ভারতে মুসলিম শাসন ঃ মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতেব অবস্থা। সুলতান মামুদ—সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের ফলাফল—ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অলবেরুনী।

৫) মুসলিম আক্রমণ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ঃ কুতুবউদ্দিন কর্তৃক দিল্লী সুলতানের প্রতিষ্ঠা—ইলতুতমিস এবং বলবন—অন্তর্দিক ও বহির্দিক থেকে বিরোধীয় ব্যবস্থা—সুলতানী সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা।

৬) খালজী সাম্রাজ্যবাদ ঃ আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবৃদ্ধি। কেন্দ্রীয় প্রাধান্য সংহত করার চেষ্টা ; আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ফলাফল।

৭) মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন—ফিরোজ শাহের রাজত্বে পরিবর্তন প্রকৃতি—কিছু জনহিতকর কার্যাবলী।

৮) তৈমুরের ভারত আক্রমণ ও তার ফলাফল—দিল্লী সুলতানীর পতন—সৈয়দ ও লোদী বংশ।

৯) কয়েকটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রের উদ্ভব

(ক) ইলিয়াসশাহী শাসনের অধীনে বঙ্গদেশ—হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ—সংস্কৃতির বিকাশ।

(খ) বাহ্‌মনী রাজ্য—এই রাজ্যের ভাঙ্গনে পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজ্য।

(গ) বাহ্‌মনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে সংঘাত।

(ঘ) বিজয়নগর সাম্রাজ্য—দেব রায় ও কৃষ্ণদেব রায়। বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা। বিজয়নগরের সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা।

১০) সুলতানী আমলে ভারতের উপর ইসলামের প্রভাব সাংস্কৃতিক জীবন। রক্ষণশীলদের ন্যায়াধিক প্রতিক্রিয়া—ভক্তি আন্দোলন—সুফীবাদ—ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য—তাঁদের বাণী, শিল্প-স্থাপত্য, দেশীয় সাহিত্য, আঞ্চলিক শিল্প ও সংস্কৃতি। আঞ্চলিক শাসকদের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা। উর্দুর বিকাশ।

মুঘল যুগ (১৫২৬ খ্রীঃ—১৭০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত)

১) মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদান।

২) মুঘল যুগের উৎস-পাদসাহী বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠা—পানিপথ, খানুয়া ও ঘর্ঘরা উল্লেখ। বাবরের স্মৃতিকথা। মুঘল-আফগান্ সংঘর্ষ—তার প্রকৃতি—শেরশাহ্ কর্তৃক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(ক) শাসন সংক্রান্ত ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা। শেরশাহের অবদান—মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(খ) আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তা—বিস্তার নীতি—নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন। জায়গিরদারী প্রথা—রাজস্ব প্রথা—সাংস্কৃতিক জীবন—দীন-ই-ইলাহী—আকবরের বিচারালয়—তাঁর কীর্তিসমূহ।

(গ) জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান অ শাসনকর্তারূপে মূল্যায়ন, স্থাপত্য ও শিল্পকলায় অবদান, ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে সম্পর্ক।

(ঘ) ঔরঙ্গজেব—যুদ্ধ বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে দুটি প্রধান উন্নয়নের উল্লেখ ঃ একদিকে রাজ্যবিস্তার অন্যদিকে কিছু কিছু আবশ্যিক শর্ত প্রয়োগ যা শাসন পরিচালনাকে দুর্বল করে, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিরোধের মূল ও প্রকৃতি নিরূপণ; দাক্ষিণাত্য নীতি। শিবাজী ও মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ; শিবাজীর সামরিক ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা—শাসক হিসাবে শিবাজীর মূল্যায়ন। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির সমালোচনা—সামরিক ও প্রাদেশিক দিক থেকে ঔরঙ্গজেবের শাসনব্যবস্থা—তাঁর ধর্মনীতি, তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব—শাসক হিসাবে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকা।

ঙ) ইউরোপীয় বণিকদের সক্রিয়তা (সংক্ষিপ্ত রূপরেখা)।

৩) মুঘল আমলে ভারতবর্ষ ঃ ভারতের বৃহত্তর অংশে রাজনৈতিক সমন্বয়সাধন। কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের মানদণ্ড। মোগল শাসকদের আমলে জায়গিরদার ও ভূমি রাজস্ব প্রথা। বিদেশিদের দৃষ্টিতে শাসক সম্প্রদায়, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও ইউরোপীয় বণিক। বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক জীবন।

মধ্যযুগ
(Medieval India)
প্রথম অধ্যায়

মুসলিম যুগকে মধ্যযুগ বলা হয় কেন?
(Why Muslim India is called Medieval India)

ইতিহাসকে কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীতে ভাগ করা যায় না। ইতিহাস মানবসমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক বিবর্তনের এক ধারাবাহিক কাহিনী। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে মানবসমাজ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এই বিবর্তনে প্রতিদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান কালে ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করে দেখাবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। আমাদের দেশেও এ জাতীয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইতিহাস তিন ভাগে (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক) ভাগ করা উচিত নয়। কারণ, মানবসমাজের বিবর্তনের একটা ধারাবাহিকতা আছে। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এই তিন যুগ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীঃ) পর থেকে আরবগণ রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হয়। অষ্টম শতকের প্রথম দিকে আরবগণ ভারতের মাটিতে ক্ষণস্থায়ী রাজ-কর্তৃত্ব দখল করে। পরবর্তী কালে অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের শেষাংশে উত্তর-ভারতে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তুর্কীগণ স্থায়ী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ভারতের ইতিহাসে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের ভারতে আগমন ও শাসনের সূচনা থেকে মোগল যুগের পতন কাল পর্যন্ত মধ্যযুগ রূপে অভিহিত করা হয়। শুধুমাত্র একটি বিশেষ ধর্মের নামে একটি যুগকে উল্লেখ করা সঙ্গত হবে না, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো অ-মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে। এদেশে মুসলিমগণ তাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও ভারতীয় মূল জীবনস্রোতে মিশে গিয়ে আজকের সমৃদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতিতে অপরিহার্য অবদান রেখেছেন। বিক্ষিপ্ত লগ্নে বহু হিন্দুরাজবংশও তৎকালে নিজেদের সর্বভৌম অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল ও সর্বস্তরে মুসলমান শাসকদের সঙ্গে তাদের আদান-প্রদানও ছিল। সেকারণেই ঐ ঐতিহাসিক সময়ধারাকে আমরা মুসলিম যুগ না বলে মধ্যযুগই বলব। মধ্যযুগীয় ইউরোপের অবস্থার সঙ্গে ভারতীয় অবস্থার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এই যুগে তুর্কী শাসকগণ ইসলাম ধর্ম ও ঐস্লামিক আইনকেই তাঁদের শাসনের মূলভিত্তি রূপে গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ধর্মীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তরিত হল। ভারত হল 'ধর্মাশ্রিত রাষ্ট্র'। দ্বিতীয়তঃ শাসকগণ

'স্বর্গীয় অধিকার নীতি' অনুযায়ী স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। তৃতীয়তঃ শাসককূল শাসনকার্যে একদিকে খান্, আমীর, মালিক, সিপাহশালার প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ইক্তা, জায়গীরের অধিকারী এবং অপরদিকে বিচার, শিক্ষা ও ধর্মব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত উলামা সম্প্রদায়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। চতুর্থতঃ জনসাধারণ সম্পর্কে শাসকগণ কোনরূপ দায়দায়িত্ব অনুভব করতেন না।

মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানঃ সুলতানী যুগ
(Sources of medieval Indian history : The Sultanate period)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমান পণ্ডিতগণ হিন্দুপণ্ডিতদের তুলনায় অধিক পরিমাণে ইতিহাস-সচেতন ছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের যুগ থেকেই আরবীয় ভাষায় ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়। পরবর্তী কালে পারসিক ভাষা ইতিহাস রচনার বাহন রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। আরবগণ কর্তৃক সিন্ধুদেশ আক্রমণের সময় থেকে মোগল শাসনের পতনকাল পর্যন্ত সমকালীন বহু রচনা মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদানরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সুলতানী যুগে অধিকাংশ সমকালীন ঐতিহাসিকগণই ছিলেন সুলতানের সভাসদ, নয়তো বিচার বিভাগীয় কাজে নিযুক্ত রাজকর্মচারী। তাঁদের লেখায় সুলতানের যুদ্ধ জয়, রাজ্যবিস্তার, শাসনব্যবস্থা, সুলতানের গুণকীর্তন প্রভৃতিই বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছে। সাধারণ মানুষের কথা, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কোন বিবরণ এঁদের লেখনীতে বিশেষ স্থান পায়নি। দ্বিতীয়তঃ সমকালীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন নি। ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের প্রতি এঁরা ছিলেন নির্দয়। এঁদের লেখা ছিল অতিরঞ্জিত ও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। একথা স্বীকার্য যে সে যুগের মুসলমান লেখকদের রচিত গ্রন্থসমূহে ঐতিহাসিক মূল্য বর্তমান। সমকালীন ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে আবু নাসের বিন্ উৎবি (কিতাব্-উল্-ইয়াসিনি), অল্ বিরুনী (তারিখ-উল্-হিন্দ্), হাসান নিজামি (তাজ-উল্-মাসির), মিনহাজ-উল্-সিরাজ (তাবাকাৎ-ই-নাসিরি), জিয়াউদ্দীন বারানী (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী), আমীর খসরু (খাজাইন্-উল্-ফুতুহ্), খাজা আব্দুল মালিক ইমামী (ফুতুহউল্-সালাতিন্), আইন-উল্-মুলুক্ সুলতানী (মুনসাৎ-ই-মাহ্‌রা), সামস্ সিরাজ আফিফ্ (তারিফ-ই-ফিরোজশাহী), অজ্ঞাতনামা লেখকের (সিরাৎ-ই-ফিরোজশাহী), ইয়াহিয়া-বিন্-আহমদ (তারিখ-ই-মুবারকশাহী), ফকর-ই-মুদাব্বির (তারিখ-ই-মুবারক শাহ্), রিজকুল্লাহ্ মুস্তাফি (ওয়াকাৎ-ই-মুস্তাকি) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ মহম্মদ বিন্ তুঘলকের আত্মজীবনী, সুলতান ফিরোজ শাহের ফুতুহাত্-ই-ফিরোজশাহী, তৈমুরের মালকুজাৎ-ই-তিমুরীর নামও করা যেতে পারে। সুলতানী যুগে যেসকল

বিদেশী ভ্রমণকারী এদেশে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইবন বতুতার রেহেলা, চীনদেশীয় মাহুয়ানের বঙ্গদেশ সম্পর্কে তথ্যাবলী, আব্দুর রজ্জাক, নিকোলকণ্টি, মার্কোপোলোর দক্ষিণ-ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ ও তুর্কী পর্যটক—কাহিনী মাসালিক-উল্‌-আবসার এর নাম করা যায়।

এছাড়া, সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য এবং স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও মুদ্রা ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতে ইসলামের আবির্ভাবঃ সিন্ধুদেশে আরব বিজয়

(Advent of Islam in India : The Arab conquest of Sind :)

তৃতীয় অধ্যায়

আরব দেশ ছিল বহু গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত, সর্বদা দ্বন্দ্বে লিপ্ত একটি বেদুইন-অধ্যুষিত দেশ। হজরত মহম্মদ ইসলামের পতাকাতলে সর্বদা যুযুধান বেদুইন আরবীয়দের সংঘবদ্ধ করে নতুন এক আরবীয় ঐক্যবদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রীঃ) তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত খলিফা আবু বকরের শাসনকালেই পারস্য ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে আরবীয়গণ অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের শাসনকালে পারস্য, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর প্রভৃতি দেশে ইসলাম শাসন-কর্তৃত্ব দখল করে। ওমরের শাসনকালেই ভারতে প্রথম আরব-অভিযান শুরু হয়। তিনটি নৌ-অভিযানের আশানুরূপ ফল না হওয়ায় এই অভিযান তিনি বন্ধ করে দেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরবীয়গণ উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে কাবুলের পথে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের প্রবল বাধার ফলে এই অভিযানও পরিত্যক্ত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে (৬৪৩-৪৪ খ্রীঃ) আবদুল্লা-বিন-ওমরের নেতৃত্বে মেকরান বা বালুচিস্তানের পথে ভারতে অভিযান প্রেরিত হয়। আরবীয়গণ সিন্ধুর উত্তরাঞ্চল কিরমান পর্যন্ত এগিয়ে এলেও খলিফার নির্দেশে স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ের অভিযানের নির্দেশ আসে খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা হজ্জাজ-বিন-ইউসুফের কাছ থেকে। সিন্ধুদেশের দেবল বন্দরে জলদস্যুদের হাতে আরবীয় জাহাজ লুণ্ঠিত হয়। হজ্জাজ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। দাহির ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করলে হজ্জাজ প্রথমে ওবেদুল্লা ও পরে বুদাইল নামে দুই সেনাপতির নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু উক্ত অভিযানগুলি ব্যর্থ হলে হজ্জাজ তাঁর নিকট-আত্মীয় মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন।

৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ-বিন্‌-কাশিম এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ সিন্ধুদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন ও মেকরানে উপস্থিত হন। মেকরানের আরব শাসক মহম্মদ হারুণ সৈন্য ও অন্যান্য সামগ্রীসহ আরব বাহিনীকে শক্তিশালী করেন। বিন কাশিম ৭১২ খ্রীঃ দেবল অধিকার করেন। জাঠ, মেড় ও বৌদ্ধগণ রাজা দাহিরের প্রতি

বিরূপতার কারণে আরব বাহিনীকে সাহায্য করে। বহু হিন্দু সামন্তও দাহিরের বিরুদ্ধে আরবপক্ষে যোগদান করে। ফলে বিন-কাশিম সিন্ধু অধিকার করেন। সিন্ধুনদী উপকূলে দাহিরের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দাহির পরাজিত ও নিহত হন। বিন কাশিম রাওয়ার দুর্গ আক্রমণ করলে দাহির-পত্নী রানীবাই ও পুত্র জয়সিংহ বিপুল বিক্রমে তাদের বাধা প্রদান করে ব্যর্থ হলে রানী জওহর ব্রত পালন করেন। অতঃপর জয়সিংহ আলোয়ার ও ব্রাহ্মণাবাদে ঘাঁটি স্থাপন করে আরবদের বিরোধিতা করেন। কিন্তু হিন্দু-মন্ত্রী ও সামন্তদের বিশ্বাসঘাতকতায় জয়সিংহও পরাজিত হন। এরপর বিন-কাশিম মুলতান অধিকার করেন। অতঃপর কনৌজের বিরুদ্ধে শেষ অভিযান চলা কালে খলিফা বিন-কাসিমকে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন।

মহম্মদ বিন কাশিম স্বদেশে ফিরে গেলে হিন্দু শাসকগণ পুনরায় নিজ নিজ রাজ্য দখল করেন। উমায়েদ বংশীয় খলিফা দ্বিতীয় ওমর বিদ্রোহী হিন্দু রাজাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন তাঁরা স্ব স্ব রাজ্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করবার অধিকার লাভ করবেন। দাহির-পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই হিন্দুধর্ম পুনরায় গ্রহণ করে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আরব-অধিকৃত-সিন্ধুদেশের শাসক জুনায়েদ জয়সিংহকে পরাজিত করেন। কিন্তু ঐ সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একদিকে চালুক্যরাজ পুলকেশী ও প্রতিহাররাজ নাগভট্টের প্রবল বাধা ও অপরদিকে আরব সাম্রাজ্যে অন্তর্বিরোধ ঐস্লামিক রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দিলে ভারতেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

আরব সাম্রাজ্যে আব্বাসীয় বংশের উত্থানের পর সিন্ধুর পথে পুনরায় রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা শুরু হয়। আরবগণ মধ্যপ্রদেশের পথে উজ্জয়িনী পর্যন্ত চলে আসে। কিন্তু আব্বাসীয় বংশের পতনের পর মুলতান ও ব্রাহ্মণাবাদের আরব শাসনকর্তাদের মধ্যে অর্ন্তবিরোধ সিন্ধুদেশে আরব শক্তির পতন অনিবার্য করে। প্রতিহার রাজের অভিযানে আরব রাজ্য ধ্বংস হয়।

আরব আক্রমণের ফলাফল (Impact of Arab conquest)—প্রথমতঃ আরব আক্রমণ ও সাফল্য ভারতে কোন স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। এই অভিযান ভারতের অতি সামান্য অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারা ভারতের অভ্যন্তরে প্রকৃতভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। বাস্তবক্ষেত্রে আরব-শাসিত সিন্ধুদেশ সমগ্র ভারত থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়তঃ একথা স্বীকার্য যে কিছু সংখ্যক ভারতীয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতির উপর এর কোন স্থায়ী প্রভাব তখনও পড়েনি। আরবীয়গণ অপরদিকে হিন্দু দর্শন, চিকিৎসা-বিদ্যা, সঙ্গীত, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও চিত্রশিল্পের উৎকর্ষে আকৃষ্ট হন। সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে আরবী ভাষায় রচনা অনূদিত হয়। বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফাগণ ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হন। অবশ্য আব্বাসীয় বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে আরব-বিজয় একটি 'ফলাফলবিহীন ঘটনা' মাত্র।*

---

* "An episode in the history of India and of Islam, a triumph without result."

—Stanely Lanepool.

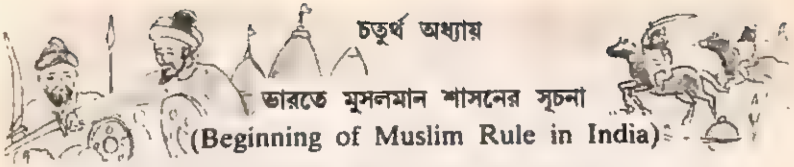

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতে মুসলমান শাসনের সূচনা (Beginning of Muslim Rule in India)

মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থা (Condition of North-Western India on the eve of Muslim Invasion) ;

অষ্টম শতকের সূচনায় সিন্ধুদেশে আরব আক্রমণের পূর্বে ভারতের মাটিতে কোনও বিদেশী শক্তির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু তুর্কী মুসলমানদের ভারত-অভিযানের প্রাক্কালে ভারতে দুটি আরবীয় রাজ্য ছিল, যথা—মুলতান ও সিন্ধু। এছাড়া মালাবার অঞ্চলের তখনকার হিন্দু রাজাদের সহযোগিতায় আরব বণিকদের স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম, আরবীয় আচার-আচরণও গ্রহণ করেছিল।

মুলতান ও সিন্ধু : ৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে খলিফার শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তবক্ষেত্রে স্বাধীন হয়ে যায়। কার্মাথিয়ান ফতে দাউদ মুলতানের শাসক ছিলেন। সিন্ধুদেশ ছিল আরব-শাসিত।

হিন্দুশাহী রাজ্য : হিন্দু রাজাগণ চেনাব নদী থেকে কাবুলসহ হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের শাসক ছিলেন। প্রায় দুশো বছর এই রাজবংশের শাসকগণ এককভাবে আরব আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেন। দশম শতকের শেষভাগে এই বংশের রাজা ছিলেন সুশাসক ও সাহসী যোদ্ধা জয়পাল। গজনীর তুর্কী মুসলমান শাসকদের প্রথম অভিযান জয়পালকে প্রতিহত করতে হয়।

কাশ্মীর ছিল পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। বিখ্যাত কাশ্মীররাজ শংকর বর্মন বিভিন্ন দিকে এই রাজ্যের সীমানা বাড়াতে সমর্থ হন। পরবর্তী কালে রাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সেই সময়ে রাজা ছিলেন প্রভাগুপ্তের পুত্র ক্ষেমগুপ্ত। কিন্তু রানী দিদা-ই ছিলেন প্রকৃত শাসক। শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করে সিংহাসনও দখল করেন রানী দিদা। রানী দিদা ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অর্থাৎ যখন গজনীর সুলতান মামুদ ভারত-অভিযানে ব্যস্ত তখন সীমান্ত রাজ্য কাশ্মীর ছিল এক রানীর শাসনাধীন।

কনৌজ রাজ্যে আনুমানিক ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিহার বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের রাজা বৎসরাজ 'সম্রাট' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা দ্বিতীয় নাগভট্ট। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ ও বাংলার পাল বংশের সঙ্গে সর্বদা দ্বন্দ্বে কনৌজ রাজ্য দুর্বল হয়ে যায়। এই বংশের শেষ রাজা রাজ্যপালের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গজনীর সুলতান মামুদ ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ অধিকার করে।

বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলগণ, গুজরাটের চালুক্য বংশ ও মালবের পারমারগণও কনৌজের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

বাংলার পালবংশীয় শাসক দেবপালের মৃত্যুর পর এই রাজবংশের পতনের সূচনা হয়। পতন ত্বরান্বিত হয়, কনৌজের প্রতিহার বংশ ও দাক্ষিণাত্যের সেন বংশের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে। পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত বিভিন্ন রাজ্যের রাজাগণ নিজ নিজ রাজ্যের বা শাসিত অঞ্চলের স্বার্থকেই বড় করে দেখতেন। দেশে কোনরূপ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব না থাকায় এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা জন্ম নিয়েছিল। এমনকি বিদেশী আক্রমণের মুখেও সমগ্র দেশের শাসকদের নিয়ে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় না। সর্বভারতীয় চেতনা, স্বদেশপ্রেম বিশেষ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন রণকৌশলের প্রতি একপ্রকার মোহ এবং নতুন আক্রমণাত্মক যুদ্ধকৌশল গ্রহণ করায় ছিল অনীহা। তৃতীয়তঃ সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল তীব্র। ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একদিকে মুষ্টিমেয় মানুষ বিলাস-ব্যসনে মত্ত, অপরদিকে দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল অবহেলিত। ফলে উচ্চ আসনে আসীন মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন সমন্বয় গড়ে উঠতে পারে নি। হিন্দুধর্মে প্রচণ্ড গোড়ামি, মন্দিরে সম্পদের প্রাচুর্য, দেবদাসী প্রথা, নানারকমের ব্যভিচার, 'বামমার্গ' দর্শনের প্রভাব, তন্ত্রশাস্ত্র ইত্যাদি সমাজজীবনকে অধঃপতনের পথে নিয়ে যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সম্পর্কে কোন আগ্রহই ছিল না।

সুলতান মামুদ—নবম শতকের শেষভাগে ট্রান্স-অক্সিয়ানা, খোরাসান ও পারস্যের একাংশকে নিয়ে গঠিত একটি রাজ্যের শাসক ছিলেন ইরানীয় বংশোদ্ভূত সামানিদ বংশ। এই সামানিদ বংশের আলপ্তগিন নামক তুর্কী দাস প্রাদেশিক শাসনকর্তা একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল গজনী। পিরাই নামে সুলতান আলপ্তগিনের জনৈক উত্তরাধিকারী সর্বপ্রথম ভারতের প্রতি আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করেন। পিরাই সিংহাসনচ্যুত হলে আলপ্তগিনের জামাতা সবুক্তগিন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান সবুক্তগিন পিরাই-এর নীতি অনুসরণ করলে হিন্দুশাহী রাজ্যের রাজা জয়পালের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ৯৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জয়পাল গজনীর সুলতানকে বাৎসরিক কর দিতে স্বীকৃত হন। সন্ধিচুক্তি সত্ত্বেও দ্বন্দ্বের অবসান হয় না। ঐ অবস্থায় ৯৯৭ খ্রীঃ সবুক্তগিন মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে মারা যান। কিন্তু ইসমাইল সাত মাস শাসন করার পরই তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুলতান মামুদ তাঁকে বিতাড়িত করে নিজে সিংহাসনে বসেন। তাঁর জোরপূর্বক সিংহাসন লাভকে আইনগত মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজনে মামুদ বাগদাদের খলিফা আল্‌কাদির বিল্লার দরবারে উপস্থিত হন। খলিফা তাঁকে ইয়াসিন-উদ্-দৌলা ও আমিন-উল্-মিল্লা উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময় থেকেই সুলতান মামুদের শাসক বংশ ইয়াসিন বংশ বলে খ্যাত হয়।

গজনীতে যখন সুলতান মামুদ পারসিক নবজাগরণের উদগাতা ও তুর্কী উপজাতিগুলির আক্রমণ প্রতিরোধকারী ইসলামের রক্ষাকর্তারূপে পরিচিত, তখন ভারতে তিনি লুণ্ঠনকারী ও মন্দির ধ্বংসকারী রূপে স্বীকৃত। স্যার হেনরী ইলিয়টের মতে, মামুদ সতের বার ভারত আক্রমণ করেছেন।

সুলতান মামুদ সিংহাসনে আরোহণের পরই পিতার বৈরী ও সন্ধিভঙ্গকারী রাজা জয়পালের পাঞ্জাব থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত হিন্দুশাহী রাজ্য আক্রমণ

(১০০১ খ্রীঃ) করেন। এই যুদ্ধে মুলতানের শাসনকর্তা আবুফত দাউদ জয়পালকে সমর্থন করেন। জয়পাল পরাজিত ও বন্দী হন। পরে মুক্তি লাভ করে দুঃখে লজ্জায় আত্মাহুতি দেন। জয়পালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আনন্দপাল সুলতান মামুদের হাতে ওয়াইহিন্দ-এর যুদ্ধে (১০০৮-৯) পরাজিত হলে পাঞ্জাব গজনী শাসনের অধিকারে আসে। এই যুদ্ধে কনৌজ রাজ, আজমীরের শাসক ও খোকর উপজাতীয় লোকগণ আনন্দপালকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। ঐ যুদ্ধের ফলে মুলতানও গজনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। সুলতান মামুদ অতঃপর থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ, কালিঞ্জর, গুজরাটের সোমনাথ মন্দির ইত্যাদি লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রথমতঃ মুলতান ও পাঞ্জাবের একাংশ গজনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। দ্বিতীয়তঃ তুর্কী আক্রমণকারীদের পক্ষে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অনায়াসে অতিক্রম করে ভারতের গঙ্গানদীবিধৌত অঞ্চলে যে-কোন আক্রমণ পরিচালনা সহজতর হল। যদিও ভারতে রাজপুত শক্তির ভারতে উত্থান ঐ সময় থেকেই শুরু হয়। তৃতীয়তঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজ্যগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অসারতা

ফলাফল

ও অক্ষমতা বৈদেশিক আক্রমণকারীদের কাছে উন্মোচিত হল। চতুর্থতঃ মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়া থেকে মুসলমান বণিকের দল বাণিজ্য সূত্রে উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে এসে উপনিবেশ গড়ে তুলতে শুরু করে। বণিকের পথ ধরে এল মুসলমান সুফি ধর্মপ্রচারক। যার ফলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হল। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর পুত্র মাসুদের রাজত্বকালে একদিকে সেলজুক তুর্কী ও অপরদিকে ঘোর রাজ্যের উত্থানের ফলে গজনী রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

অল-বেরুনী (Al-Beruni on Indian culture and civilisation):

৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে খওয়ারিজম বা আধুনিক খিবা অঞ্চলে অল বেরুনীর জন্ম। তাঁর নাম আবু রৈহান মহম্মদ ইবন্ আম্মদ অল বেরুনী। তিনি ১০১৭ থেকে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তের বছর ভারতে কাটিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ রাভি ও সিন্ধুনদীর পূর্ব উপকূলে শিয়ালকোট, লাহোর ও মুলতান পার হয়ে ভারতের ভিতর প্রবেশ করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন, "এখানে যে দেশগুলির কথা বলা হল তার ওপারে এদেশের আর কোন অঞ্চলে যাবার সুযোগ আমাদের হয়নি।" তিনি তারিখ-উল-হিন্দ্ নামক বইটি লিখে ভারত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। ভারতচর্চা করতে তিনি যে-সব বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা তারিখ-উল্-হিন্দের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর মতে (১) ভাষার পার্থক্য

অল বেরুনীর চোখে ভারত

ও ত্রুটিমুক্ত পুঁথির অভাব, (২) ধর্মের পার্থক্য, (৩) সামাজিক আচার-আচরণ ও রীতিনীতির পার্থক্য, (৪) রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কারণে হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ, (৫) হিন্দুদের অদ্ভুত চারিত্রিক প্রবণতা ও কূপমণ্ডুকতা, অন্য জাতির প্রতি তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা ভাব এবং হিন্দুগণের নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার অপরের কাছে গোপন করে রাখার প্রয়াস। অল্ বেরুনী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে ভারত ও তার

জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্ক মূল আলোচনা শুরু করেছেন। দ্বিতীয় থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদে ঈশ্বর, প্রকৃতি ও পুরুষ, ব্যক্ত-অব্যক্ত, আত্মা-পরমাত্মা, ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয়, পতঞ্জলির যোগদর্শন, কপিলের সাংখ্যদর্শন, গীতার কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, বিশ্বরূপ প্রভৃতি হিন্দুধর্মের ও দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যোগদর্শন, সাংখ্যদর্শন, গীতা, বিষ্ণুধর্ম, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে হিন্দুতত্ত্ব ও ব্যাখ্যাকে হিন্দুদের ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন। নবম ও দশম পরিচ্ছেদে হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ বিভাগ, বর্ণ বিভাগের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যান, হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের বিবাহ প্রথা, লৌকিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিন্দুদের মধ্যে এককালে বিচিত্র সামাজিক প্রথার কথা বলতে গিয়ে মহাভারত থেকে ব্যাসদেব ও পাণ্ডুর জন্ম-ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। একাদশ পরিচ্ছেদে হিন্দুদের মধ্যে মূর্তিপূজার কথা বলতে গিয়ে অল বেরুনী বলেছেন, "এর প্রচলন প্রধানতঃ অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সীমিত।" হিন্দু বিগ্রহ তৈরির রীতি ও নিয়মকানুন ও তাঁদের চেহারা বর্ণনার জন্যে বৃহৎ সংহিতা থেকে প্রতিমা নির্মাণ-বিধির পুরো অধ্যায়টি লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ—বেদ, পুরাণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একই পরিচ্ছেদে তিনি সংক্ষেপে মহাভারতের কাহিনী, হরিবংশ ও মহাভারতের আঠারটি পর্বের পৃথক তালিকাও পেশ করেছেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ব্যাকরণ ও ছন্দের ওপর লেখা বইয়ের কথা বলেছেন। ছ'খানি ব্যাকরণ বইয়ের তিনি উল্লেখ করেছেন—ঐন্দ্র, চন্দ্র, শাকট, পাণিনি সর্ববর্মনের যথাক্রমে কাতন্ত্র, শশিদেববৃত্তি, দুর্গাবিবৃত্তি, উগ্রভূতির লেখা শিবহিত বৃত্তি। ছন্দের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "ব্যাকরণের অপর একটি বিজ্ঞান হল ছন্দ।" চতুর্দশ পরিচ্ছেদে অল বেরুনী জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষীর বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ে। হিন্দুদের বর্ণমালা সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। হিন্দুদের চাল-চলন ও বিভিন্ন প্রথার কথাও তিনি বলেন—"হিন্দুগণ তাঁদের শরীরের কোন চুল কাটে না। এক গুচ্ছের আকারে তাঁরা তাঁদের গোঁফ্ রাখে, নখ না কেটে তারা তাদের কুঁড়েমিকে প্রশ্রয় দেয়। একা একা ভোজন করে। আহারের আগে মদ্য-পান করে, পরে গোমুত্র পান করে কিন্তু মাংস খায় না। সুপারি, পানের পাতা ও খড়ি চিবানোর ফলে তাঁদের দাঁত লাল। পাজামার পরিবর্তে পাগড়ি ব্যবহার করে। আবার যারা পাজামা ব্যবহার করে তা এত কাপড় দিয়ে তৈরি করে যা দিয়ে কয়েকখানা বিছানার চাদর ও ঘোড়ার জিনের নিচের আচ্ছাদন তৈরি করা যায়। উৎসবের দিনে তাদের দেহে সুগন্ধির বদলে গোময় ব্যবহার করে" ইত্যাদি। তিনি যাদুকলা ও রসায়ন বিদ্যা সম্পর্কেও আলোচনা করছেন। উনিশ থেকে আশি পর্যন্ত ৬২টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ৫২টিতেই অল বেরুনী প্রধানতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও তার বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে বলেছেন। তিনি দিয়েছেন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ—ভারতের বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা। তেষট্টি থেকে তিয়াত্তর এই ১১টা পরিচ্ছেদ তিনি হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য গঠন
(From invasion to Empire)

মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ (Invasions of Mohummed Ghori) :
গজনী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে একদিকে পারস্যে খোয়ারিজম্ রাজশক্তি এবং অপরদিকে উত্তর-পশ্চিম আফ্‌গানিস্তানের গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সাহানসবানা বংশোদ্ভূত এককালে গজনীর মামুদের সামন্ত ঘোর রাজ্যের উত্থান হয়। ঘোর রাজ্যের অধিপতি সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন গজনী রাজ্য আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেন এবং 'জাহানসুজ' উপাধি গ্রহণ করেন। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ গজনী দখল করে তাঁর ভাই মুইজউদ্দিন মহম্মদকে তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে দাদার মৃত্যুর পর মুইজউদ্দিন ঘোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খোরাসান রাজ্যের অধিকার নিয়ে খোয়ারিজম রাজশক্তি ও ঘোর রাজ্যের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। অবশেষে খোরাসান খোয়ারিজম-অধিপতি দখল করেন। এমতাবস্থায় ঘোর রাজ্যের সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির দৃষ্টি ভারতের দিকেই পড়ল।

১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী সর্বপ্রথম মুলতান ও উচ্ দখল করেন। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানার মরুভূমির মধ্য দিয়ে গুজরাটে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন মহম্মদ ঘোরী। কিন্তু গুজরাটের বাঘেলা বংশের রাজা দ্বিতীয় ভীমের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গজনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাবের পেশোয়ার, ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শিয়ালকোট, ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে মহম্মদ ঘোরীর কর্তৃত্ব স্থাপনের পরই ভারতে প্রবেশের পথ প্রশস্ত হয়।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ (১১৯১ খ্রীষ্টাব্দ)

ইতিমধ্যে দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশীয় শাসক পৃথ্বীরাজ রাজস্থানের ছোট ছোট রাজ্য দখল করেন। বুন্দেলখণ্ডের চাণ্ডেলা বংশীয় শাসককে পরাজিত করে গুজরাটের শাসক দ্বিতীয় ভীমের নিকট পরাজিত হয়ে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হন। অপরদিকে মহম্মদ ঘোরীও পাঞ্জাবের গজনী রাজ্য অধিকার করে উত্তর-ভারতের দিকে অগ্রসর হলেন। মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। একমাত্র কনৌজরাজ জয়চাঁদ ব্যতীত উত্তর-ভারতের প্রায় সকল রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজের পক্ষে যোগদান করেন। কথিত আছে, জয়চাঁদ-দুহিতা সংযুক্তাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে পৃথ্বীরাজ অপহরণ করায় কনৌজরাজ জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। একদিকে পৃথ্বীরাজ ও অপরদিকে মহম্মদ ঘোরী তাবারহিন্দের (ভাতিন্দা) ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই যুদ্ধের সূচনা হয়। উভয় বাহিনী থানেশ্বরের সন্নিকটে তরাইন নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন।

মহম্মদ ঘোরী এই শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে না পেরে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে

পুনরায় তরাইন প্রান্তরে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ উপস্থিত হন। পৃথ্বীরাজও কনৌজের জয়চাঁদ ব্যতীত অপর রাজপুত রাজাদের সহযোগিতায় বিরাট বাহিনীসহ তুর্কী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে পরাজিত হন ও পরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তরাইন-এর দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের ফলে দিল্লী ও রাজস্থানের পূর্বাঞ্চলে মহম্মদ ঘোরীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হল। অতঃপর ভারতের বিভিন্ন

কুতুবুদ্দিন আইবাক

অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দাস-সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবকের ওপর ন্যস্ত করে মোহম্মদ ঘোরী গজনী ফিরে গেলেন। পৃথ্বীরাজের পুত্রকে রনথম্ভোরে সামন্তরাজ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হল। পরবর্তী দুবছরে আইবক হান্সি, মীরাট, বারান, কয়েল (আজকের আলিগড়) জয় করে, দিল্লিতে রাজধানী স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পুনরায় ভারতে ফিরে যমুনা নদী অতিক্রম করে কনৌজের রাঠোর-রাজ জয়চাঁদের রাজ্য আক্রমণ করেন। কনৌজের নিকটবর্তী এটাওয়া জেলার চাঁদওয়ার রণক্ষেত্রে তুর্কী ও রাজপুত বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জয়চাঁদ নিহত হন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ও চাঁদওয়ার যুদ্ধে তুর্কীদের সাফল্য ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরকাল সময় তুর্কীগণ তাদের শাসন সুসংবদ্ধ করবার কাজে নিয়োগ করেছিল। অতঃপর মহম্মদ ঘোরী বারাণসী আক্রমণ করে বহু মন্দির ধ্বংস করেন। ১১৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেয়ানা ও গোয়ালিয়র অধিকার করেন। ১১৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবক বদায়ুন, মালবের একাংশ, ১২০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করেন। এইভাবে কালিঞ্জর, মাহোবা ও খাজুরাহোকে নিয়ে একটি সামরিক কর্তৃত্ব আইবক প্রতিষ্ঠা করেন।

মহম্মদ ঘোরী ও কুতুবুদ্দিন আইবক যখন উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয়-যমুনা উপত্যকায় সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত, তখন ইখতিয়ারউদ্দিন-বখতিয়ার খালজী নামে জনৈক ভাগ্যান্বেষী পূর্ব-ভারতে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। প্রথমে তিনি ১১৯৭ খ্রীঃ বিহারে বৌদ্ধমঠ নালন্দা ও বিক্রমশীলা ধ্বংস করেন। একটি বৌদ্ধ পাঠাগার

বখ্‌তিয়ার খালজীর বঙ্গদেশ জয়

পুড়িয়ে দেন ও বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গদেশে যাওয়ার পথ ও তথাকার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। সেই সময় বঙ্গদেশ ছিল কৃষি ও শিল্পে প্রাচুর্যের দেশ। বৈদেশিক বাণিজ্যেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। বঙ্গদেশের আর্থিক প্রাচুর্যে প্রলুব্ধ হয়ে বক্তিয়ার খালজি বঙ্গদেশের রাজধানী আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও চলে যান। কথিত আছে, খালজী মাত্র সতের জন অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে নবদ্বীপ অধিকার করেন। কিন্তু এ-তথ্য সঠিক নয়। বাংলার নতুন রাজধানী হল লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়।

একদিকে যখন কুতুবউদ্দিন আইবক ও তুর্কী সেনাপতিরা উত্তর-ভারতে এবং অপর দিকে খালজীগণ বক্তিয়ারের নেতৃত্বে পূর্ব-ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত, তখন মহম্মদ ঘোরী ও তাঁর ভাই মধ্য-এশিয়ার ঘোর সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। এই সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির ফলে ঘোরীদের খোয়ারিজম রাজ্যের

সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত করল। ১২০৩ খ্রীঃ মহম্মদ ঘোরী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। এই পরাজয় ঘোরীর শত্রুদের উৎসাহিত করল। মধ্য-এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হল। অপরদিকে শুধুমাত্র ভারতের সাম্রাজ্য সুসংগঠিত করার সম্ভাবনা প্রশস্ত করল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পশ্চিম-পাঞ্জাবে খোকর উপজাতি বিদ্রোহ শুরু করায় ১২০৬ খ্রীঃ মহম্মদ ঘোরী শেষ বারের মতো বিদ্রোহ দমনে ভারতে এলেন। বিদ্রোহ দমন করে গজনী ফিরে যাওয়ার সময়ে গুপ্ত আততায়ীর হাতে তিনি প্রাণ হারালেন।

ঘোরীর মৃত্যুঃ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ

কুতুবউদ্দীন আইবকঃ

মহম্মদ [illegible]র মৃত্যু উত্তর-ভারতের তুর্কী সাম্রাজ্যকে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করাল। কালিঞ্জর, বদায়ুন, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলে রাজপুত শক্তি তুর্কী কর্[illegible]দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বঙ্গদেশে [illegible]তিয়ার খালজীর তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার পর, সাথী আলী [illegible]দান খালজী কর্তৃক নিহত হলেন। সীমান্তের ওপারে খোয়ারিজম রাজ্যের শাসক গজনী ও ঘোর রাজ্য দখলের প্রস্তুতি নিলেন। তৃতীয়তঃ [illegible]রীর দাস-সেনাপতি তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ ও নাসিরউদ্দিন কুবাচার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তুর্কী সাম্রাজ্যের সংহতিকে বিপদগ্রস্ত করে তুলল।

সমস্যাসমূহ

১২০৬ খ্রীঃ মহম্মদ ঘোরী কুতুবউদ্দিন আইবককে 'মালিক' উপাধিতে ভূষিত করে ভারতে তাঁর প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করেন। ১২০৮ খ্রীঃ ঘোরীর গজনীর উত্তরাধিকারী গিয়াসুদ্দিন মামুদ আইবককে 'সুলতান' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইতিপূর্বে তিনি মামুদের কাছ থেকে গজনীর কাজীর মারফত দাসত্বমুক্তির পত্র পেয়েছেন। এবং ঐ সময় থেকেই দিল্লীর সুলতানী যুগের সূচনা।

সুলতান উপাধি লাভঃ ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দ

'মালিক' উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পর আইবক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নিজ ক্ষমতা শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। নিজে তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের কন্যাকে বিবাহ করলেন, বোনকে বিয়ে দিলেন মুলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচার সঙ্গে। আর স্বীয় কন্যাকে ইলতুতমিসের হাতে তুলে দিলেন।

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন

কুতুবউদ্দিনের রাজত্বকাল স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। বৈদেশিক বিষয়েই তিনি বেশি ব্যস্ত থাকতেন। তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ গজনীর শাসনকর্তারূপে মহম্মদ ঘোরীর দিল্লীসহ সমগ্র সাম্রাজ্যের ওপর কর্তৃত্ব দাবি করেছিলেন। অপরদিকে খোয়ারিজম রাজ্যের সুলতান পারস্য সহ সমগ্র মধ্য-এশিয়ার শাসকরূপে গজনীর প্রতি নজর দিলেন। ঐ অবস্থায় ভারতের তুর্কী সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিপদের সম্মুখীন হল। আইবক সেই কারণেই রাজধানী দিল্লীর পরিবর্তে লাহোরে স্থায়ীভাবে নিজের কর্মকেন্দ্র গড়ে তুললেন।

মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দিন মামুদকে বিতাড়িত করে ইয়ালদুজ গজনী অধিকার করেন। কিন্তু ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে খোয়ারিজম শাসনকর্তা

তাজউদ্দিনকে গজনী থেকে বিতাড়িত করেন। আইবক সুযোগ বুঝে গজনী দখল করেন। কিন্তু চল্লিশ দিনের মধ্যেই গজনীর মানুষ আইবক সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে তাজউদ্দিনকে পুনরায় আমন্ত্রণ জানায়। ঐ অবস্থায় কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লীতে ফিরে এলেন। দিল্লীর সঙ্গে গজনীর তথা মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দিল্লীর সুলতানী রাজত্বের স্বাধীন যুগের সূচনা হয়।

গজনীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ

এমতাবস্থায় আইবকের পক্ষে বিদ্রোহী রাজপুতদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। এমনকি বঙ্গদেশের বখ্‌তিয়ার খাল্‌জীর হত্যাকারী আলি মর্দান সমস্ত ক্ষমতা দখল করলে আহম্মদ সিরান ও মহম্মদ সিরানের নেতৃত্বে আলি মর্দান বন্দী হল। বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে তিনি আইবকের দরবারে সাহায্য প্রার্থী হলে আইবক কোয়াইমুজ রুমীকে পাঠান। রুমী হুসামুদ্দিন আইয়াজকে বঙ্গদেশে স্থাপন করেন। পরে আইবক আলি মর্দানকে পুনরায় বঙ্গদেশের শাসক পদে নিয়োগ করেন। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে আইবকের মৃত্যু হয়।

সামসুদ্দীন ইলতুতমিস (১২১১-১২৩৬ খ্রীঃ)

কুতুবউদ্দীন আইবকের মৃত্যুর পর লাহোরের খান, আমীর, মালিকগণ তাঁর পালিত-পুত্র আরাম শাহকে দিল্লীর সুলতান পদে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু দিল্লীর খান, আমীর ও মালিকগণ অযোগ্য আরাম শাহকে মেনে নিতে অস্বীকার করে আইবকের দাসত্ব থেকে মুক্ত জামাতা, বদায়ুনের শাসনকর্তা ইল্‌তুতমিসকে সিংহাসন গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ইলতুতমিস বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ দিল্লীর পথে আরাম শাহকে পরাজিত করে স্বয়ং ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইলতুতমিসের সিংহাসন আরোহণ মোটেই সুখকর ছিল না। শাসনের সূচনা থেকেই নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হলেন। প্রথমতঃ তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ গজনীর শাসকরূপে দিল্লীর ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করলেন। দ্বিতীয়তঃ মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীন কুবাচা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ভাতিন্দা, কুহরাম্‌, সারাসুতী অধিকার করে লাহোর অবরোধ করলেন। তৃতীয়তঃ বঙ্গদেশে কুতুবউদ্দীন নিযুক্ত শাসনকর্তা আলি মর্দান খালজী স্বাধীনতা ঘোষণা করে সেখানে এক সন্ত্রাসের রাজত্বের সূচনা করেন। চতুর্থতঃ দিল্লীর কিছু রাজকীয় রক্ষী ইলতুতমিসের কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকৃত হল। পঞ্চমতঃ রাজপুতগণ সুযোগ বুঝে কালিঞ্জর, গোয়ালিয়র, বেয়ানা, আজমীরসহ প্রায় সম্পূর্ণ রাজস্থান তুর্কী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। প্রকৃতপক্ষে ইলতুতমিসের রাজ্যসীমা দিল্লী, বাদায়ুন ও পূর্বে বারাণসী থেকে পশ্চিমে সিবলিক পাহাড় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রাথমিক সমস্যাসমূহ

বহির্ভারতেও দুটি বড় বিপদের সম্মুখীন হলেন ইলতুতমিস। প্রথমতঃ মধ্য-এশিয়ায় তৎকালে সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন রাজ্য খোয়ারিজম—তার পূর্ব সীমা সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত করল। দ্বিতীয়তঃ চেঙ্গিজ খাঁ মোঙ্গলজাতিকে এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত করলেন।

সুলতান সামসউদ্দীন ইলতুতমিস উপরোক্ত সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করে তুর্কী মুসলমান শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমতঃ তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে খোয়ারিজম শাহ আলাউদ্দীন মহম্মদ কর্তৃক গজনী থেকে বিতাড়িত হয়ে লাহোরে আশ্রয় নিয়ে পাঞ্জাবের অধিকাংশ অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। ইলতুতমিস কালক্ষেপ না করে বিশাল বাহিনীসহ লাহোরের পথে তরাইনে ইয়ালদুজকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। বাদায়ুনের কারাগারে বন্দী অবস্থায়

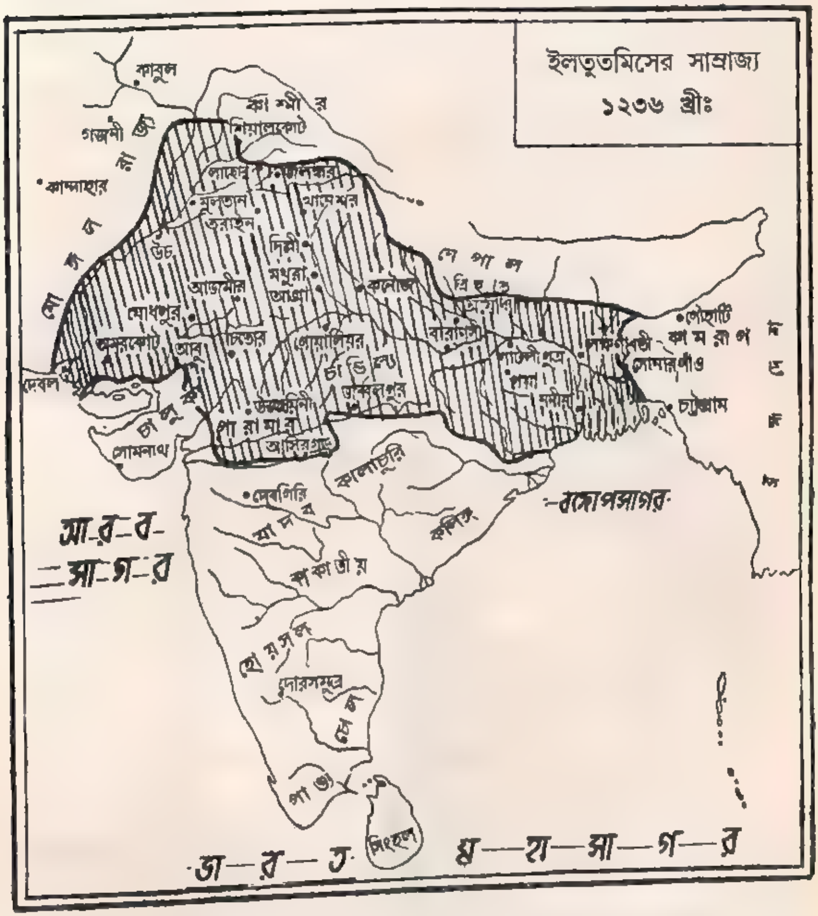

ইলতুতমিসের সাম্রাজ্য
১২৩৬ খ্রীঃ

ইয়ালদুজের মৃত্যু ও পরাজয়

তিনি মারা যান। দ্বিতীয়তঃ ১২১৭ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীনকে ইলতুতমিস যুদ্ধে পরাজিত করে লাহোরে স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। কুবাচা মুলতান ও সিন্ধু দেশে স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ইয়ালদুজ ও কুবাচার পরাজয়ে গজনীর সঙ্গে দিল্লীর সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন হল। তৃতীয়তঃ ইতিমধ্যে ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিজ খাঁ খোয়ারিজম রাজ্য আক্রমণ করলে যুবরাজ মাঙ্গবর্নী পাঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চেঙ্গিজ খাঁ মাঙ্গবর্নীর পশ্চাদ্ধাবন করে

সিন্ধু পর্যন্ত অগ্রসর হলে যুবরাজ ইলতুতমিসের আশ্রয় প্রার্থী হন। কিন্তু ইলতুতমিস চেঙ্গিজ খাঁর বিরুদ্ধে জালালউদ্দীনকে আশ্রয় দিয়ে দিল্লীর সুলতানী শিশুরাষ্ট্রের বিপদ বাড়াতে চান নি। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে যুবরাজের আবেদন নামঞ্জুর করেন। যুবরাজ সিন্ধুর পথে ফিরে গেলেন। সংকটের হাত থেকে ইলতুতমিস দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। চেঙ্গিজ খাঁও আফগানিস্তান থেকে ফিরে গেলেন। অতঃপর ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুতমিস একদিকে লাহোর থেকে মুলতানের পথে ও অপরদিকে দিল্লী থেকে উচের দিকে সাঁড়াশি অভিযান করলে নাসিরুদ্দীন কুবাচা উপায়ন্তর না দেখে সিন্ধু নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুতমিস বঙ্গদেশের দিকে দৃষ্টি দেন। তখন বঙ্গদেশের স্বাধীন শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন আইওয়াজ খালজী। দিল্লীর সুলতান বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। গিয়াসউদ্দীন বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু পুনরায় বিদ্রোহী হলে ইলতুতমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীন মামুদ যুদ্ধে বাংলার সুলতানকে পরাজিত ও নিহত করেন। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু হলে ইখতিয়ারউদ্দীন বাল্কাকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বাল্কা বিদ্রোহী হলে ১২৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুতমিস ইখতিয়ার উদ্দীনকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। দিল্লীর সুলতান স্বীয় অনুচর আলাউদ্দীন জানিকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনরায় বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা করেন।

১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুত বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় প্রয়োজনে ইলতুতমিস সসৈন্যে অগ্রসর হন। রণথম্ভোর ও মান্দোরে দিল্লীর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

১২২৮-২৯ এ জালোর, বেয়ানা, যান্দির, আজমীর, সম্ভার, নাগাযুরে এবং ১২৩১-এ গোয়ালিয়রে, ১২৩৪-এ মালব আক্রমণ করে বিখ্যাত মহাকালের মন্দির ধ্বংস করেন। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুতমিসের মৃত্যু হয়।

সুলতান সামসউদ্দীন ইলতুতমিসের শাসনকাল ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নির্ভীক ও বুদ্ধিমান শাসক হিসাবে তাঁর শাসনকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দিল্লীর কুতুব মিনার তার বিশিষ্ট শিল্প কীর্তি। তিনি ভারতে একটি সার্বভৌম স্বাধীন তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক। তিনিই সর্বপ্রথম দিল্লীতে একটি সুসংহত রাজধানী, একটি ঐস্লামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র, একটি মজবুত রাজতন্ত্রসম্মত সরকার, 'চল্লিশ দাসের চক্র, নামে খ্যাত একটি আমলা বাহিনী, একটি রৌপ্য 'তঙ্কা' ও তাম্র 'জিতাল', ইক্‌তা বা সুসংগঠিত প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা, ও সর্বশেষ কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করার মাধ্যমে একটা সুস্থ উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলন করেন। গোঁড়া মুসলমান সমাজে নারীর এজাতীয় মর্যাদা অভাবনীয়।

গিয়াসউদ্দীন বলবন—ইলতুতমিসের মৃত্যুর পর 'চল্লিশ দাসের চক্র' সকল ক্ষমতার উৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কোন সুলতানের সিংহাসনে আরোহণ বা অপসারণ উক্ত চক্রের ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে উঠল। ১২৩৬ থেকে ১২৬৫-র মধ্যে একের পর এক রুক্‌নউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১২৩৬), রাজিয়া (১২৩৬-৪০), মুইজউদ্দীন বাহরাম শাহ (১২৪০-১২৪২), আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ (১২৪২-৪৬), নাসিরুদ্দীন মামুদ (১২৪৬-১২৬৫)—ছ'জন সিংহাসনে বসেন ও অপসারিত হন। ফলে সুলতানের পদ-মর্যাদা ও ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পায়। অবশেষে 'চল্লিশ চক্রের'ই একজন গিয়াসউদ্দীন বলবন নাম গ্রহণ করে ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবন

ইলতুতমিসের ন্যায় বলবনের সিংহাসনে আরোহণও সুখকর ছিল না। 'চল্লিশ চক্রে'র ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্য, দুর্বল রাজশক্তির প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধাহেতু বিশৃঙ্খল অবস্থা, দিল্লীর উপকূলে মেওয়াটি দস্যুদের অত্যাচার, দিল্লী-বঙ্গদেশ সম্পর্কের ক্রমাবনতি, রাজপুত-শক্তির পুনরায় বিদ্রোহ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা সর্বত্র এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

সমগ্র সাম্রাজ্যে শান্তি ও সংহতি ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনে প্রশাসনিক নীতিরূপে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস আবশ্যিক ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অবাধ সার্বভৌম স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি সমস্ত শাসনক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন। ভগবানপ্রদত্ত রাজক্ষমতার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। বলবন প্রথমেই সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধি ও জনসাধারণের চোখে শ্রদ্ধাভক্তি ও ভীতির উদ্রেক ঘটানোর প্রয়োজনে, (১) তুর্কী পৌরাণিক বীর আফ্রাসিয়াবের বংশধররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করলেন, (২) সুলতানের দরবারে সিজদা (সুলতানের সামনে নতজানু হওয়া), পাইবস্ (অর্থাৎ সিংহাসন চুম্বন করা) প্রভৃতি পারসিক রীতি প্রচলন করেন, (৩) রাজদরবারে মদ্যপান, নৃত্যগীত বা লঘু চপলতা নিষিদ্ধ করেন, (৪) উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের জন্যে এক বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রবর্তন করেন, (৫) নীচ-বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপন (বাক্যালাপ বা উপহার প্রদান বা চাকুরিতে নিয়োগ) বন্ধ করে দেন। এছাড়াও উপযুক্ত রাজপোশাক পরিধান করে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সুসজ্জিত দেহরক্ষীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে দরবার কক্ষে তিনি রাজকার্য সম্পাদন করতেন।

সমস্যাসমূহ

সুলতানের মর্যাদা

বলবন তাঁর ক্ষমতাকে অবাধ সার্বভৌম করবার প্রয়োজনে 'চল্লিশ দাস চক্রে'র ক্ষমতাকে কঠোর হাতে খর্ব করলেন। গোপনে বিষ প্রয়োগে হত্যা, প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাত, মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি তিনি প্রয়োগ করতেন। অপরদিকে সাধারণ প্রজাদের সমর্থন লাভের প্রয়োজনে তিনি পক্ষপাতশূন্য ন্যায় বিচারের প্রবর্তন করেন। তৃতীয়তঃ 'বারিদ' নামে এক গুপ্তচর বিভাগের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সকল প্রকার কর্মচারীদের কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবার ব্যবস্থা করেন। বলবনের শাসনব্যবস্থার মূল শক্তিই ছিল সামরিক বাহিনী। তিনি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বাহিনী গঠনের প্রয়োজনে সামরিক বিভাগ পুনর্গঠিত করেন। বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য সৈন্যদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন।

সুলতানের ক্ষমতা বৃদ্ধি

ইলতুতমিসের মৃত্যুর পর থেকে দিল্লীর সন্নিকটে, গঙ্গা-যমুনা দোয়ার অঞ্চলে অযোধ্যার পথে, বাদায়ুনের চারদিকে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। মেওয়াটি রাজপুত ছাড়াও দস্যু ও ডাকাতদের অত্যাচার, লুণ্ঠন চরম অবস্থায় পৌঁছয়। এমনকি রাজধানী দিল্লীর মানুষও শান্তিতে বসবাস করতে পারত না। এমতাবস্থায় বলবন গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দেন। জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে আফগান সৈন্যদের উপনিবেশ গড়ে তোলেন। বলবনের কঠোর ব্যবস্থার ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে।

শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন

বঙ্গদেশে স্বাধীন বক্তিয়ার খালজীর শাসনকাল থেকেই দিল্লীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব বাংলা কখনও মেনে নিতে চায়নি। এমনকি দিল্লী থেকে নিযুক্ত শাসনকর্তারাও

বঙ্গদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্রীল খাঁ বিদ্রোহ করেন। পর পর দুবার দিল্লীর অভিযান ব্যর্থ হলে বলবন স্বয়ং বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় অভিযানের নেতৃত্ব দেন। তুঘ্রীল যুদ্ধে নিহত হন। দ্বিতীয় পুত্র বুখরা খাঁকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে বলবন দিল্লী ফিরে যান।

বাংলার বিদ্রোহ

মোঙ্গলগণ ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তাঁদের নেতা চেঙ্গিস খাঁর ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর শক্তিশালী মোঙ্গল সাম্রাজ্য তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিভক্ত হয়। একজন ভাইকে খান্ পদে অভিষিক্ত করে সকলের মধ্যে একতা বজায় রাখার চেষ্টা হত। চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর থেকে ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোঙ্গলগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শতদ্রু নদী অতিক্রম করবার কোন চেষ্টা করেন নি। ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে তায়ার বাহাদুর লাহোরের সুলতানী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ চূর্ণ করে শহরটিকে জনশূন্য করে। ১২৪৫-এ মুলতানে মোঙ্গল হামলা হলে বলবনের নেতৃত্বে শহরটি রক্ষা পায়। প্রকৃতপক্ষে বলবনের সিংহাসনে আরোহণকালে ভারতীয় সীমান্ত বিয়াস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—বিয়াস নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত ছিল মোঙ্গল অধিকারে। শাসকরূপে বলবন একদিকে কূট-কৌশল অপরদিকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে ভারতের সুলতানী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেন। মোঙ্গল নেতা হাসান কোয়ারলুগের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও হলাকু খাঁর সঙ্গে দূত বিনিময়ের মাধ্যমে এক শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করেন। অপরদিকে শের খাঁর নেতৃত্বে ভাতিণ্ডা, দীপালপুর ও লাহোরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তিনি জোরদার করেন। ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁর মৃত্যুর পর বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে দুভাগে বিভক্ত করে মুলতান, সিন্ধু ও লাহোরের দায়িত্ব দেন যুবরাজ মহম্মদের ওপর এবং সুনাম ও সামানার দায়িত্ব দেন দ্বিতীয় পুত্র বুখরা খাঁকে। ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে যুবরাজ মহম্মদ নিহত হন।

বৃদ্ধ সুলতান বলবন সুযোগ্য পুত্রের অকাল মৃত্যুর মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যুবরাজের পুত্র কাইখস্রুকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বলবন প্রায় ৪০ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে তুর্কী সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রেখে তাকে শক্তিশালী করে যান। একদিকে সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন ও অপরদিকে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করেন। কিন্তু 'চল্লিশ চক্রের' ক্ষমতা হ্রাস করতে গিয়ে তুর্কীদের পতন ও খালজী শক্তির উত্থানের পথ প্রশস্ত করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খালজী সাম্রাজ্যবাদ

(Khalji Imperialism)

আলাউদ্দিন খালজী :

বলবনের পৌত্র কায়কোবাদ ও তাঁর শিশুপুত্র কাইমুর্সকে হত্যা করে জালালউদ্দিন ফিরোজশাহ খালজী দিল্লীতে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে খালজী শাসক বংশের পত্তন করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা ও কারা—মালিকপুরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা আলি গুরুসাম্প ছিলেন বৃদ্ধ সুলতানের অত্যন্ত প্রিয়। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ সুলতানের বিনা

আলাউদ্দিন খল্‌জী

অনুমতিতে আলি গুরুসাম্প দেবগিরি আক্রমণ করে প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হন। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান কারায় উপস্থিত হলে আলী বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার দ্বারা স্নেহান্ধ পিতৃব্যকে হত্যা করে, আলাউদ্দিন উপাধি নিয়ে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন। জঘন্য এই হত্যার খবর দিল্লী পৌঁছলে সুলতানের বিধবা পত্নী মালিকা-ই-জাহান তাঁর পুত্র রুকন্‌উদ্দিন-ইব্রাহিমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া দিল্লীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। আলাউদ্দিন প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সমর্থন লাভ করে ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে দিল্লী আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাজিত ও বন্দী হন। নিহত সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আরকলি খাঁও বন্দী হলেন। আরকলি খাঁ ও রুকন্‌উদ্দিন ইব্রাহিমের চক্ষু উৎপাটিত করে হান্‌সির দুর্গে বন্দী করে রাখা হল। উৎকোচ লোভী বিশ্বাসঘাতক উচ্চপদস্থ

সিংহাসন লাভ

কর্মচারীদেরও আলাউদ্দিন কঠোর শাস্তি দান করলেন।

আলাউদ্দিন খালজী ছিলেন অবাধ সার্বভৌম রাজ-কর্তৃত্বে বিশ্বাসী। তিনি সমস্ত শাসনক্ষমতা সুলতানের হাতে কেন্দ্রীভূত করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ভগবান-প্রদত্ত রাজক্ষমতার আদর্শ ছিল তাঁর প্রেরণা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা কোন দল-উপদলের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না।★ তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের মানুষ হয় তাঁর প্রজা, না হয় তাঁর দাস।

আলাউদ্দিনের আদর্শ

শাসনের সূচনাতেই তিনি পরপর চারটি বিদ্রোহের যথা—নব মুসলমান সৈন্যদের বিদ্রোহ, ভ্রাতুষ্পুত্র আঁকাত খাঁর বিদ্রোহ, দুই ভাগ্নে উমর খাঁ আর মঙ্গু খাঁর বিদ্রোহ ও হাজি মৌলার বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। বিদ্রোহ সাফল্যের সঙ্গে দমনের পরই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্যে বিশ্বাসী কর্মচারীদের নিয়ে মজলিস-ই-খাস-এর সভায় গভীরভাবে আলোচনা করেন। আলোচনা থেকে চারটি কারণ নির্দেশিত হল, যথা—(১) সাম্রাজ্যে গুপ্তচর ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যে প্রজাসাধারণ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মনোভাব ও কার্যকলাপ সুলতানের পক্ষে বিশদভাবে জানা সম্ভব ছিল না। (২) মদ্যপানের ব্যপকতা ও ঘন ঘন মদ্যপানের আসরে মেলামেশা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে সরকার-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্য করত। (৩) খান, আমীর, মালিক প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তিদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা, বন্ধুত্বস্থাপন ও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেও সুলতান-বিরোধী জোট গড়া সম্ভব হত। (৪) কিছু কিছু ব্যক্তির হাতে উদ্বৃত্ত টাকা সঞ্চিত হওয়ায় তাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতালোভ দেখা দিত।

বিদ্রোহের মোকাবিলা

সুলতান আলাউদ্দিন বিদ্রোহের উপরোক্ত কারণ নির্দেশিত হওয়ার পর স্থায়ীভাবে সকল ত্রুটি দূর করবার জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ সুলতানের এক হুকুমনামার মাধ্যমে ইনাম্, মিল্‌ক বা ওয়াকফ্ বাবদ দেওয়া জমি বা জায়গির বাজেয়াপ্ত করে খাস্ জমিতে পরিণত করা হয়। কখনও খাস্ ছিল না—এমন জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। বাস্তবক্ষেত্রে বিনা খাজনায় জমি ভোগ করার রীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ সরকারী গুপ্তচর ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করে, এমন ভাবে গুপ্তচর ব্যবস্থা নতুন করে সাজানো হয় যাতে সরকারী দপ্তরে, হাটে-বাজারে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গৃহের সকল সংবাদ সুলতানের কর্ণগোচর হয়। নতুন এই গুপ্তচর ব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যের প্রকাশ্য স্থানে—এমনকি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যেও সকলপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ সুলতানের অনুমতি ব্যতিরেকে সামাজিক মেলামেশা, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বন্ধ হয়। চতুর্থতঃ, দিল্লীতে মদ্যপান ও মদ বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। আলাউদ্দিন স্বয়ং মদ্যপান বন্ধ করে রাজপ্রাসাদের সকল পানপাত্র প্রকাশ্য রাজপথে ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করেন। অল্পদিনের ভেতরই মদ্যের চোরা-কারবার শুরু হয়। তখন সুলতান পূর্ব-নির্দেশ সংশোধন করে, নিজগৃহে

বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা

★'Kingship knows no kinship'.

তৈরি ও পানের অনুমতি দান করেন। এছাড়া খুত্, মোকদ্দম, চৌধুরী তিনটি উপাধিধারী রাজস্ব বিভাগের হিন্দু কর্মচারীদের হাতেও যাতে উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত হতে না পারে তার জন্যেও তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। গোচারণ কর, ভিটে-কর ও জিজিয়ার মাধ্যমে ও খারজ জমির রাজস্ব ফসলের অর্ধাংশ নির্দেশ করে উদ্বৃত্ত সঞ্চিত ধন কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহের মাধ্যমে খান, আমীর, মালিক প্রভৃতি উপাধিধারী, রাজকর্মচারীদের প্রকৃতপক্ষে দাসে (slave) পরিণত করেন।

অতঃপর সুলতান রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করবার প্রয়োজনে উলামাদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটান। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রচলন করেন।

সুলতানই ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস। সমস্ত ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। মন্ত্রীগণ ছিলেন তাঁর আজ্ঞাবহ কর্মচারী স্বরূপ। মন্ত্রীদের সঙ্গে কখনও কখনও পরামর্শ করতেন। কিন্তু পরামর্শ গ্রহণ বা বর্জন করা তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারতেন না। শাসনব্যবস্থায় সুলতানের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ করতে গিয়ে সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে আলাউদ্দিন নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করেন। তুর্কী শাসকগণের শাসনকালে কেন্দ্রের কোন বাদশাহী সৈন্যবাহিনী ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সৈন্য-বাহিনীর ওপরই সুলতানগণ নির্ভরশীল ছিলেন। আলাউদ্দিন খালজী নিজের কর্তৃত্বে নিজস্ব কেন্দ্রীয় বেতনভোগী সৈন্যবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য সুলতানের সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা ও মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষার বিধানের জন্যে কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি একটি কেন্দ্রীয় স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন ও আরজ-ই মুসালিক নামে একটি পদ সৃষ্টি করে সামরিক বিভাগের দায়িত্ব দেন। সৈন্যদের বছরে ২৩৪ 'টঙ্কা' বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করেন। এই বেতনে যাতে সৈন্যগণ স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করতে পারে তার জন্যে সুলতান নিত্যব্যবহার্য সকলপ্রকার জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেন। এটা তাঁর মুল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

কেন্দ্রীকরণ নীতি

কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী

সুলতান বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য, গবাদি পশু, ঘোড়া, সুতী ও রেশমের কাপড়চোপড়, নারকেল তেল ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য, দাস-দাসী ইত্যাদি সকল প্রকার নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেঁধে দেন। লাভের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। বাজারে খাদ্যশস্যের নিয়মিত যোগানের ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্যশস্য নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর কঠোর-নজর রাখার ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয়তঃ সরকারী ব্যবস্থাপনায় ও কর্তৃত্বে কয়েকটি খামার ও তিনটি বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সকল সরকারী খামার ও বাজার থেকে বণিক ও সাধারণ মানুষ সরকারী মূল্যে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করতে পারত। দিল্লীতে স্থাপিত তিনটি বাজারের একটিতে খাদ্য-শস্য, দ্বিতীয়টিতে গবাদি পশু, ঘোড়া ও দাস-দাসী বিক্রয়কেন্দ্র ও অপরটি ছিল বিদেশী বস্ত্রসহ

মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের জন্যে। তৃতীয়তঃ দিল্লী থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের নগদ টাকার পরিবর্তে রাজস্ব বাবদ শস্য দিতে বাধ্য করা হয়। এই সকল খাদ্যশস্য ভারবাহী পশুর মাধ্যমে দিল্লীতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। চতুর্থতঃ খরা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে ঘাটতি পূরণের জন্য দিল্লী ও শহরের উপকণ্ঠে কয়েকটি গুদামঘর গড়ে তোলা হয়। খাদ্য সংকটের সময় পাইকারী বণিকগণকে গুদামঘর থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত জনগণের মধ্যে বিক্রয়ের নির্দেশ দিওয়া হয়। পঞ্চমতঃ যদি কোন ব্যবসায়ী বেশি দাম নিত বা ওজনে কম দিত, তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হত। এছাড়া কোন পরিবার আট মনের বেশি খাদ্য কিনতে পারত না অর্থাৎ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ল্যাইসেন্স বা সরকারী অনুমতি-পত্র ব্যতিরেকে কোন বণিক কৃষকদের কাছ থেকে সরকারী খাদ্যশস্য ক্রয় করতে পারত না। সকল বণিককে সরকারী দপ্তরে নাম নথিভুক্ত করতে হত। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজনে দেওয়ান-ই-রিয়াসত ও সাদান-ই-মণ্ডী নামে দু'জন কর্মচারী নিযুক্ত হন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণের কোন উপকার করতে পারেনি। লাভবান হয়েছিল সৈন্যবাহিনী। বণিক ও কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বণিকগণ ও কৃষককুল ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তবে চরম খরা ও দুর্ভিক্ষের সময়ও খাদ্য ঘাটতির কোন সম্ভাবনা ছিল না। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ধনীকে নির্ধন করে গরিবকে সুলতান সাহায্য করেছিলেন। দিল্লীর জনসাধারণ এই ব্যবস্থায় উপকৃত হয়।

সাম্রাজ্য বিস্তার

মহম্মদ ঘোরীর পর প্রথম যে দিল্লীর সুলতান সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি অনুসরণ করেন তিনি আলাউদ্দিন খালজী। নিজেকে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্দারের সঙ্গে তুলনা করে সমগ্র ভারতে দিল্লীর সার্বভৌম রাজকর্তৃত্ব স্থাপনে তিনি অগ্রসর হন। বিদ্রোহ দমনের পর ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে তিনি গুজরাটের রাজা কর্ণদেবের বিরুদ্ধে উলুগ খাঁ ও নসরৎ খাঁর নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। রাজা কর্ণদেব কন্যা দেবলা দেবীসহ দাক্ষিণাত্যের দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতানবাহিনী ক্যাম্বে বন্দর লুণ্ঠন করে। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎ খাঁর নেতৃত্বে সুলতান স্বয়ং চৌহানবংশীয় শাসক হামিরদেবের রাজ্য রণথম্ভোর আক্রমণ করেন। রণথম্ভোর দুর্গ অধিকৃত হয়। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন মেবার রাজ্য আক্রমণ করে চিতোর অবরোধ করেন। রানা রতন সিংহ আত্মসমর্পণ করলে আলাউদ্দিন চিতোরের শাসন দায়িত্ব পুত্র খিজির খাঁর হাতে অর্পণ করে রাজধানীতে ফিরে আসেন। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন-উল-মুল্‌ক্ মুলতানীর নেতৃত্বে মালবের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। মালবরাজ হরনন্দকে পরাজিত করে উজ্জয়িনী, চান্দেরী, মাণ্ডু দুর্গ অধিকার করেন। ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাড়ওয়ারের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। মাড়ওয়াররাজ শিওলদেবের সিওয়াল দুর্গ ব্যতীত রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লীর কর্তৃত্বে চলে যায়। জালোর রাজ্য সুলতানবাহিনী দখল করে।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম শতকের মধ্যে আলাউদ্দিন খালজী উত্তর-ভারত জয় সম্পূর্ণ করে দক্ষিণ-ভারত বিজয়ে মনোযোগী হন। তাঁর পূর্বে কোন সুলতান বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে অভিযান প্রেরণের কথা চিন্তাও করেননি। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে চারটি সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল—দেবগিরি রাজ্য, কাকতীয় রাজ্য ও হোয়সল রাজ্য

ও পাণ্ড্য রাজ্য। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কারা-মালিকপুরের শাসকরূপে দাক্ষিণাত্যের সম্পদশালী রাজ্য দেবগিরির বিরুদ্ধে আলাউদ্দিন আক্রমণ পরিচালনা করেন। দক্ষিণ-ভারতের সম্পদপ্রাচুর্যই আলাউদ্দিনকে উৎসাহিত করেছিল। অবশ্য সমগ্র ভারতে নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাও তাঁর লক্ষ্য ছিল।

১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি মালিক কাফুরকে দেবগিরি রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাজা রামচন্দ্র দেব বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুর কাকতীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাজা প্রতাপরুদ্র দেব প্রচুর ধনরত্নসহ আত্মসমর্পণ করেন। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুর পর পর দু'টি সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে হোয়সল রাজ্য অতর্কিতে আক্রমণ করেন। রাজা তৃতীয় বীর বল্লাল বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হন। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে অতঃপর মালিক কাফুর ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে লিপ্ত পাণ্ড্য রাজ্যের বিরুদ্ধে অতি সহজেই জয়লাভ করেন।

আলাউদ্দিন খালজী উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলোর ওপর দিল্লীর সরাসরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বিজিত অঞ্চলে দিল্লীর মনোনীত শাসনকর্তা নিয়োগ করে দিল্লীর আধিপত্য উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলির ওপর স্থাপন করেন। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক পৃথক ছিল। দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাগণ নিজ নিজ রাজ্যে শাসকরূপে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। দিল্লীকে বাৎসরিক কর তাঁদের দিতে হত। অর্থাৎ দক্ষিণ ছিল করদ-রাজ্য।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থাও আলাউদ্দিনের শাসনকালে এক মহান কীর্তি। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ-ছয় বার মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করেছিল। আলাউদ্দিন মোঙ্গল আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খালজী ছিলেন মধ্যযুগের স্বৈরাচারী নরপতিত্বের মূর্ত প্রতীক। তিনিই প্রথম মুসলমান শাসক যিনি সমগ্র ভারতকে এক রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। খান, আমীর, মালিকদের ক্ষমতা খর্ব করে রাজশক্তিকে সবল করে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনিই সর্বপ্রথম শাসক যিনি রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করে এক নিরপেক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। সুলতান মৃত্যুর পূর্বে মালিক কাফুরের প্ররোচনায় জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খাঁকে বঞ্চিত করে নাবালক পুত্র সিহালউদ্দিন ওমরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

আলাউদ্দিনের কৃতিত্ব

মহম্মদ বিন্ তুঘলক
(Mahammad Bin Tughlug)
সপ্তম অধ্যায়

[সুলতান আলাউদ্দিন খালজীর মৃত্যুর পর (১৩১৪ খ্রীঃ) তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সিহাবউদ্দিন ওমরকে সিংহাসনে বসিয়ে অভিভাবক মালিক কাফুর প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কাফুর সিহাবউদ্দিনের মাতাকে বিবাহ করেন। খিজির খান ও সাদি খানকে অন্ধ করে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু আলাউদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মোবারক খালজীকে অন্ধ করতে গিয়েই নিজের বিপদ ডেকে আনেন। কাফুর নিহত হন। মোবারক শাহ খালজী নামে মোবারক কুতুবউদ্দিন সিংহাসনে বসেন। তিনিও মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করবার পর স্বীয় উজীর খুসরত-এর হাতে নিহত হন। খুসরত নাসিরুউদ্দিন খুসরত শাহ নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক তুঘলক-এর কাছে পরাজিত ও নিহত হন। গাজী মালিক তুঘলক সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক শাহ্ গাজী নাম গ্রহণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করলে দিল্লীতে তুঘলক শাসনের সূচনা হয়। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের আকস্মিক ও অপঘাত মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র জোনা খান মহম্মদ বিন্ তুঘলক নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।]

মহম্মদ বিন্ তুঘলক

সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলকের শাসন কাল সে যুগের একটি অত্যন্ত উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। ধর্মশাস্ত্র, গ্রীক, দর্শন, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তাঁর হাতের লেখা ছিল খুবই সুন্দর। তিনি খুব ভাল বক্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্লেষণধর্মী ও খোলা মনের মানুষ। অতীন্দ্রিয়বাদী মুসলমানদের সঙ্গে যেমন তিনি আলোচনা করতেন, তেমনই হিন্দু যোগী ও জৈন সন্ন্যাসীর সঙ্গেও তিনি দরবারে আলোচনা করতেন। তিনি ছিলেন একজন যুক্তিবাদী শাসক। মুসলমান উলামা সম্প্রদায়, অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রে ধর্ম, বিচার ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী তারা সুলতানকে 'কাফের'

বলে অভিহিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সুলতান মহম্মদের শাসনকাল ছিল একদিকে সুলতানের যুক্তিবাদী মন ও অপরদিকে উলামা সম্প্রদায়ের ধর্মীর গোঁড়ামির দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রের উচ্চপদে অর্থাৎ আমলা পদে তিনি গুণানুসারে নিয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন। কার কোন্ পরিবারে জন্ম সেটা সুলতানের কাছে বড় কথা ছিল না। প্রকৃত-পক্ষে বংশানুক্রমিক আমলারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছিল। ধর্মান্তরিত মুসলমান, বর্ণ হিন্দুও আমলাপদে নিযুক্ত হয়েছিল। ফলে একদিকে উলামাদের বিরোধিতা ও অপরদিকে বংশানুক্রমিক আমলারা তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিল।

তৃতীয়তঃ সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে নিজেকে ভগবানের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। নিজের মুদ্রায় "আল সুলতান দিল্লী আল্লাহ"—দিল্লীর সুলতান আল্লার ছায়া কথাটি খোদাই করান।

চতুর্থতঃ যুক্তিবাদী শাসক সুলতান মহম্মদ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মসহিষ্ণু নীতি অনুসরণ করেন। বহু হিন্দু যেমন যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারী দপ্তরে নিযুক্ত হয় তেমনই যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরও তিনি পুনর্নিমাণ করে দেন।

দেবগিরিতে তথাকথিত রাজধানী স্থানান্তর

মহম্মদ বিন্ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণের অল্পদিনের মধ্যেই সর্বাধিক বিতর্কিত যে-কর্মসূচী গ্রহণ করেন তা হল, দিল্লী থেকে দেবগিরিতে তথাকথিত রাজধানী স্থানান্তর। দেবগিরি ছিল দাক্ষিণাত্যে মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারের বনিয়াদ। যুবরাজরূপে মহম্মদ বিন্ তুঘলককে এখানে কিছুদিন বাস করতে হয়। সুলতান মুবাবক শাহ্ খালজীর শাসনকাল থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যকে দিল্লীর সরাসরি শাসনের অধীনে আনবার প্রচেষ্টা নানাবিধ জটিল রাজনৈতিক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছিল। দাক্ষিণাত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসাধারণ বিদেশী শাসন গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল। এমনকি অনেক মুসলমান শাসনকর্তাও সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। মহম্মদ বিন্ তুঘলকের শাসনকালে এ জাতীয় বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নিকট-আত্মীয় মাবারের শাসক বাহাউদ্দিন গুরসাম্প— যার বিরুদ্ধে সুলতান স্বয়ং মাবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। দক্ষিণ-ভারতে দিল্লী থেকে সরাসরি শাসনের অসুবিধা ছিল। সুলতান মহম্মদ একদিকে দেবগিরিতে দাক্ষিণাত্যের শাসনতান্ত্রিক রাজধানী ও অপরদিকে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার-কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই বহু উচ্চপদস্থ আমলা ও ধর্মপ্রচারক অর্থাৎ উলামাকে দেবগিরিতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দিল্লীর সকল মানুষকে দেবগিরি, যার নতুন নামকরণ হল দৌলতাবাদ, যেতে বলেন নি। দিল্লী তখনও একটি জনবহুল শহর ছিল—মুদ্রা তৈরি হত। বিদেশী পর্যটক ইবন বতুতা পাঁচ বছর পর দিল্লী এসে শহরকে জনবসতিপূর্ণ দেখেছিলেন। যদিও সুলতানের দেবগিরিতে দ্বিতীয় রাজধানী শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারেনি, তবু নতুন রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে এক সমতা গড়ে উঠতে সাহায্য করল।

দক্ষিণ-ভারতে গড়ে উঠল বহু নতুন ঐস্লামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র—ফলে উত্তর-দক্ষিণের ন্যায় শুধুমাত্র দক্ষিণেই পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পথ সুগম হল।

মুদ্রা নীতির সংস্কার ও প্রতীক তাম্রমুদ্রার প্রবর্তন সুলতান মহম্মদের শাসনকালের অপর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চতুর্দশ শতকে বিশ্বের বাজারে রৌপ্যের যোগানে বিশেষ ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া চীনদেশের শাসক কুবলাই খান ও পারস্যের মোঙ্গল শাসক গাইখাতু সাফল্যের সঙ্গে প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তন করেন। কিন্তু বণিকগণ ও সাধারণ মানুষ ঐ প্রতীক মুদ্রা গ্রহণে সম্মত হল না। এছাড়া ঘরে ঘরে নকল মুদ্রা তৈরি হল। ফলে সুলতান জনসাধারণের তাম্রমুদ্রা নিয়ে সমমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। অর্থাৎ পর পর সুলতানের দুটো পরিকল্পনাই ব্যর্থ হল। ফলে একদিকে সুলতানের মর্যাদা আঘাত পেল অপরদিকে সরকারি কোষাগারের অপচয় ঘটল।

প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তন

তৃতীয়তঃ রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে দোয়াব অঞ্চলে সুলতান করের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। দোয়াব অঞ্চলে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীগণ বলপূর্বক বর্ধিত কর আদায় করবার চেষ্টা করলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহ দমনে সেনাদল পাঠান হয়। সুলতান দুর্ভিক্ষ ও প্রজাদের অবস্থার কথা জানতে পেরে প্রচুর ঋণদান ও কর ছাড়ের ব্যবস্থা করেন। যাই হোক, দোয়াব অঞ্চলে বহুলোক মারা যায়। অর্থের অপচয় হয়। কর আদায় হয় না। সুলতানের জনপ্রিয়তাও বিনষ্ট হয়। অতঃপর সুলতান দওয়ান-ই-আমীর-ই-কোহী নামে একটি নতুন বিভাগের হাতে অনাবাদী জমি চাষ করবার দায়িত্ব দেন। কিন্তু কর্মচারীদের অনভিজ্ঞতা ও অযোগ্যতার ফলে ঐ পরিকল্পনাও সফল হতে পারেনি।

দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধি

সুলতান মহম্মদের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ পাঞ্জাব ও দিল্লী পর্যন্ত অভিযান করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। সুলতান পেশোওয়ার পর্যন্ত তার রাজ্যসীমা বাড়াতে সমর্থ হন। তিনি খোরাসান ও কারাচিল অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি।

সুলতান মহম্মদ বহু বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্রোহের হোতা ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ। বিদ্রোহগুলি সুলতান সাফল্যের সঙ্গে দমন করেন। সিন্ধুদেশে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ সুলতান মারা যান।

সুলতানী শাসনের পতনের জন্যে অনেকেই সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলককে দায়ী করেছেন। কিন্তু এর জন্যে একজন কোন শাসককে দায়ী করা চলে না। তৎকালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যেই ছিল পতনের বীজ। ব্যক্তিগতভাবে সুলতান মহম্মদ তৎকালীন ভেঙে-পড়া অবস্থা কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করেন, তবে ব্যর্থ হন। খান, আমীর, মালিক উপাধিধারী ব্যক্তিগণ ও উলামাদের জন্যেই সুলতানের ঐ ব্যর্থতা।

সুলতান ফিরোজ শাহ্ :

ফিরোজ শাহ ছিলেন সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলকের খুড়তুতো ভাই। তাঁর

পিতা ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের ছোট ভাই নাসিরুদ্দিন রাজব ও মা ছিলেন দিপালপুরের অধীন আবোহরের জাঠ সর্দার রানমল ভাট্টির কন্যা। মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাথির নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ও তথাকার মোঙ্গল সেনাপতি নৌরজ কারগুন আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলে সুলতানী সেনাশিবিরে উপস্থিত আমীর, মালিক ও উলামাগণ ফিরোজ শাহকে শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। প্রাথমিক অনিচ্ছার পর ফিরোজ শাহ আমীর-মালিক-উলামাদের চাপে সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হন। ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ বাট্টার নিকটবর্তী সোণ্ডাতে আবুল মুজফ্‌ফর ফিরোজের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

সুলতান ফিরোজ শাহের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, ধ্যানধারণায় চরিত্রগত ও গুণগত পরিবর্তন আনে। প্রথমতঃ সুলতান আলাউদ্দিন খালজী ও সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক নিজেদের মর্যাদা ও রাজ-ক্ষমতাকে সার্বভৌম শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সুলতান ফিরোজশাহ নিজেকে খলিফার সেবকরূপে মনে করতেন। ঐস্লামিক আইন অর্থাৎ শরিয়তী নিয়ম অনুসারে তিনি নিজেকে খলিফার অছি বা ট্রাস্টি (Trustee) রূপে গণ্য করতেন।

ফিরোজ শাহের রাজত্বের প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়তঃ শাসনকার্যে উলামাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে রাজকার্যে ঐস্লামিক ধর্মীয় আইন সর্বেসর্বারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ফিরোজ শাহের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্ম ও রাষ্ট্র একাত্ম হয়ে যায়। রাষ্ট্র ধর্মাশ্রিত (theocratic) রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

তৃতীয়তঃ সুলতান আলাউদ্দিন খালজী ও মহম্মদ বিন্ তুঘলকের শাসনকালে সরকার যে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রচলন করেছিলেন তার অবসান হয়। তিনি হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করবার প্রয়োজনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেন। সরকারী প্রশাসন যন্ত্র বাস্তবক্ষেত্রে ধর্মান্তরিত করণের যন্ত্রে পরিণত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া কর ধার্য করেন। শিয়া, ইসমাইল সম্প্রদায়ের মুসলমানগণও তার নির্দেশে অত্যাচারিত হন।

চতুর্থতঃ রাজস্ব বিভাগেও ঐস্লামিক বা শরিয়তী আইন প্রয়োগ করা হয়। ঐস্লামিক আইন অনুযায়ী বে-আইনী চব্বিশ রকমের কর তিনি বাতিল করে কোরান নির্দেশিত চার প্রকার কর যথাঃ—খারাজ, খাম্‌ক, জাকাত ও জিজিয়া ধার্য করেন। পরে উলামাদের সম্মতি নিয়ে সেচকর ধার্য করেছিলেন।

পঞ্চমতঃ আলাউদ্দিন খালজী ও মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে ক্ষমতাহীন খান্, আমীর ও মালিকগণ ফিরোজ শাহের আমলে পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ইক্‌তা বা জায়গির ব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক প্রথার প্রবর্তন এই শক্তি বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। খান্, আমীর ও মালিকগণ নিজ নিজ ইক্‌তায় প্রায় স্বাধীন শাসকের মতো আচরণ শুরু করেন। ফলে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে যায়।

সুলতান ফিরোজ শাহের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী
(Beneficient measures of Feroz Shah)ঃ

কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য ফিরোজ শাহ বিশেষ করে মনোযোগ দেন। সুলতানের

শাসনকালে পঞ্চাশ থেকে ষাট ক্রোশ দীর্ঘ বড় বড় সেচ খাল খনন, নাসিরওহা, কুতুবওহা, খিজরওহা নামে খালগুলি পুনর্নির্মাণ করা হয়। হিসার ফিরোজা নামক শহরে জল সরবরাহের প্রয়োজনে যমুনা নদী থেকে রাজীওহা ও শতদ্রু নদী থেকে উলগ্‌খানী নামে দুটি খাল খনন করা হয়। ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান যখন দীপালপুর শহরে যান তখন শতদ্রু থেকে ঝাজহার পর্যন্ত একটি (১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) মান্দাভি ও শিরসুর পাহাড় থেকে খাল কেটে হান্‌সি পর্যন্ত ও সেখান থেকে আরমান পর্যন্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। তৃতীয় খালটি ঘগ্‌গর থেকে সরসুতি দুর্গ ও হার্নিখেরা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। চতুর্থটি বুধি থেকে যমুনা হয়ে ফিরোজাবাদ পর্যন্ত যায়। পঞ্চ টি সরসুতি ও শালিমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এগুলি সরহিন্দ, মনসুরপুর ও সুনামে জলের অভাব মেটায়। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কৃষিকার্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তাছাড়া ১৫০টি কূপও খনন করা হয়েছিল।

ফলের বাগান করবার ব্যাপারেও সুলতান ফিরোজ শাহের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি ১২০০ ফলের বাগান পত্তন করেন। সুলতান আলাউদ্দিন কর্তৃক স্থাপিত ৩০টি ফলের বাগানেরও সংস্কার সাধন করেন ফিরোজ শাহ। এই সকল বাগানে সাদা ও কালো আঙুরের চাষ হত। ফলে আঙুর খুবই সস্তা হয়।

সরকারী কারখানা স্থাপনে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন সুলতান ফিরোজ শাহ। তিনি ছত্রিশটি কারখানা চালাতেন ও সেখানে রসদ কাঁচামাল সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন। রাজকারী কারখানাগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যথা—রতিবি ও ঘায়ের রতিবি। যে-সকল কারখানাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সরকারী বার্ষিক অনুদান (grant) দেওয়া হত সেগুলো ছিল রতিবি। যথা—পিলখানা, পায়গাহ, শরাবখানা ইত্যাদি। জামদারখানা, আলমখানা, ফরাসখানা ইত্যাদিকে ঘায়ের রতিবি বলা হত। প্রতি কারখানার দেখাশুনার দায়িত্ব থাকত একজন খান্ বা মালিকের হাতে। সকল কারখানার কাজ পরিদর্শন করতেন মুতামারিফ। খাজা আবদুল হাসান ছিলেন সুলতান ফিরোজের মুতামারিফ। সকল কারখানার হিসাবপত্র রক্ষা করবার জন্য দেওয়ান-ই-মজমুয়া নামে একটি বিভাগ ছিল। বেকার যুবক ও নতুন দাসদের কারখানায় কাজ দেওয়া হত।

বেকারসমস্যা নিরসনেও সুলতান বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। কর্মনিয়োগ দপ্তর নামে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয়। দিল্লীর কোতোয়ালগণকে তিনি রাজধানীর মুসলমান বেকারদের একটি তালিকা তৈরি করতে বলেন। এবং সুলতানের দরবারে তালিকা পৌঁছলে প্রতি বেকারকে কাজ দেওয়া হত।

দরিদ্র মুসলমান কন্যাদের বিবাহের জন্যে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করবার প্রয়োজনে দেওয়ান-ই-খয়রাত নামে একটি বিভাগ খোলা হয়। পঞ্চাশ, ত্রিশ ও পঁচিশ টাকা করে প্রতি বিবাহের জন্যে দেওয়া হত। হাজার হাজার বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বিবাহ সুলতানের এই জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের জন্য সম্ভব হয়।

দার-উল-সাফা নামে এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যোগ্য সুলতান চিকিৎসক, ঔষধ, পথ্য প্রভৃতি সরকারী ব্যবস্থায় সরবরাহের ব্যবস্থা হত। দরিদ্র ও অসহায় মানুষ এ-প্রকল্পে সাহায্য পেতেন।

এছাড়াও দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিধবা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণকে এক বিরাট পরিমাণ ভাতা

সরকারী অনুদানরূপে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। প্রকৃতপক্ষে ৪২০০ অভাবগ্রস্ত মুসলমান ঐ অনুদান পেতেন। অর্থের পরিমাণ ছিল একশত লক্ষ 'টংকা'।

শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনে সুলতান ফিরোজ শাহ মাদ্রাসা স্থাপন করেন। বিচারব্যবস্থায় মুণ্ডচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ, হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট করা প্রভৃতি বিভিন্ন নির্যাতনমূলক শাস্তিদান প্রথা সুলতান প্রত্যাহার করে নেন।

সুলতানের সমস্ত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী ছিল একমুখী। হিন্দু, শিয়া বা ইসমাইল-মুসলমান সম্প্রদায় সুলতানের ধর্মনীতির শিকার ছিলেন। ফলে কল্যাণমুখী কর্মসূচীতে হিন্দু শিয়া, প্রভৃতি সম্প্রদায় ছিলেন অপাংক্তেয়।

১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজের মৃত্যু হয়। তিনি প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণ

(Invasion by Timur)

অষ্টম অধ্যায়

[সুলতান ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর ফিরোজশাহী দাসগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা হস্তগত করে সুলতানকে হাতের ক্রীড়নক করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত হয়। শূন্য-সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতানের পৌত্র গিয়াসউদ্দিন দ্বিতীয় তুঘলক আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে নিহত হন ও আবুবকর সিংহাসনে বসেন। আবুবকরও কয়েক মাসের ভিতর সিংহাসনচ্যুত হলে সুলতান ফিরোজ শাহের অপর পুত্র মহম্মদ শাহ ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। প্রকৃতপক্ষে ১৩৮৮ থেকে ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল দিল্লীর ইতিহাস পরিচালিত হয়েছে ফিরোজ শাহের উচ্চাকাঙ্ক্ষী দাসদের দ্বারা। মহম্মদ শাহ সিংহাসনে বসে ক্ষমতালোভী দাস শক্তির ক্ষমতা হ্রাস করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গুজরাটের প্রাদেশিক শাসনকর্তাসহ বহু প্রাদেশিক শাসকগণ স্ব স্ব স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারগণও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হয় ও যুবরাজ হুমায়ুন খাঁ আলাউদ্দীন শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনিও মাত্র এক মাস পনের দিন শাসন করবার পর মারা যান। ফিরোজ শাহ দাস-শক্তি ও আফগান লোদীদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। প্রায় দু' সপ্তাহ দিল্লীতে কোন সুলতানই ছিলেন না। এমতাবস্থায় ফিরোজ শাহী দাসদের নেতা মালিক সারওয়ারের প্রচেষ্টায় দ্বন্দ্বে-লিপ্ত দুর্বল আমীরদের মধ্যে একটা সাময়িক মিটমাট হয় এবং সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ফিরোজ শাহের অপর এক পৌত্র নাসিরুদ্দিন নসরত শাহ ফিরোজাবাদে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন। এদিকে মালিক সারওয়ার নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করে বিহার, জৌনপুর, কনৌজ, অযোধ্যাতে শর্কী শাসক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিদিন দিল্লী ও ফিরোজাবাদে সংঘর্ষ চলতে থাকে। এদিকে দীপালপুরের শাসনকর্তা সারঙ্গ খান লোদী মুলতানের সৈয়দ বংশীয় শাসক খিজির খাঁকে বিতাড়ন করেন। ১৩৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের খোকর

সম্প্রদায়ের নেতা শেখ খোকর স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সারঙ্গ খান লোদী শেখ খোকরের ওপর অত্যাচার শুরু করেন। ফলে সুলতানী সাম্রাজ্য যখন চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয় তখন তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন।]

সমরখন্দের অধিপতি আমীর তাঁঘির পুত্র চিঙ্গিজ খাঁর পঞ্চম স্থানীয় বংশধর তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর সিন্ধুনদ অতিক্রম করে মুলতানের প্রাচীন শহর তালাম্বায় প্রবেশ করলে তাঁর বিখ্যাত ভারত অভিযানের সূচনা হয়।

পিতার মৃত্যুর পর স্বীয় পৈতৃক রাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে তৈমুর একে একে তুর্কীস্তানের কতক অঞ্চল, আফগানিস্তান, পারস্য, সিরিয়া, বাগদাদ প্রভৃতি জয় করে নিজেকে সমরকুশলী নেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। দিল্লীর সুলতানী শাসনের পতনোন্মুখ অবস্থা, খিজির খাঁর ও শেখ খোকরের সাহায্য প্রার্থনা ও ভারতের প্রাচুর্য তাঁকে ভারত-অভিযানে উৎসাহিত করেছিল। পৌত্তলিকতার বিনাশসাধন এবং ধনরত্ন লুন্ঠন ও অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

তৈমুরলঙ্গ মুলতানে পৌছলে জাহাঙ্গীর পীর মহম্মদ নিজের সৈন্য-সামন্তসহ প্রভুর সঙ্গে যোগদান করেন। তালাম্বা থেকে অযোধ্যা হয়ে তিনি ভাতনীর পৌছলে সেখানকার হিন্দু অধিপতি রাওদুলা ছাই-এর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। ভাতনীর থেকে সরসুতির পথে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। সরসুতি থেকে সামাল ও কৈথাল হয়ে তিনি দিল্লী যাত্রা করলে পথে ফতাহাবাদ, রাজবহর, আহরুনী, তোহালা, খাগর উপত্যকা ও কোঠিলা আক্রমণ করতে হয়। তোহালায় মুসলমান জাতিদের মোকাবিলা করে তিনি প্রায় দু'হাজার জাঠ মুসলমানকে হত্যা করেন। কৈথাল, সামাল, আসপন্দী ও তুঘলকপুর হয়ে তিনি পানিপথ পৌছান। পানিপথে ও পরে কান্হি-গাজীনে শিবির স্থাপন করে দিল্লীতে লড়াই-এর প্রস্তুতি করেন। কালহি-গাজীন থেকে ফিরোজবাদের প্রাসাদে তিনি অভিযান চালিয়ে প্রাসাদটি দখল করেন। অতঃপর যমুনা নদী অতিক্রম করে দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে লনি নামক শহরের বিপরীত দিকে তৈমুর শিবির স্থাপন করেন। এখানে তিনি হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান বন্দীকে হত্যা করেন। অতঃপর তৈমুর দিল্লী প্রবেশ করলে সুলতান নাসিরউদ্দীন শাহ ও সেনাপতি ইকবাল খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুলতানী বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলে সুলতান গুজরাটে ও সেনাপতি বারানে পলায়ন করেন। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তৈমুরলঙ্গ দিল্লী দখল করেন। তৈমুরের সৈন্যরা বাজারে গেলে সামান্য বচসা থেকে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান নিহত হন। তৈমুর ব্যাপক লুন্ঠন ও গণহত্যার আদেশ দেন। দিল্লী, পুরনো দিল্লী, সিরি প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকদিন গণহত্যা ও লুন্ঠন চলে। দিল্লী প্রকৃতপক্ষে শ্মশানে পরিণত হয়। পরিশেষে প্রায় পনের দিন পর প্রচুর ধনরত্নসহ তৈমুর স্বদেশের পথে যাত্রা করেন। ফেরার পথে মেওয়াই, মৃদুলা, নাহির, মিরাট, তুঘলকপুর, হরিদ্বার, শিবলিক পাহাড়, নাগাড়কোট, জম্মু হয়ে সমরখন্দের পথে যাত্রা করেন। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করে ফিরে যান। ফিরে যাওয়ার আগে তৈমুর সৈয়দ খিজির খাঁর উপর লাহোর, মুলতান ও দীপালপুরের দায়িত্ব দিয়ে যান। তৈমুরের ভারত-অভিযানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—এদেশের হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে

বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করবার চেষ্টা করেছে এবং বহুলাংশে সাফল্যও লাভ করেছে। তৈমুর শেষ পর্যন্ত ভারত দখল না করে এদেশ ত্যাগ করেছেন। তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের ফলে সুলতানী-সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। রাজধানী দিল্লী শ্মশানে পরিণত হয়। প্রদেশগুলি একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সর্বত্র এক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে পড়ে।

তৈমুরের ভারতত্যাগের পর নসরৎ শাহ দিল্লীর সিংহাসন পুনরায় দখল করেন। কিন্তু শীঘ্রই দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহর মন্ত্রী মল্লু-ইকবাল খাঁন্ নসরৎ শাহ্‌কে রাজধানী থেকে বিতাড়িত করে নিজে দিল্লীসহ দোয়াব অঞ্চলের কতকাংশে স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে মুজফ্‌ফর খান, গুজরাটের দিলওয়ার খান মালবে খাজা জাহান্, কনৌজ, অযোধ্যা কারা ও জৌনপুরে গালিব খান; সামলায়, লাহোর দীপালপুর ও মুলতানে সৈয়দ খিজির খান, সামস্ খান বেয়ানায় এবং মাহমুদ খান কাল্পি ও মাহোবায় নিজেদের সুলতান বলে ঘোষণা করেন। মল্লু-ইক্‌বাল খান মালব অঞ্চল থেকে নাসিরুদ্দিন মামুদকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করে সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত করেন। কিন্তু সুলতান নাসিরুদ্দিন দিল্লীর হালচালে বিরক্ত হয়ে কনৌজ চলে যান। এবং ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে খিজির খান মল্লু-ইকবাল খানকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এর পর নাসিরুদ্দিন মামুদ পুনরায় দিল্লী ফিরে আসেন ও ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা (The foundation of Sayyid Dynasty)

সুলতান নাসিরুদ্দিন মারা গেলে দিল্লীর সামরিক বাহিনীর প্রধানগণ মামুদ খান লোদীর পুত্র আজিক-ই-মুসালিক দৌলত খাঁ লোদীকে নিজেদের প্রধানরূপে নির্বাচিত করে শাসনকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তৈমুর-নিযুক্ত শাসনকর্তা সৈয়দ খিজির খাঁ দিল্লী আক্রমণ করে দৌলত খাঁ লোদীকে পরাজিত ও হিসাব-ফিরোজা দুর্গে বন্দী করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। খিজির খাঁ দিল্লীর সিংহাসন দখল করে নতুন এক শাসক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসে তা সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত।

তৈমুরলঙের ভারত সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি খিজির খাঁ দিল্লীতে সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন নি। তৈমুর-পুত্র শাহরুখর প্রতিনিধিরূপে দেশ শাসন করতেন। খিজির খাঁর রাজ্যসীমা দিল্লী, দোয়াব, লাহোর, মুলতান ও দীপালপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের বংশধর বলে নিজেকে দাবি করতেন বলেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশকে 'সৈয়দ বংশ' বলা হয়।

খিজির খাঁর মৃত্যুর পর পুত্র মোবারক 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পাঞ্জাবের খোক্‌র সম্প্রদায় ও দোয়াবের হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। আমীরদের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি নিহত হন।

পরবর্তী শাসক ছিলেন মহম্মদ শাহ্। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল আমীরদের নেতা সারওয়ার-উল-মুলক্-এর হাতে। মহম্মদ শাহ্-এর শাসনকালে দিল্লীতে আমীরদের মধ্যে

ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। ইতিমধ্যে মালবের শাসনকর্তা মামুদ খালজী দিল্লী আক্রমণ করেন। মুলতানের শাসনকর্তা বাহ্‌লুল লোদী সুলতানের সাহায্যে এগিয়ে এলে মামুদ খালজী নিজ প্রদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাহ্‌লুল নিজে দিল্লী দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হয়।

আলাউদ্দিন আমল শাহ

সুলতানের মৃত্যুর পর পুত্র আলাউদ্দিন আলম্ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তাঁর অযোগ্য শাসনের ফলে মন্ত্রী হামিদ্ খাঁ সকল ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। এমতাবস্থায় আলাউদ্দিন বাদায়ুনে চলে যান। ইতিমধ্যে দিল্লীর নিকটবর্তী প্রদেশিক শাসকদের হুমকিতে হামিদ খাঁ বাহলুল লোদীর সাহায্য প্রার্থী হন। বাহ্‌লুল লোদী সুযোগ বুঝে দিল্লী এসে প্রথমেই হামিদ খাঁকে বন্দী করে হত্যা করেন। বাদায়ুনে ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন আলম শাহের মৃত্যু হয়। এদিকে বাহ্‌লুল লোদী দিল্লী দখল করে ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সৈয়দ বংশের পতন হয়।

বাহ্‌লুল লোদী

লোদী বংশ—১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাহ্‌লুল লোদী কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হলে লোদী-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। লোদীগণ ছিলেন জাতিতে আফগান। মোট পঁচাত্তর বছর কাল লোদী বংশের শাসকগণ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। লোদী শাসনের মূল সমস্যা ছিল, একদিকে দিল্লীর শাসকগণের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করবার প্রচেষ্টা অপরদিকে আফ্‌গান সর্দারদের স্বাধীনতাস্পৃহা। এছাড়া তুঘলক বংশের সুলতান ফিরোজ শাহের শাসনকাল থেকে বংশানুক্রমিক জায়গীর-প্রাপ্ত প্রাদেশিক শাসকদের স্বাধীনতা ঘোষণা ও ক্ষমতাভোগও লোদী শাসনের সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

বাহ্‌লুল লোদী শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজ শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনে আফ্‌গান সর্দারদের মধ্যে জায়গীর বিতরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ জৌনপুরের শাসক মামুদ শাহের দিল্লী আক্রমণের মোকাবিলা বাহ্‌লুলকে করতে হয়। মামুদ শাহ্ পরাজিত হন। জৌনপুরে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বরবক শাহ্‌কে শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করেন। গোয়ালিয়র জয় করেন। অবশ্য গোয়ালিয়র জয় করে ফিরবার সময় ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

মহম্মদ শাহ

বাহ্‌লুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র নিজাম খাঁ 'সিকান্দার লোদী' উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিকান্দার লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেই স্বীয় ভ্রাতা জৌনপুরের শাসনকর্তা অবাধ্য ও অত্যাচারী বরবক শাহ্‌কে যুদ্ধে পরাস্ত করে বন্দী করেন। জৌনপুরের আমীরগণ পূর্ববর্তী শাসক হুশেন সার্কির সমর্থনে বিদ্রোহ করে। কিন্তু হুশেন সার্কিও সিকান্দারের কাছে পরাজিত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর সিকান্দার লোদী ত্রিহুত ও বিহার জয় করে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। সুলতান বাংলাদেশের তৎকালীন শাসনকর্তা আলাউদ্দিন হুশেন শাহের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে দিল্লী ফিরে যান।

সিকান্দার লোদী

উচ্চাকাঙ্খী আফ্‌গান সর্দারদের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনে সিকান্দার প্রাথমিক ব্যবস্থা

অবলম্বন করেন। (১) গুপ্তচর ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। (২) আফ্‌গান সর্দারদের নিয়মিত হিসাব রক্ষণ ও বন্টনের ব্যবস্থা করেন। (৩) দরবারে বিভিন্ন আদব-কায়দা চালু করেন। এছাড়া ব্যবসায় ও আভ্যন্তরীণ শুল্ক তুলে দিয়ে জনসাধারণের উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। গরীবদের মধ্যে তিনি বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

সিকান্দার লোদী একজন সাহিত্যানুরাগী শাসক ছিলেন। এমনকি সংস্কৃত গ্রন্থও তাঁর আদেশে পারসিক ভাষায় অনূদিত হয়। তিনি নিজে একজন কবি ছিলেন। আগ্রা শহর তাঁরই আমলে নির্মিত। তিনি লোদী বংশের যোগ্যতম শাসক ছিলেন। তাঁর "রাজত্বকাল ছিল গৌরবে পরিপূর্ণ।"

সিকান্দারের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিম লোদী ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি দূরদর্শী শাসক ছিলেন না। ফলে আফ্‌গান সর্দারদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ শুরু হয়। সুলতানের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আফ্‌গান সর্দারগণ ইব্রাহিম লোদীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালালকে জৌনপুরের স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা করে। জালাল পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু উক্ত বিবাদ চরম হয়ে ওঠায় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ও সুলতানের নিকট আত্মীয় আমল খাঁ যুগ্মভাবে কাবুলের অধিপতি জাহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবরের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হন।

ইব্রাহিম লোদী

গোয়ালিয়র দুর্গের অধিপতি বিক্রমজিতের আত্মসমর্পণের পর রাজপুতদের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর বিরোধের সূচনা হয়। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে খাটাউলের যুদ্ধে ও ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢোলপুরের যুদ্ধে মেবারের রানা সঙ্গ জয়লাভ করেন। দিল্লী সুলতানী রাজ্যের কতকাংশ দখল করে রানা সঙ্গ কাবুল অধিপতি বাবরের সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠান।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ

১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে বাবর পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে মোগল শাসনের সূচনা করেন। সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন হয়।

আঞ্চলিক শক্তির উত্থান
(Rise of regional power)

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইলিয়াস শাহী শাসনে বাংলাদেশ (Bengal under Ilias Shai rules):

বাংলাদেশে বক্তিয়ার খালজী কর্তৃক স্বাধীন মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দিল্লীর সুলতানগণ বার বার বাংলার স্বাধীনতা খর্ব করবার চেষ্টা করেছেন। একই নীতির অনুসরণে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক বাংলাদেশকে তিনভাগে (যথা—লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও ও সোনার গাঁও) ভাগ করে স্বীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। দিল্লী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদেশিক শাসনকর্তা ও উলামাদের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে জনৈক আলি মোবারক আলাউদ্দিন আলি শাহ্ উপাধি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস নামে তাঁর এক পালিত ভাই আলি মোবারকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন অধিকার করেন। ইলিয়াস সামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ নাম নিয়ে লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করবার সময় থেকেই বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সূচনা হয়। সমসাময়িক ইতিহাস লেখকগণ ইলিয়াসকে শাহ্-ই-বাঙ্গালা, শাহ্-ই-বাঙ্গালিয়ান, সুলতান-ই-বাঙ্গালা, ভাঙ্গরা ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

ইলিয়াস শাহ্ ত্রিহুত, নেপাল, উড়িষ্যা, কামরূপে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ ইলিয়াস শাহের সাম্রাজ্য বিস্তারে ঈর্ষান্বিত হয়ে ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ অভিযান করেন। কিন্তু দিল্লীর সুলতান একডালা-দুর্গ দীর্ঘ অবরোধের পর দখল করতে ব্যর্থ হয়ে রাজধানী ফিরে যান। বাংলা-দিল্লী শান্তি স্থাপিত হয়। শান্তি ও সদ্ভাব বজায় রাখিবার প্রয়োজনে উপঢৌকন বিনিময় হয়। বাংলার স্বাধীনতা বজায় থাকে। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হাজী ইলিয়াস সোনারগাঁও দখল করে বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হাজী ইলিয়াসের শেষ মুদ্রা প্রমাণ করে যে, ঐ সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

সিকান্দার শাহ

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর সিকান্দার শাহ্ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিকান্দার শাহ প্রায় ৩২ বছর দিল্লীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ হন।

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তাঁর ব্যর্থপ্রায় বাংলাদেশ অভিযানের কথা সম্ভবত ভুলতে পারেননি। ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় বাংলাদেশে অভিযান করেন। কিন্তু এবারও একডালা-দুর্গ দীর্ঘ অবরোধের পর দখল করা সম্ভব হল না। বাংলার স্বাধীনতা দিল্লী স্বীকার করেন। শান্তি স্থাপিত হল। দিল্লীর সুলতানী আমলে ঐ

অভিযানই বাংলাদেশে দিল্লীর শেষ অভিযান। আধুনিক মালদহের নিকটবর্তী পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ তাঁরই সৃষ্টি।

সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ বাংলাদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আজম শাহের আমলে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত কামতা রাজ্যে ব্যর্থ অভিযান। আজম শাহের রাজত্বকালে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জৌনপুরের সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন ও চীনদেশের সঙ্গে দূত বিনিময়।

আজম শাহ

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সৈয়ফউদ্দিন হামজা শাহ্ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। হামজা শাহের সঙ্গে আমীরদের বিরোধের ফলে রাজা গণেশ নামে জনৈক হিন্দু জমিদার সাময়িকভাবে বাংলার ক্ষমতা অধিকার করেন ও সাময়িকভাবে ইলিয়াস শাহী শাসনের অবসান ঘটে।

হামজা শাহ

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন নামে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সামস্উদ্দিন আহম্মদ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর কুশাসনে ক্ষুব্ধ হয়ে বাংলার আমীরগণ সাদি খাঁ ও নাসির খাঁর নেতৃত্বে সামস্উদ্দিনকে হত্যা করেন। অবশেষে সাদি খাঁ ও নাসির খাঁ পরস্পর দ্বন্দ্বে নিহত হয়। এমতাবস্থায় বাংলার আমীরগণ ইলিয়াস শাহের জনৈক বংশধর নাসিরুদ্দিন মামুদকে বাংলার সিংহাসনে ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃস্থাপন করেন। নাসিরুদ্দিন মামুদের শাসনকালে বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে পুনরায় মৈত্রী ও শান্তি স্থাপিত হয়। নাসিরুদ্দিন মামুদের মৃত্যুর পর রুকনউদ্দিন বরবক সিংহাসনে বসেন। বরবক শাহের শাসনকালে উড়িষ্যা ও কামরূপ অভিযান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বরবক শাহের মৃত্যুর পর সামস্উদ্দিন ইউসুফ ও জালালউদ্দিন ফৎ শাহ পর পর সিংহাসনে বসেন। ফৎ শাহ জনৈক হাবসী ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হ'লে ইলিয়াস শাহী বংশের অবসান হয়।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসকগণ

ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকগণ প্রথমতঃ বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে রাজ্যসীমা বিশেষভাবে সম্প্রসারিত করেন। দ্বিতীয়তঃ সুলতান ফিরোজ শাহ ও জৌনপুরের সুলতানদের আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করে বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করেন। তৃতীয়তঃ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে হিন্দু অধিপতি ও জমিদারদের মর্যাদার আসন দান করেন। ফলে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এক সুষ্ঠু ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে ওঠে। দেশে রাজনৈতিক সুস্থিতির জন্যে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। ইবন বতুতার ভ্রমণ কাহিনী, চীনদেশীয় দো-ভাষী মাহুয়ানের বিবরণী থেকে সে-সময়কার আর্থিক বিবরণী পাওয়া যায়। সামাজিক জীবনে হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতা নতুন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়

এক হিন্দু প্রভাবশালী শ্রেণীর উদ্ভব সমাজ-জীবনে আত্মপ্রকাশ করে। ইলিয়াস শাহী শাসনে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। সুলতানগণ সাহিত্য, শিল্পকলা স্থাপত্যের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করে বাঙালি মনীষার উন্মেষ ঘটাতে সহায়তা করেন। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনীর অনুবাদ এযুগের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃত্তিবাস রচিত 'রামায়ণ', মালাধর বসু লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের 'অমরকোষ-টীকা' ও 'পদচন্দ্রিকা' ইলিয়াসশাহী শাসনকালেই রচিত হয়। বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীকে নিয়ে পাঁচালী ছড়া এ যুগেরই রচনা। সুলতান বরবক শাহ্ মালাধর বসু ও তাঁর পুত্রকে যথাক্রমে 'গুণরাজ খাঁ' ও 'সত্যরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। মাদ্রাসা, খানকাহ্ ও সমাধিতে এ যুগের শিলালিপির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়ায় এখনও ইলিয়াস শাহী যুগের স্থাপত্যের বহু নিদর্শন, যথা—আদিনা মসজিদ আজও বর্তমান। হাজীপুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা হাজী ইলিয়াস।

অবদান

হুসেনশাহী বংশ—ইলিয়াস শাহী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক জালাউদ্দিন ফৎশাহকে হত্যা করে জনৈক হাবসী ক্রীতদাস বাংলাদেশের শাসন কর্তৃত্ব দখল করে। ১৪৮৭ থেকে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হাবসী শাসনকালকে বাংলার ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করা হয়। হাবসী অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার মানুষ আরবদেশীয় ওয়াজির বা প্রধানমন্ত্রী হুসেন শাহের নেতৃত্বে হাবসী সুলতান মুজফ্‌ফরকে হত্যা করে। রাজধানীর মানুষের, আত্মীয়দের অনুরোধে হুসেনশাহ সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ উপাধি নিয়ে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ—বাংলাদেশের সিংহাসনে বসে প্রথমেই আলাউদ্দিন হুসেন শাহী হাবসী আমীর ও সৈন্যদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। অতঃপর হাবসী আমলে বহিষ্কৃত আমীরদের নিজ নিজ কাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। সর্বত্র স্থানীয় কর্মচারী নিয়োগ করে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা দূর করতেও সচেষ্ট হন।

হাবসী বিতাড়ন ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত জৌনপুর রাজ্যের সুলতান হুসেনশর্কী দিল্লীর সুলতান সিকান্দার লোদীর কাছে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিকান্দার লোদী বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত শান্তি স্থাপিত হয়। উত্তর-বিহার বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পশ্চিম সীমান্তে দিল্লীর সঙ্গে বিরোধ

রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেও পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তার ব্যবস্থায় নিশ্চিন্ত হয়ে হুসেন শাহ্ রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত কামতাপুর রাজ্য আক্রমণ করে তার রাজধানী দখল করেন। কামতাপুরের সাফল্যের পর তাঁর আসাম অভিযান ব্যর্থ

হয়। উড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্রদেব বাংলার সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করেন। কিন্তু হুসেন শাহী বাহিনী মান্দারণ দুর্গ পর্যন্ত উড়িষ্যা সীমানা দখল করেন। পর পর তিনটি অভিযান ব্যর্থ হলে সুলতান স্বয়ং ত্রিপুরা আক্রমণ করেন ও উক্ত রাজ্যের কতকাংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আসাম ব্যতিরেকে হুসেন শাহের অপর অভিযানগুলি সফলতা লাভ করেছিল।

রাজ্য বিস্তার

মধ্যযুগের বাংলাদেশে হুসেনশাহ ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি বিচক্ষণ দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে হিন্দু প্রজাসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহায়তা লাভ করেছিলেন। বে-সামরিক ও সামরিক উভয় বিভাগে উচ্চপদে যোগ্য হিন্দু নিয়োগ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন জয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর ওয়াজির বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন গোপীনাথ বসু। সেনাপতি ছিলেন গৌর মল্লিক, রাজচিকিৎসক ছিলেন মুকুন্দ দাস।

অবদান

বাংলাভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির তিনি ছিলেন পরম পৃষ্ঠপোষক। মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সুলতান হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে পরমেশ্বর নামে জনৈক হিন্দু পণ্ডিত বাংলাভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন।

বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ হুসেন শাহকে 'নৃপতি তিলক', 'জগৎ ভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

নসরৎ শাহ—আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার অনুসৃত নীতি অনুসরণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল অধিপতি জাহিরুদ্দিন বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ক্রমশঃ পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হন। নসরৎ শাহ বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে আসন্ন বিপদ প্রতিরোধের প্রয়োজনে জৌনপুরের লোহানী বংশীয় সুলতান বাহার খাঁ লোহানী, বিহারের আফগান সর্দার শের খাঁ ও লোদী বংশের জনৈক বংশধর মামুদের সক্রিয় সহায়তায় এক মোগলবিরোধী শক্তিসংঘ গড়ে তোলেন। উত্তর-ভারত থেকে বিতাড়িত আফগান সর্দারগণও এই শক্তিসংঘকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করল। এদিকে বাবর বাংলাদেশে দূত পাঠিয়ে নসরৎ শাহের আনুগত্য দাবি করল। মোগল দূতকে লক্ষ্মণাবতীর দরবারে প্রায় এক বৎসর রেখে নসরৎ শাহ কৌশলে সরাসরি মোগল প্রভুত্ব স্বীকার না করে নানাভাবে মোগল বাদশাহকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে আফগান সর্দারদের পরস্পর দ্বন্দ্ব মোগল-বিরোধী শক্তিসংঘকে দুর্বল করেছিল। শক্তিসংঘের মধ্যেও দ্বন্দ্ব শুরু হলে নসরৎ শাহের পক্ষে সংঘ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। সুযোগ বুঝে বাবর পুনরায় নসরৎ শাহের আনুগত্য দাবি করলেন। নসরৎ শাহ

মোগল-বিরোধী সংঘ

আনুগত্য মেনে না নেওয়ায় উভয়পক্ষের মধ্যে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে বাংলার সুলতান নসরৎ শাহ পরাজিত হয়ে মোগল বাদশাহের প্রতি মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করেন।

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর পূর্ব-ভারতে আফগানগণ পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোগলবিরোধী শক্তিসংঘ পুনর্গঠিত করল। নসরৎ শাহ সংঘকে শক্তিশালী করবার প্রয়োজনে মোগলদের শত্রু গুজরাটের বাহাদুর শাহের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। উভয়পক্ষের আলাপ-আলোচনা চলাকালে জনৈক আততায়ীর হাতে নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়।

নসরৎ শাহ পিতার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবার জন্য ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে অহোম রাজ্য অভিযান করেন। কিন্তু সুলতানী বাহিনী নৌ-যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ায় বাংলার ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জয়ের কামনা ব্যর্থ হয়।

নসরৎ শাহ পিতার ন্যায় উদার, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। মোগল অভিযানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সীমানার নিরাপত্তা বজায় রাখাই তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। তিনিও পিতার ন্যায় বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীকর নন্দী, কবিকঙ্কন প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকগণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কয়েক বছর শাসনের পর তাঁকে হত্যা করে মামুদ সিংহাসনে বসেন। সুলতান মামুদকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করে আফ্গান নেতা শের খাঁ বাংলাদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করলে হুসেন শাহী বংশের শাসনের অবসান হয়। হুসেন শাহী শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাংলাভাষা শিক্ষা, সাহিত্যে নবজাগরণ। ঐ জাগরণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। হুসেন শাহী শাসকদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বাংলা ভাষা ও ভাবের আদান-প্রদানের বাহনে পরিণত হয়। রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনীর বঙ্গানুবাদ ও তার প্রতি বাঙালির আকর্ষণ নবজাগরণে সহায়তা করে। যশোরাজ খাঁ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, শ্রীধর প্রমুখ বাঙালি ব্যক্তিগণ রাজদরবারে পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেন। বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস প্রমুখ দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় মনসা মঙ্গল কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলার সুলতানগণ বাঙালিতে পরিণত হয়ে বাংলার ভাষা ও সাহিত্য মনেপ্রাণে গ্রহণ করে বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগরণে সহায়তা করেন।

সাংস্কৃতিক অবদান.

সংস্কৃত ভাষাও বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে। এখানে সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রাথমিক জীবন চরিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপে 'নব্য ন্যায় সংঘ' স্থাপন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিশেষ স্থান ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব শুধুমাত্র ভক্তিবাদকে এক বিশেষ ধর্মীয় রূপ দিয়েছিলেন তাই নয়, তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক নবজাগরণের সৃষ্টি করেন। সংস্কৃত ভাষাকে নির্ভর করে ব্রাহ্মণ্যবাদ নতুন রূপ গ্রহণ করে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদের উপর ভিত্তি করেই সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করে।

মনসা ও চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বহু কাব্য ও গ্রন্থ রচিত হয়।

হিন্দুদের মতো মুসলমানদের মধ্যেও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ দেখা দেয়। আলাউল ও দৌলত কাজীর কাব্যে মানবতাবাদী ভাবপ্রবণ মনোভাব প্রকাশ পায়।

রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় হস্তলিপি, বিদ্যা উৎকর্ষতা লাভ করে। আরবীয় ও পারসিক ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি হস্তলিপি বিদ্যার উৎকর্ষতার প্রমাণ দেয়। তৎকালীন মুদ্রাতেও হস্তলিপি বিদ্যার স্বাক্ষর আছে।

'কেদারা', 'ধানশ্রী', 'মল্লার', 'বিলাবল' 'ভৈরবী' ইত্যাদি রাগ-রাগিণীর উল্লেখ সমকালীন বাংলা কাব্যে পাওয়া যায়। 'ভাইরোঁ', 'সিন্দুরা', 'বাংলা', 'পটমঞ্জরী', 'শ্রীরাগ' প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর এক তালিকা পাই কবি কুৎবান রচিত 'মৃগবতী' কাব্যে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে নামসংকীর্তন জনপ্রিয়তা লাভ করে।

স্থাপত্য শিল্পও হুসেন শাহী আমলে উৎকর্ষতা লাভ করে। 'দাখিল দরওয়াজা', 'একলাখি সমাধি', 'তাঁতিপাড়া মসজিদ্', গৌড়ের বড় সোনা ও ছোট সোনা মসজিদ হুসেন শাহী আমলের কিছু স্থাপত্যের নিদর্শন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাহমনী রাজ্য (The Bhamani Kingdom): সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের শাসনকার্যের দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্বীয় শিক্ষক, সর্বজনপ্রিয় কুতলুগ খাঁর হাতে। কিন্তু কুতলুগ খাঁর জনপ্রিয়তা দিল্লীর আমীরদের মনঃপুত ছিল না। ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান কুতলুগ খাঁকে দিল্লী ফিরে আসার নির্দেশ দেন এবং দাক্ষিণাত্যের দায়িত্বভার অর্পণ করেন আজিজউদ্দীন ও ইসাদ্-উল্-মুলুক্-এর উপর। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ আমীর, মিলিকরা ছিলেন সম্ভ্রান্তবংশীয় ও সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্ত। এরা আমীরান্-ই-সাদাহ্ নামে উল্লিখিত হয়েছেন। সুলতান আমীরান্-ই-সাদাহ্-এর সভ্য-সদস্যদের বরখাস্ত করে নিম্নকুলোদ্ভূত অযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করেন বলে বলা হয়। এছাড়া জনৈক আমীরান্-ই-সাদাহ্-এর সদস্যকে হত্যা করা হয়। দাক্ষিণাত্যে ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ইসমাইল মুখ নামে তাঁদেরই এক নেতাকে সুলতান বলে ঘোষণা করে দৌলতাবাদ দখল করে। কিন্তু ইসমাইল স্বীয় অক্ষমতা হেতু অপর এক আফগান দুঃসাহসিক আমীরের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। রাজ্যাভিষেকে তিনি আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ্ উপাধি গ্রহণ করে বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

কথিত আছে, হাসান পারস্যের পৌরাণিক বীর বাহমান শাহের বংশধর বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই শাসক বংশের নাম 'বাহমনী বংশ'। কিন্তু আর এক জনপ্রিয় কাহিনীর মতে 'গাঙ্গু' নামে জনৈক ব্রাহ্মণের অধীনে তিনি কাজ করতেন। ব্রাহ্মণ-প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যই তিনি বংশের নাম বাহমন (ব্রাহ্মণ) রাখেন।

বাহমন শাহ যোগ্য শাসক ও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি গুলবর্গায় স্বীয় রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি উত্তরে ওয়েন-গঙ্গা থেকে কৃষ্ণা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে দৌলতাবাদ থেকে ভাঙ্গীর পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। অতঃপর সমগ্র রাজ্যকে বারটি তরফ বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। যথা—গুলবর্গা,

দৌলতাবাদ, বেরার ও বিদর প্রভৃতি। প্রতি তরফে একজন শাসক নিয়োগ করেন। ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন বাহ্‌মান শাহের মৃত্যু হয়।

১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহমন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রথম মহম্মদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদ শাহ্-এর শাসনকালেই বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সূচনা হয়। এই সকল দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষে বহু জীবন, ধনসম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। উভয়-পক্ষ গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দিয়েছে, পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু নির্বিশেষে হত্যা, বন্দী, দাস করেছে। ১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর-রাজ প্রথম বুক্কার মুদ্‌কল দুর্গ আক্রমণ ও দুর্গের সৈন্যদের হত্যার মাধ্যমে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। মুদ্‌কল দুর্গের হত্যালীলার জবাব দিতে গিয়ে প্রথম মহম্মদ শাহ্ স্বয়ং বিজয়নগর রাজ্যে প্রবেশ করে পাল্টা হত্যালীলা করেছিলেন। প্রথম বুক্কা রাজধানী ছেড়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সন্ধি সাক্ষরিত হয়েছিল। উভয়পক্ষ ভবিষ্যতে যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা, নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা না করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং উভয়পক্ষ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণে ঐকমত্য গড়েছিলেন।

প্রথম মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুজাহিদ শাহের শাসনকালে পুনরায় বাহমনী-বিজয়নগর দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কিন্তু বাহমনী সুলতান ব্যর্থ হন। পরবর্তী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ যুদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা শিল্প-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

পরবর্তী সুলতান ফিরোজ শাহের আমলে বিজয়নগর-রাজ দ্বিতীয় হরিহর কৃষ্ণ-গোদাবরী-দোয়াব অঞ্চলে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। কিন্তু বাহমনী-বরঙ্গল মৈত্রী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাহমনী সুলতান তুঙ্গভদ্রা অঞ্চলে এবং বিজয়নগর রাজ বেলগাঁও-এর উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যুর পর বিজয়নগর রাজ দ্বিতীয় দেবরায় তুঙ্গভদ্রা অঞ্চল পুনর্দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু বাহমনী সুলতান ফিরোজ শাহের কাছে পরাজিত হয়ে দশ লক্ষ 'হুন' মুক্তা ও প্রচুর হাতি দিতে স্বীকৃত হন। ভবিষ্যতের সকল দ্বন্দ্ব পরিহারের প্রয়োজনে দ্বিতীয় দেবরায় বাঁকাপুর অঞ্চলটিও দান করেন। স্বীয় কন্যাকে ফিরোজ শাহের সঙ্গে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন। অবশ্য বৈবাহিক সমঝোতা যুদ্ধ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়। কৃষ্ণা-গোদাবরী উপত্যকাকে কেন্দ্র করে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে বরঙ্গল রাজ্যের সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের বিচ্ছেদে দাক্ষিণাত্যের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। যুদ্ধে ফিরোজ শাহ্ পরাজিত হন। এবং বিজয়নগর কৃষ্ণানদীর উৎস-অঞ্চল দখল করে নেয়। এছাড়াও, বেরারের শাসক রাজা নরসিংহ রাই-কে পরাজিত করে করদরাজ্যে পরিণত করেন।

ফিরোজ শাহের বাহমনী শাসন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুলতান ফিরোজ কোরান, হাদিস্ ইত্যাদি ঐস্লামিক ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুকবি, তাঁর হাতের লেখা ছিল খুবই সুন্দর। এতদ্‌ব্যতীত, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যামিতি, তর্কশাস্ত্র, ইত্যাদিতেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর খুবই উৎসাহ ছিল এবং দৌলতাবাদে তিনি একটি মানমন্দির গড়ে তোলেন। তিনি পারসিক, আরবীয়, তুর্কী, তেলেগু, কান্নাড় ও মারাঠী ভাষা জানতেন। তিনি দাক্ষিণাত্যকে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দিল্লী, পারস্য ও

ইরাক থেকে আগত বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তাঁর দরবারে আসন লাভ করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রোপদেষ্টা, কবি, ইতিহাস বর্ণনাকারীদের সঙ্গে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কাটাতেন। সুলতান ফিরোজও বাইবেলের পূর্ব ও অন্তভাগ পাঠ করেছিলেন। এবং সকল ধর্মীয় মতামতকে শ্রদ্ধা করতেন। অবশ্য তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন।

১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ প্রথম দেবরায়ের কাছে পরাজয়ের পর বৃদ্ধ ফিরোজ এক গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হন। দাক্ষিণাত্যের সুফী সাধক যেশু দরাজ-এর আশীর্বাদ-প্রাপ্ত সুলতানের ছোট ভাই আহম্মদ-এর বিদ্রোহের ফলে ফিরোজ প্রায় বাধ্য হয়ে সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। প্রথম আহম্মদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথমেই বরঙ্গল রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। বরঙ্গল-রাজ যুদ্ধে নিহত হলে উক্ত রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি গুলবর্গা থেকে বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর তিনি মালব, গণ্ডোয়ানা ও কোঙ্কন অধিকার করেন। তাঁর শাসনকালে বিজয়নগর-রাজ দ্বিতীয় দেবরায় বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে এক অপমানজনক সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন। প্রথম আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই কোঙ্কনের বিদ্রোহী রাজাকে দমন করেন। খান্দেশের নাসির খাঁকে পরাজিত করেন। বিজয়নগর-রাজ দ্বিতীয় দেবরায় স্বীয় সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত করে ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করে মুদ্‌কল-বাঁকাপুর ইত্যাদি অঞ্চল পুনর্দখল করবার জন্য বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু পরপর তিনটি যুদ্ধের পরও স্বরাজ্য সীমারেখা মেনে নিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অত্যাচারী শাসক হুমায়ুনকে লোকে 'কালিন' বলে অভিহিত করত। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর নিজাম শাহ্ সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনকালে উড়িষ্যা ও তেলেঙ্গানার শাসকগণ বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন।

নিজাম শাহের মৃত্যুর পর ৯/১০ বছরের পুত্র তৃতীয় আহম্মদ ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্তর্বর্তীকালের জন্য তিন সদস্যের একটি শাসক-পরিষদ গঠন করা হয়। শিশুপুত্রের মা নার্গিস বেগম ও মামুদ গাওয়ান নামে পারসিক বণিক উক্ত শাসক-পরিষদের সদস্য হন। রানী নার্গিস বেগম অত্যন্ত বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন। তিনি প্রায় দু'বছরকাল দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রনীতির সর্বেসর্বা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মামুদ গাওয়ান সর্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুলতান গাওয়ানকেই প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন এবং পরবর্তী বিশ বছরকাল তিনিই ছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বেসর্বা।

মামুদ গাওয়ান চিরশত্রু বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করে বাহমনী রাজ্যের পূর্ব-সীমান্ত কাঞ্চি পর্যন্ত প্রসারিত করেন। পশ্চিমে দাভোল ও গোয়া সহ সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃতি লাভ করে। বেরারও বাহমনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কোঙ্কন, সঙ্গমেশ্বর, উড়িষ্যা প্রভৃতির রাজাগণ বাহমনী রাজ্যের কাছে পরাজিত হয়। গোয়া, দাভোল-এর উপর কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ায় পারস্য, ইরাক ইত্যাদি

দেশের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও উন্নতি লাভ করে।

আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারেও তিনি মনোযোগী হন। সমগ্র রাজ্যকে আটটি তরফ বা প্রদেশে ভাগ করেন। প্রতিটি তরফ-এর কাজ দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন তরফদারের উপর। বেতন বাবদ তরফদারগণ নগদে অথবা জায়গির নিতে পারতেন। প্রতি তরফে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রয়োজনে খাস বা খাল্‌ল জমি রাখার ব্যবস্থা তিনি করেন। জমি জরিপ করে কৃষকের দেয় কর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। তিনি রাজধানী বিদরে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে পারসিক ও ইরাকী বহু পণ্ডিত নিয়োগ করেন।

আমীরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মামুদের পতন এমনকি বাহমনী রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী। আমীরদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী ছিল, যথা—দক্ষিণী ও আফাকী বা ঘরীব। দক্ষিণীরা হল বহুদিন যাবৎ যাঁরা দাক্ষিণাত্যে আছে আর আফাকী বা ঘরীবগণ নবাগত। মামুদ ছিলেন নবাগত দলে। তিনি সমঝোতার নীতি অবলম্বন করে দ্বন্দ্ব মেটাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু সত্তর বছর বয়সে ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিরোধী আমীর গোষ্ঠীর চাপে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়।

তৃতীয় আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য পুত্র মামুদ শাহ্ সিংহাসনে বসে আমীরদের দ্বন্দ্ব মেটাতে ব্যর্থ হন। তাঁর পর আরও তিনজন অযোগ্য শাসক বাহমনী সিংহাসনে বসেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে শেষ সুলতান কলিমুল্লাহ্ শাহের মৃত্যু হলে বাহমনী বংশের পতন ঘটে। প্রাদেশিক শাসকগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে ও বাহমনী রাজ্য ভেঙে পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। যথা—(১) বিজাপুরের আদিলশাহী রাজ্য, (২) আহম্মদনগরের নিজামশাহী রাজ্য, (৩) বেরারের ইমাদশাহী রাজ্য, (৪) গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী রাজ্য ও (৫) বিদরের বারিদশাহী রাজ্য।

বাহমনী রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের কাজ করেছে। নতুন এক সমন্বয়ী সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে দাক্ষিণাত্যে। ফলে প্রাদেশিক শাসকগণ মোগল যুগ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ও প্রভাবিত করেছে মোগল সংস্কৃতিকে।

দাক্ষিণাত্যের পাঁচ রাজ্য

বিজাপুর ঃ বিজাপুর ছিল বাহমনী রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে-ওঠা রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইউসুফ আদিল শাহ্ ধর্মনিরপেক্ষ ন্যায় বিচারক ও প্রজাহিতৈষী শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজাপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ্।

গোলকুণ্ডাঃ ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে কুতুব শাহ্ গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের তৃতীয় শাসক সুলতান ইব্রাহিমের শাসনকালে বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গে গোলকুণ্ডার সংঘর্ষ হয়।

আহম্মদনগরঃ ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে মালিক আহমদ আহম্মদনগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদর : ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে আমীর আলি বারিদের নেতৃত্বে বিদর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর বিদর জয় করে।

বেরার—১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে বেরার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ইমাদ্ শাহ্। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগর বেরার রাজ্যটি দখল করে নেয়।

তালিকোটার যুদ্ধ

এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়মিত ব্যাপার ছিল। আবার পুরাতন বৈরী বিজয়নগরের সঙ্গেও বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদর রাজ্যগুলির কখনও মিত্রতা কখনও সংঘর্ষ নিত্যকার ব্যাপার ছিল। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদর সম্মিলিতভাবে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্যের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করে। যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত হয়। বিজয়নগরের সর্বশক্তিমান মন্ত্রী রাম রায় নিহত হন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাহমনী-বিজয়নগর দ্বন্দ্বের প্রকৃতি

(Nature of the Bahmani-Vijaynagar Conflict)

বাহমনী রাজ্য ছিল মুসলমান-সুলতান শাসিত রাজ্য। কিন্তু বিজয়নগর ছিল হিন্দুরাজা-শাসিত রাজ্য। কিন্তু দু'রাজ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ধর্মীয় কারণে ঘটে নি। বিজয়নগর রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে প্রচুর পরিমাণে মুসলমান সৈন্য ছিল। প্রথম দেব রায়ের বাহিনীতে দশ হাজার মুসলমান নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় দেব রায় জায়গীর দিয়ে দু'হাজার মুসলমান তীরন্দাজ নিয়োগ করেছিলেন। অপরদিকে বাহমনী সুলতান ফিরোজ শাহের শাসনকালে দক্ষিণী ব্রাহ্মণগণ শাসন ও রাজস্ব বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে নিযুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রাহ্মণগণ নবাগত বিদেশী মুসলমানদের ভারসাম্য রক্ষায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে। দুটি রাজ্যের সংঘর্ষ ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক, কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক কারণে। দ্বিতীয়তঃ কি-উত্তরে কি-দক্ষিণে আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্বে কোন রাজ্যই এককভাবে এগোতে পারে নি। পশ্চিমের মালব ও গুজরাটকে বার বার দাক্ষিণাত্যের দ্বন্দ্বে টেনে আনা হয়েছে। পূর্বে উড়িষ্যাও বার বার দাক্ষিণাত্যের সংঘর্ষে নিজেকে জড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার হিন্দু রাজার সুদূর দক্ষিণে মাদুরাই অভিযান বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্যকেই দুর্বল করেছিল।

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের স্বার্থ তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। যথা—(১) কৃষ্ণা-গোদাবরী-দোয়াব অঞ্চল, (২) কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকা অঞ্চল, (৩) মারাঠাওয়াড় রাজ্য।

প্রথমতঃ কৃষ্ণা-গোদাবরী-দোয়াব অঞ্চল ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাই এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে একসময় চোল-চালুক্য ও যাদব-হোয়সল দ্বন্দ্ব ছিল। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিজমি ছিল খুবই উর্বর। এ অঞ্চল

বহির্বাণিজ্যে উন্নত ছিল। তৃতীয়তঃ মারাঠাওয়াড় অঞ্চলে কোঙ্কনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন ছিল মূল উদ্দেশ্য। কোঙ্কন পশ্চিমঘাট-পর্বতমালা ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী ফালি

জমি, যা' ছিল খুবই উর্বর এবং এখানে গোয়া বন্দর অবস্থিত। গোয়া বন্দরের মাধ্যমে পারস্য ও ইরাকের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। অর্থনৈতিক স্বার্থই রাজনৈতিক কোন্দলগত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণ ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিজয়নগর রাজ্য (Vijaynagar Empire)

বিজয়নগর রাজ্যের পত্তন সম্পর্কে নানা মত আছে। সঙ্গম নামে জনৈক ব্যক্তির হরিহর ও বুক্কা সহ পাঁচ পুত্র ছিল। কথিত আছে, বরঙ্গল রাজ্যের শাসক কাকটীয় বংশের সামন্ত ছিল পাঁচ ভাই। পরে হরিহর ও বুক্কা আধুনিক কর্ণাটকের কাম্পিলা রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছিল। যখন দিল্লীর সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক কাম্পিলা দখল করেন, তখন মুসলমান বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে হরিহর ও বুক্কাকে বন্দী করা হয়। পরে দু'ভাইকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করবার দায়িত্ব দেন দিল্লীর সুলতান। কিন্তু ইতিমধ্যে মাদুরাই-এর প্রাদেশিক ও মুসলমান শাসনকর্তা, মহীশূরের হোয়সল বংশের রাজা ও বরঙ্গলের রাজা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সুযোগ বুঝে হরিহর ও বুক্কা নতুন প্রভু ও নতুন ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করেন এবং গুরুদেব বিদ্যারন্যের নির্দেশ অনুযায়ী হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত হয়ে তুঙ্গভদ্রার উত্তর তীরে বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিহরের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমে ছোট্ট রাজ্য বিজয়নগর মহীশূরের হোয়সল-রাজ ও মাদুরাই-এর সুলতানের অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে নি। কিন্তু মাদুরাই সুলতানের আগ্রাসী নীতি হোয়সল রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটানোর পর হরিহর ও বুক্কা তাঁদের রাজ্যের সম্প্রসারণ নীতি অবলম্বন করে ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হোয়সল রাজ্যটি বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সম্প্রসারণ নীতি কার্যকরী করতে হরিহর ও বুক্কাকে অপর তিন ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। বিজয়নগর রাজ্য প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি লোকায়ত রাষ্ট্রসমবায়। হরিহর ও বুক্কা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সঙ্গম বংশ নামে পরিচিত ছিল। ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বুক্কা হরিহরের স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বিজয়নগর রাজ্যে চারটি রাজ বংশ শাসন করে। সঙ্গম বংশ, সালুভ বংশ, তুলুভ বংশ ও আরবিড়ু বংশ।

বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান প্রতিবেশী শাসকদের ভীতির কারণ হলে সংঘর্ষ বাঁধে। প্রায় চার দশকব্যাপী সংঘর্ষের পর মাদুরাই-এর সুলতানী রাজ্য অপসৃত হয়। এবং বেরস (কেরালা) ও তামিল দেশ সহ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরাংশে মোকাবিলা করতে হয় বৈরী-রাজ্য বাহমনীকে।

দ্বিতীয় দেবরায়ঃ সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন প্রথম দেবরায়ের পৌত্র দ্বিতীয় দেবরায়। বাহমনী রাজ্যের আক্রমণকে প্রতিরোধের প্রয়োজনে তিনি সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত করেন। আরবী যুদ্ধের ঘোড়া এনে দ্রুতগতির অশ্বারোহী বাহিনী গড়েন। কিন্তু বাহমনী বাহিনীকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি। ষোড়শ শতকের পর্তুগীজ লেখক নুনিজ বলেছেন, কুইলন, শ্রীলঙ্কা, পুলিকাট, পেগু, টেনাসসেরিস্ (ব্রহ্মদেশ ও মালয়)-এর শাসকগণ দ্বিতীয় দেবরায়কে কর প্রদান করেন। কর না দিলেও বিজয়নগরের সঙ্গে ঐ রাজ্যগুলির সম্ভবতঃ উপহার বিনিময় হয়েছিল। ইতালীয় পর্যটক নিকোলোকন্টি ও পারসিক পর্যটক আব্দুর রজ্জাক বিজয়নগরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

কৃষ্ণদেব রায়ঃ দ্বিতীয় দেব রায়ের পর বিজয়নগর রাজ্যের উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। কৃষ্ণদেব রায় তুলুভ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিজয়নগর রাজ্যের শাসকদের মধ্যে কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি রাজ্যে শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন নি, রাজ্যের পুরনো-বৈরী বাহমনী রাজ্যের উত্তরসূরী পঞ্চ রাজ্য ও উড়িষ্যার আগ্রাসী নীতিও প্রতিহত করেন। এছাড়া পর্তুগীজদের মোকাবিলাও তাঁকে করতে হয়।

প্রথমতঃ সাত বছর ব্যাপী যুদ্ধের পর কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যার রাজাকে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিজয়নগর রাজ্যের রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন। দ্বিতীয়তঃ তুঙ্গভদ্রা-কৃষ্ণা-দোয়াব অঞ্চলে পুরোনো আধিপত্য স্থাপন করতে গিয়ে বিজাপুর-উড়িষ্যা সম্মিলিত বাহিনীকে মোকাবিলা করেন। রায়জুড়, মুদ্কল পুনর্দখল করে ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতানকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। বেলগাঁও-এর বিজাপুর শহর দখল করে লুণ্ঠন করেন। গুলবর্গা ধ্বংস হয় এবং সন্ধি করতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্য সর্বাধিক শক্তি সম্পন্ন সামরিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পর্তুগীজদের সমুদ্রবক্ষে নতুন শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্বসূরীদের ন্যায় কৃষ্ণদেব রায়ও উপলব্ধি করতে পারেন নি। ফলে তিনি তাঁর নৌ-শক্তি গঠনে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেন নি। সমুদ্রে আর্থিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্যে পর্তুগীজগণ সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত বিজয়নগরের ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যগুলোর উপর হামলা করত। ঘোড়া সরবরাহের বিনিময়ে গোয়া পুনর্দখলে সাহায্যের প্রতিশ্রুতির প্রস্তাব দিয়ে বিজয়নগর রাজ্যের নিরপেক্ষতা আদায় করবার চেষ্টা করেছিল পর্তুগীজরা।

কৃষ্ণদেব রায় একজন শ্রেষ্ঠ গঠনমূলক শাসক ছিলেন। তিনি রাজধানী বিজয়নগরে একটি জলাশয় খনন করেন। তেলেগু ও সংস্কৃতে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁর নাটক আজও পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে নতুন তেলেগু সাহিত্য রচিত হয়েছিল। তেলেগু, কান্নাড় ও তামিল কবিগণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কৃষ্ণদেবের রাজত্বকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ—ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি। বারবোল, পায়েজ, নুনিজ প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকগণ তাঁর শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্পর্কে সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

শাসন ব্যবস্থা—রাজা ছিলেন সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী। কৃষ্ণদেবের আদর্শ ছিল "শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন।" কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—তিন শ্রেণী নিয়ে গঠিত মন্ত্রী পরিষদের সহায়তায় রাজ্যশাসন করতেন। 'মহাপ্রধান' বা প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সাম্রাজ্য বারোটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল—এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁকে একটা নির্দিষ্টসংখ্যক লোক ও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হত। প্রদেশগুলো আবার রাজ্য বা মণ্ডলম্, নাড়ু, স্থল, গ্রামে ভাগ করা হত। গ্রামগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল।

জমির উর্বরতা, উৎপাদিত দ্রব্যের প্রকৃতি ও জলসেচ ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারিত হত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়া সম্পদ কর, বাণিজ্য শুল্ক, বিবাহ কর প্রচলিত ছিল। এছাড়া যুদ্ধ করও ছিল।

সাম্রাজ্যের বিশাল কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী ছিল। সেনাদলে হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোক নিযুক্ত হত।

ন্যায়-নীতি ছিল বিচার-ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। রাজাই ছিলেন বিচার-ব্যবস্থার প্রধান। রাজার ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার উপর সাম্রাজ্যের স্থিতি নির্ভরশীল ছিল। কৃষ্ণদেব রায়ের পর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যোগ্য শাসকের অভাবে বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা ভেঙে যায়।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, বিজয়নগর ছিল সমৃদ্ধিশালী দেশ। রাজকোষ সোনার ও অন্যান্য ধনরত্নের প্রাচুর্য ছিল। অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। মন্দির, মঠ ও দানগ্রহিতাগণ ছিল প্রকৃত জমির মালিক। জমির মালিকগণ সুদের বিনিময়ে কৃষকদের ঋণ দিত। ঋণ পরিশোধ ব্যর্থ কৃষক ভূমিদাসে পরিণত হত। তাঁরা কুঁড়ে ঘরে বাস করত। কৃষকগণের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সম্পদশালী মানুষ প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় দিনযাপন করত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ছিল দারিদ্র্যসীমার নীচে।

বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, গন্ধদ্রব্যের শিল্প ও খনিশিল্প ছিল। কারিগরদের অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু শিল্প-সংঘগুলির মালিকানা ছিল মূলত দানগ্রহিতা ও বণিকদের হাতে। এঁদের নিজস্ব সংঘ ছিল। সংঘগুলির সমৃদ্ধির ফলে রাজসভায় এঁদের গুরুত্ব ছিল। বাজারে খাদ্যশস্য ছিল সুলভ ও সস্তা।

সামাজিক অবস্থা ঃ সমাজে জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণ ও ভূস্বামীদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। নারীদের স্বাধীনতা ও সমাজে সম্মান ছিল। কারুশিল্প, চারুশিল্প,, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা চর্চা, সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চা নারীসমাজে ছিল প্রচলিত। তাছাড়া বহুবিবাহ ও সতীদাহ, পণপ্রথার প্রাবল্য ছিল।

বিজয়নগরের শাসকগণ শৈব বা বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী হলেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন।

সংস্কৃতি ঃ

বিজয়নগরে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ছিল। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তামিল, তেলেগু ও কান্নাড় ভাষার চর্চাও প্রসার লাভ করে। কাব্য-সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্ববিষয়ে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের রাজ্য ছিল বিজয়নগর।

সুলতানী যুগে ভারতে ইসলামের প্রভাব
(Impact of Islam on India during Sultanate period)

দশম অধ্যায়

উত্তর-ভারতে ইসলামীয় শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নবম শতকে সিন্ধুদেশে এবং দশম শতকে পাঞ্জাবে ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আরব বণিকগণ ইতিপূর্বে দাক্ষিণাত্যে মালাবার অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। সুফী শাসকগণ মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের পূর্বে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করে। অল-বেরুনী তাঁর বিখ্যাত কিতাব-উল্-হিন্দ্-এর মাধ্যমে পশ্চিম-এশিয়ার মানুষের মধ্যে হিন্দু সমাজের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছিলেন। আরবীয় ভাষায় বৌদ্ধ মতবাদ ও বিভিন্ন লোককাহিনী, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে বই অনূদিত হয়েছিল। এমনকি হিন্দু যোগীদের পশ্চিম-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ সম্পর্কেও জানা যায়। আফগানিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধমঠ, স্তম্ভ ও মূর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মূলত সমন্বয়বাদী। অপরকে আপন করে গ্রহণ ভারতীয় চিন্তা ও দর্শনের মূল পথ। ইসলাম সিন্ধুতে আরবীয় সংস্কৃতি, পাঞ্জাবে পারসিক সংস্কৃতি এবং দিল্লী ও উত্তর-ভারতে মধ্য-এশিয়ার তুর্কী সংস্কৃতি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ইসলামের নিজস্ব একটা ধর্মচিন্তা ও দর্শন ছিল। সিন্ধুদেশে আগত আরবগণ হিন্দুদের কাফের বলে অভিহিত করেনি। গো-হত্যা নিষেধ করেছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক। ৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক হিন্দু রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় ভাষায় পবিত্র কোরান অনূদিত হয়েছিল। মামুদ ও তাঁর উত্তরাধিকারী মাসুদের সেনাবাহিনীতে প্রচুর হিন্দু সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্য ছিল। ঘোরীদের শাসনকর্তৃত্ব প্রাচীরবেষ্টিত শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রাম্য জনপদে হিন্দু রাজা, জমিদারদের মাধ্যমে ইক্তাদারগণ রাজস্ব আদায় করত। স্থানীয় ব্যাপারে ইক্তাদারগণ হস্তক্ষেপ করত না। দিল্লীতে সুলতানী যুগে বারবার শাসকদল পরিবর্তন সত্ত্বেও একটি স্থায়ী সবল সরকার ও বিচার-ব্যবস্থা ছিল যা রাজ্যের প্রজাগণকে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির হাত থেকে রক্ষা করত। প্রজাসাধারণ স্ব স্ব বৃত্তি ও পেশা সহজেই পালন করতে পারত। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে উৎসাহ দিয়ে নতুন নতুন বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ উন্মোচিত হয়েছিল। রাজপুতগণ নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারালেও, চিরাচরিত বর্ণাশ্রম প্রথা, পেশাদারী পথ, চিরাচরিত গ্রাম্য বিচার-পদ্ধতি, সর্বোপরি জমিদার, পাট্টাদার, খুত, মোকদ্দম ও চৌধুরীদের বংশগত অধিকার বজায় ছিল। যুগব্যাপী সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রচলিত

ব্যবস্থার ওপর গঠিত হয়েছিল এক পরিকাঠামো, যার প্রধান ছিলেন সুলতান এবং সুলতানের কর্মচারী ওয়ালী ও ইক্তাদারগণ। ফলে ভারতীয় সমাজ তার সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে ইসলামের পাশাপাশি বাস করছিল। মুসলিম বিজেতা ও শাসকেরা নিজেদের প্রাথমিক ধর্মান্ধতা ও উগ্রতা কাটিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের আচার-আচরণকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সঙ্গেই বসবাস করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণও বুঝতে পারে যে, মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে লাভ হবে না। ফলে উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদান বাড়তে থাকে। গড়ে ওঠে এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথ। হিন্দু-মুসলিম সাধকগণ সহিষ্ণুতার নীতি ও মত প্রচার করেন। হিন্দু অদ্বৈতবাদী দর্শন ও মুসলিম ওয়াদাত-উল্-উওযুদ্-এর মধ্যে বহু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সুফী সাধক ও হিন্দু সাধুসন্তদের মধ্যে মিলনের সুর বেজে ওঠে।

গোঁড়া প্রতিক্রিয়া

একশ্রেণীর গোঁড়া উলামা সম্প্রদায় শরিয়তের নামে সুলতানী শাসনকালে অসহিষ্ণু নীতি অনুসরণ করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাসাধারণকে 'জিম্মি' রূপে অভিহিত করে জিজিয়া কর আদায় করা হত। দ্বিতীয়তঃ জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ করবার প্রচেষ্টা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল তীব্র। তৃতীয়তঃ উলামারা ভারতকে একটি দার-উল-সালামে পরিণত করতে আগ্রহী ছিল। চতুর্থতঃ শক্তির সাহায্যে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংস সাধনও ছিল উগ্রতার প্রকাশ। পঞ্চমতঃ হিন্দু-নারীদের জোরপূর্বক বিবাহ করা ও বিবাহের পূর্বে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা ছিল উলামাদের ধর্মান্ধতা প্রকাশের আর এক পথ। ঐ অবস্থায় শাসকগণ আপোস ও মধ্যপন্থী পথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন। শরিয়তকে এড়িয়ে 'জাওয়াবিতের' মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করেন সুলতানগণ। আলাউদ্দীন খালজী ও মহম্মদ বিন তুঘলক সরাসরি উলামাগণের ক্ষমতা খর্ব করে এক ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের সূচনা করেন। কিন্তু সুলতান ফিরোজ শাহ ও তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে উলামাদের প্রাধান্য ক্রমেই স্থানীয় স্বাধীন শাসন কর্তৃত্বের জন্ম দেয়। কাশ্মীর, বঙ্গদেশ, গুজরাট, খান্দেশ, রাজপুতনা উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে স্থানীয় বংশানুক্রমিক স্বাধীন আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় স্থানীয় শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠতে থাকে। বাংলার হুশেন শাহ ও কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল-আবিদিনের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

স্থানীয় স্বাধীন কর্তৃত্ব

বঙ্গদেশ

বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ পরম ধর্মসহিষ্ণু শাসক। তাঁর শাসনকাল বৈষ্ণবধর্ম বাংলায় প্রচার ও প্রসার লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রতি তিনি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোশকতায় হিন্দু-মহাকাব্য 'মহাভারত' ও 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা' বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হয়। ঐতিহাসিকগণ হুসেন শাহকে 'বাংলার আকবর' রূপে অভিহিত করেছেন। মুসলমান পীরদের প্রতি হিন্দুদের প্রীতি ও হিন্দু আচার-আচারণের প্রতি মুসলমান আগ্রহ বাংলাদেশে 'সত্যপীর' পূজার জন্ম দেয়।

ফলে বাংলাদেশে সমন্বয়ী মনোভাব গড়ে ওঠে। হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ পিতার অনুসৃত নীতি ও কর্মধারা অনুসরণ করে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল-আবিদিন ছিলেন 'কাশ্মীরের আকবর'। তিনি হিন্দুদের জিজিয়া কর দান থেকে অব্যাহত দেন। যে সকল ব্রাহ্মণ পরিবার তাঁর পিতার শাসনকালে কাশ্মীর ছেড়ে চলে যান তাঁদের পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 'মহাভারত', 'রাজতরঙ্গিনী' আরবী ও পারসিক ভাষায় অনূদিত হয়। বহু আরবী ও পারসিক গ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

ইসলামীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিতে গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের প্রভাব অনস্বীকার্য। দ্বাদশ শতকে ভারতে সুফীবাদের উত্থান হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল। একসঙ্গে চলবার রাস্তা দেখিয়েছিল। বহু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, সুফী সাধক হিন্দু যোগীর ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ ইসলামীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন।

সুফীবাদ

দশম শতকে আব্বাসী খিলাফতের ধ্বংস ও তুর্কীদের রাজনৈতিক শক্তিরূপে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'মুতাজিলা' যুক্তিবাদী দার্শনিক তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর কর্তৃত্বের অবসান হল। শুরু হল একদিকে কোরান ও হাদিসের ওপর ভিত্তি করে গোঁড়া চিন্তা ও অপরদিকে অতীন্দ্রিয়বাদী সুফী মতবাদ। ইসলামের প্রথম যুগেই অতীন্দ্রিয়বাদীদের উত্থান হয়েছিল—পরে সুফী নামে এঁরা পরিচিত হয়। ইসলামিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্পদের উৎকর্ষ প্রদর্শন ও নৈতিক অধঃপতনের ফলে বিরক্ত হয়ে অতীন্দ্রিয়বাদীগণ গভীর ধার্মিক জীবনযাপন করতেন। রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে যুক্তি নয়, কোরান ছিল শেষ কথা। সুফীগণ বারটি ধারা বা 'শিল্‌শিলাহ্'তে বিভক্ত ছিল। প্রতি শিল্‌শিলাহ্-এর নেতৃত্বে থাকতেন একজন প্রধান অতীন্দ্রিয়বাদী, যিনি শিষ্যসামন্ত সহ 'কাষ্মা' বা ধর্মশালায় বাস করতেন। পীর বা গুরুর সঙ্গে মুরিদ বা শিষ্যর সম্পর্ক সুফী ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রত্যেক পীর একজন উত্তরাধিকারী বা 'ওয়ালী' নিয়োগ করে যেতেন। সুফী সাধকদের মঠ-সন্ন্যাসীদের ন্যায় জীবনযাপন, প্রায়শ্চিত্ত, অনশন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস যৌগিক প্রক্রিয়ায় গ্রহণে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও হিন্দু যোগীদের প্রভাবেরই ফল। মধ্য-এশিয়াতে ইসলামের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম বহুল প্রচারিত ছিল। পশ্চিম এশিয়ায় হিন্দু যোগীদের যাতায়াত ছিল। যোগ-গ্রন্থ 'অমৃতকুণ্ড' সংস্কৃত থেকে পারসিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। পরমেশ্বর বা আল্লাহ্, আত্মা, প্রকৃতি ও বস্তু-সংক্রান্ত বিষয়ে হিন্দু যোগী, সুফী সাধক ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। পরস্পরের মধ্যে সহিষ্ণু মনোভাব ও বোঝাপড়ার এটাই ছিল ভিত্তি।

সুফী মতবাদ প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা—বা-সারা ও বে-সারা। ইসলামিক আইন বা শরিয়ত যাঁরা অনুসরণ করে তাঁদের বলা হত 'বা-সারা' এবং 'বে-সারা' তাঁদেরকেই বলা হত যাঁরা শরিয়ত অনুসরণ না করে ভ্রাম্যমান সাধকদের

অনুসরণ করতেন।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ভারতে দুটি 'বা-সারা' গোষ্ঠীর আন্দোলন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, যথা চিস্তি সোহরাবর্দী শিল্‌শিলাহ্। পৃথ্বিরাজ চৌহানের পরাজয় ও মৃত্যুর পর ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে খাজা মুইনুদ্দীন চিস্তি ভারতে এসে চিস্তি শিলশিলাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন লাহোর ও দিল্লীতে অবস্থানের পর খাজা মুইনুদ্দীন আজমীড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সমকালীন গ্রন্থের অভাবে খাজার ক্রিয়াকলাপের কোন সঠিক তথ্য হাজির করা সম্ভব নয়। শেখ মুইনুদ্দীন চিস্তির শিষ্যদের মধ্যে বখতিয়ার কাকী ও তাঁর শিষ্য ফরিদউদ্দীন গঞ্জ-ই-শাকার-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ফরিদউদ্দীনের ক্রিয়াকলাপ হান্‌সি ও অযোধ্যাতে সীমাবদ্ধ ছিল। দিল্লীতে তিনি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি পেতেন—রাজধানীতে গেলে জনস্রোত তাঁর চারপাশে ভিড় করত। তাঁর মন ও চিন্তাধারা ছিল খুবই প্রসারিত ও মানবতাবাদী, যে-কারণে তাঁর কিছু পথ শিখগণ তাঁদের 'আদি-গ্রন্থে' উদ্ধৃত করেছেন।

যাইহোক চিস্তি সুফী সাধকদের মধ্যে নিজামউদ্দীন আউলিয়া ও নাসিরুদ্দীন চিরাগ-ই-দিল্লী খুবই বিখ্যাত। এই আদি সুফী সাধকগণ জনসাধারণ বিশেষ করে হিন্দুসহ নিম্নশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতেন। তাঁরা অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও সহজ জীবনযাপন করতেন এবং মানুষের সঙ্গে হিন্দী ভাষাতেই কথা বলতেন। ধর্মান্তকরণ নিয়ে তাঁদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। যদিও পরবর্তীকালে কিছু পরিবার ও গোষ্ঠী এইসকল সাধকদের অনুপ্রেরণায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে দাবি করেছেন। সুফী সাধকগণ পরমেশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছনোর তাগিদে একপ্রকার সুরেলা আবৃত্তির মাধ্যমে সাধারণের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া সাধকগণ প্রায়শই হিন্দী কাব্য আশ্রয় করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করেন। নিজামউদ্দীন আউলিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসে যোগসাধনে খুবই সাফল্যলাভ করেছিলেন। তাই যোগীগণ তাঁকে 'সিদ্ধ' বলে অভিহিত করত।

সোহ্‌রাবর্দী-শিল্‌শিলাহ্ একই সময়ে ভারতে এসে তাঁদের কাজকর্ম প্রধানতঃ পাঞ্জাব ও মুলতানে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। উক্ত শিল্‌শিলাহ্‌তে শেখ সিহাবউদ্দীন সোহ্‌রাবর্দী ও হামিদউদ্দীন নাগরী খুবই জনপ্রিয় সাধক ছিলেন। তাঁরা সরকারী দপ্তরে বিশেষ করে ধর্মবিষয়ক সরকারী দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ গ্রহণ করতেন, কিন্তু চিস্তি সাধকগণ রাষ্ট্রীয় কাজ, শাসক ও আমীরদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সমীচীন বোধ করতেন না।

তুর্কীগণ ভারতে আসার বহু পূর্বেই 'ভক্তি' আন্দোলন ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয়বাদী মিলনের কথা বলত। বেদে 'ভক্তি'র বীজ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন যুগে এর ওপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি-পূজার ধারণা আসে। মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মবলম্বীদের বুদ্ধদেবের 'অবলোকিত' রূপে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের যুগে প্রথম বিষ্ণু পূজার প্রচলন শুরু হয়। গুপ্ত যুগে 'রামায়ণ',

ভক্তি আন্দোলন

'মহাভারত' নতুন করে লেখা হলে মুক্তির পথরূপে 'জ্ঞান' ও 'কর্মে'র সঙ্গে 'ভক্তি'র যোগ হয়।

যাইহোক, সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতেই প্রথম 'ভক্তি'র প্রসার ঘটে। মালবার অঞ্চলের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ শংকরাচার্যের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি জ্ঞান-এর ওপর ভিত্তি করে ভক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। শৈব নায়নার বৈষ্ণব আলভার সন্তগণ মুক্তির পথ রূপে ব্যক্তির পরমেশ্বরের কাছে উৎসর্জনের কথা প্রচার করতেন। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার কঠোরতাকে অস্বীকার করে দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় ভাষায় তাঁরা ভগবানে প্রেম ও ভক্তির কথা প্রচার করতেন।

যদিও বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষিণের সঙ্গে উত্তর-ভারতের যোগাযোগ ছিল, তবুও দক্ষিণের ভক্তিবাদী সাধকদের ধ্যান-ধারণা ধীর গতিতে উত্তরে পৌঁছায়। দক্ষিণ-ভারতের ভাষাসমূহ উত্তরে ছিল অজ্ঞাত। সংস্কৃত ভাষাই উত্তরের ছিল প্রধান বাহন। ভক্তিবাদের আদি প্রচারক দ্বাদশ শতকের রামানুজ। দক্ষিণ-ভারতীয় অঞ্চল তিরুপতিতে তাঁর জন্ম। তাঁর মতে ভক্তিযোগই মুক্তির একমাত্র পথ। বর্ণ-ভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। এছাড়া নিম্বার্ক ও মাধবাচার্য নামে দুজন, ভক্তিবাদী সাধকও ত্রয়োদশ শতকে ভক্তিযোগের পক্ষে প্রচার করেন। উত্তর-ভারতে ভক্তিবাদী ধ্যান-ধারণা প্রথম প্রচার করেন চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে মারাঠী সাধক নামদেব চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে। নামদেব ছিলেন প্রথম জীবনে দরজী, তারপর দস্যু, পরবর্তী জীবনে ভক্তিবাদী সাধক। তাঁর মারাঠী ভাষায় রচিত কাব্যগাথা ভগবানে প্রেম ও ভক্তির রসে রসসিঞ্চিত। নামদেব দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ভ্রমণ করে প্রেম ও ভক্তির বাণী প্রচার করেছেন। দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে একাধিক সুফী সাধকের পরিচয় ও আলোচনা হয়েছিল।

চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ও পঞ্চদশ শতকের প্রথম অধ্যায়ে আমরা রামানুজ-শিষ্য রামানন্দকে পাই। তিনি প্রয়াগে জন্মগ্রহণ করেন। প্রয়াগ ও কাশী ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। রামের প্রতি ভক্তিই মুক্তির কথা বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। বর্ণভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী রামানন্দ সকল শ্রেণীর মানুষের এক পংক্তিতে ভোজনে বিশ্বাসী ছিলেন। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সুফী রবিদাস, তাঁতী নানক ক্ষৌরকার সেন, কসাই সাধনের নাম উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত সাধকদের বাণী উর্বর জমিতেই রোপিত হয়েছিল। তুর্কী সুলতানী যুগের সূচনা, রাজপুত শক্তির পরাজয়, সমাজে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ও ক্ষমতা বিনষ্ট করেছিল। ফলে নাথপন্থী আন্দোলনের সৃষ্টি। তারা জাতিভেদ প্রথা ও ব্রাহ্মণ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়। ইতিমধ্যে ভারতে সুফী সাধকগণ ইসলামীয় সমতা ও ভ্রাতৃত্বের ধ্যান-ধারণা প্রচার করে সৌহার্দ্য ও শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করেন। মানুষ আর পুরনো ধর্মীয় ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয়—নতুনের আহবানে তারা করতে চায় ভক্তি-আন্দোলন।

কবীর: প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচক ও হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা যাঁরা সেযুগে প্রচার করেন তাঁদের অন্যতম ভক্তিবাদী কবীর ও নানক।

কবীরের জন্ম ও প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। কোন একটি কাহিনীর মতে, জনৈক ব্রাহ্মণ বিধবার সন্তান কবীর শৈশবে নীরু নামে জনৈক মুসলমান তন্তুবায়ের গৃহে প্রতিপালিত হন। কাশীতে থাকাকালে তিনি হিন্দু ও মুসলমান সাধকদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর এক এবং অবিনশ্বর। তিনি ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে ডাকতেন যথা—রাম, হরি, গোবিন্দ, আল্লাহ, সাঁই, সাহিবা। মূর্তি-পূজা, তীর্থস্নান, গঙ্গাস্নান, নামাজ প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন তিনি। সাধক জীবনযাপনের প্রয়োজনে গার্হস্থ্য জীবন বর্জন তাঁর নীতি ছিল না। যৌগিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেও তপশ্চর্যা বা গ্রন্থজ্ঞানকে তিনি সঠিক জ্ঞান বলে মনে করতেন না। কবীর তাঁর বাণীগুলি গীতি-কবিতা বা 'দোহার' আকারে রচনা করেন, যা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়। তিনি কোন বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন নি।

কবীর

নানক

গুরু নানক ঃ ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের তালওয়ান্দী গ্রামে এক ক্ষত্রীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সে বিবাহ করেন। পারসিক ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত নানক পৈতৃক-পেশা হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। পরে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করে সংসার ত্যাগ করেন। তিনি নিজে স্তোত্র রচনা করে রাবাব নামক যন্ত্রের সহযোগিতায় গাইতেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করে একেশ্বরবাদের পক্ষে প্রচার করেন। ভারতের বাইরে দক্ষিণে শ্রীলংকা, পশ্চিমে মক্কা-মদিনা তিনি সফর করেন। ধর্মসহিষ্ণুতা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, সকল মানুষের মধ্যে সমতার পক্ষে তিনি প্রচার করেন। মূর্তি-পূজা, তীর্থভ্রমণ বা বিশেষ কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের তিনি বিরোধী ছিলেন। জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। অনৈতিকতার বিরুদ্ধে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও পরমেশ্বরের কাছে পৌঁছনোর প্রয়োজনে

গুরুর প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলতেন। তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী, সাংসারিক ও অধ্যাত্মিক জীবন—একই সঙ্গে অতিবাহিত করবার পক্ষে। কবীরের শিষ্যগণ 'কবীরপন্থী' নামে পরিচিত হয়। এবং নানকের ধ্যান-ধারণা শিখধর্ম নামে এক ধর্মমতের জন্ম দেয়।

চৈতন্যদেব ঃ ভক্তিবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন চৈতন্যদেব। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাস্ত্র ও দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি গয়া গিয়ে ঈশ্বরপুরীর কাছে কৃষ্ণমন্ত্র নিয়ে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি মানুষের মুক্তির পথ বলে প্রচার শুরু করেন।

চৈতন্যদেব

চব্বিশ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে জীবনের শেষ আঠার বছর পুরীতে অতিবাহিত করেন। হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষ চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মে আকৃষ্ট হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেম ও বৈরাগ্য ছিল তাঁর প্রচারিত বাণীর মূলকথা। শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্তন করার প্রথা তিনি প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রচারিত ভক্তিবাদ সমগ্র ভারতে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সমবেত নাম-সংকীর্তন ভক্তির এক নতুন জোয়ার এনেছিল।

শিল্পকলা ও স্থাপত্য ঃ ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে দিল্লীতে সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তুর্কীগণ ভারতে শুধুমাত্র একটি নতুন ধর্মই নয়, সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা ও স্থাপত্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারা নিয়ে এসেছিল। ভারতে তুর্কীদের প্রথম স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে দিল্লীতে 'কুবাতুন ইসলাম মসজিদ' ও আজমীরে আড়হাই-দিন-কা-কৌপড়ার মাধ্যমে। কুবাতুন ইসলাম প্রথমে ছিল একটি জৈন মন্দির যা পরে বিষ্ণুমন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছিল। আজমীরে ছিল একটি মঠ। দিল্লীতে বিষ্ণু মন্দিরের গর্ভগৃহ ভেঙে দিয়ে তার তিনটি খোদাই করা খিলান বহির্ভাগে নির্মাণ করা হয়। খিলানগুলোতে মানুষ ও পশু চিত্র খোদাই করা হয়। শীঘ্রই তুর্কীগণ নিজেরা নতুন বাসগৃহে, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ শুরু

করলেন। নিযুক্ত হল ভারতীয় শিল্পী ও স্থপতি। তুর্কীগণ খিলান ও গোলাকার গম্বুজ বহুল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই খিলান-এ গোলাকার গম্বুজ আরবীয়গণ বাইজনেটাইন সাম্রাজ্য থেকে অনুকরণ করেছিল। মজবুত আস্তরের প্রয়োজনে উৎকৃষ্ট চুন, বালি ও জলের মিশ্রণ ঘটানো হত। এভাবেই নতুন এক স্থাপত্যরীতির প্রকাশ ঘটেছিল তুর্কী ভারতে। খিলান ও গম্বুজে শিল্পসজ্জার প্রয়োজনে একদিকে যেমন অ-ইসলামিক মনুষ্য পশু মূর্তির খোদাই বন্ধ হল, সঙ্গে সঙ্গে পদ্ম ও

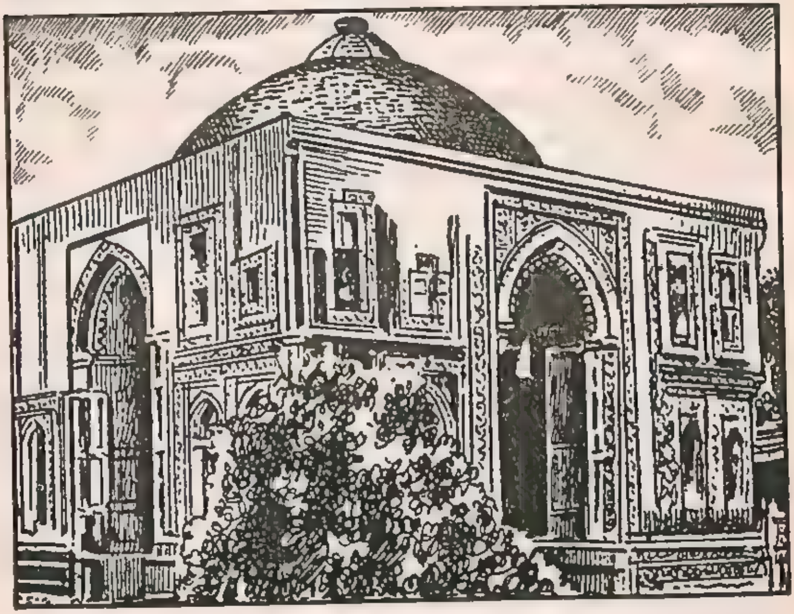

আলাই দরওয়াজা

স্বস্তিকা হিন্দু উপাদানে ও অলঙ্কারের কারুসজ্জায় শুরু হয়। হিন্দু-স্থাপত্য-রীতির আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, পাথরের স্ল্যাব্ ও কড়ির ব্যবহার। তুর্কী আমলেও শাসকগণ হিন্দু স্থাপত্যের এই রীতি গ্রহণ করে। এভাবেই হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যরীতির সমন্বয় ঘটে। কুতুবউদ্দীন ও ইলতুতমিসের আমলে নির্মিত বিখ্যাত কুতুবমিনার, আলাউদ্দীন খালজীর আমলে সিরিতে প্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত রাজধানী-শহর, কুতুবমিনারের প্রবেশ পথে নির্মিত আলাই দরওয়ারাজা তুর্কী যুগের স্থাপত্যের অন্যতম আকর্ষণ। তুঘলক যুগে স্থাপত্য শিল্পে হিন্দু-রীতির নতুন সংযোজন দেখতে পাওয়া যায়। অট্টালিকা আকাশচুম্বী করার প্রয়োজনে উঁচু বেদী ব্যবহার শুরু হয়। সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যে মর্মর প্রস্তরের গোলাকার গম্বুজ তৈরি হতে থাকে। এছাড়া ঢালু দেওয়াল, লিপ্‌টেল্, কড়িকাঠ ইত্যাদির ব্যবহারও দেখা যায়, সুলতানী যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু শিল্পরীতি ও মুসলিম শিল্পরীতির সমন্বয়। প্রাদেশিক শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আদিনা মসজিদ, দাখিল

দরওয়াজা, বড় ও ছোট সোনা মসজিদ, গুজরাটে জামি মসজিদ, মালবে হিন্দোলা মহল, জাহাজমহল, জৌনপুরে আড়াল মসজিদ, লাল দরওয়াজা মসজিদ বিখ্যাত। বাংলাদেশের সুলতানী স্থাপত্যে পাথর অপেক্ষা ইটের প্রচলন বেশি দেখা যায়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভারতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দিল্লীর ও প্রাদেশিক—উভয় ক্ষেত্রেই শাসকগণ বিদ্যা, শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগী ছিল। দিল্লীর দরবারে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ স্থায়ী আসন লাভ করতেন।

সাহিত্য ও ভাষা

'হিন্দুস্থানের তোতাপাখি' নামে অভিহিত আমীর খসরু ছিলেন সুলতানী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক। আমীর খসরু গিয়াসুদ্দীন বলবন, আলাউদ্দীন খালজী ও গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ভারতীয় কাব্যের অনুকরণে, হিন্দী শব্দ ব্যবহার করে তিনিই প্রথম কাব্য রচনা করেন। এই যুগের অপর বিখ্যাত কবি ছিলেন হাসান-ই-দেহলভি।

মিনহাজ-উস্-সিরাজ, জিয়াউদ্দীন বারানী, ইসামী, শামস-সিরাজ আফিফ প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের রচনায় সুলতানী যুগে ইতিহাস-সাহিত্য রচনা উৎকর্ষ লাভ করেছিল। অনুবাদ সাহিত্যও এ-যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারসিক ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল।

পার্থসারথি মিশ্র, দেবসুরী, জীব-গোস্বামী, গঙ্গাধর, জীমুতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি হিন্দু সাহিত্যিকগণ ধর্ম, দর্শন, আইন সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে বাংলা, পাঞ্জাবী ও মারাঠী ভাষার বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। সুলতানী যুগে মালাধর বসুর 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা', কবি পরমেশ্বরের 'মহাভারত', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' এবংবৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি অনূদিত ও রচিত হয়েছিল।

পারসিক-আরবীয় ও হিন্দীর সংমিশ্রণের ফলে উর্দু ভাষার জন্ম। খালজী যুগে চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে দিল্লীর মানুষ যে উর্দু ভাষায় কথা বলত, তা

উর্দুভাষার

সাধারণভাবে 'দেহলভি' নামে অভিহিত হত। উর্দু ভাষা প্রথম সাহিত্যে ব্যবহার করেন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক আমীর খসরু। প্রথম যুগে মুসলমানগণ পারসিক হরফে উর্দু লিখতেন। কিন্তু হিন্দু লেখকগণ দেবনাগরী হরফ ব্যবহার করতেন। সুলতানী যুগে সৈন্যবাহিনীর লোকেদের ভাষা এদেশের মানুষের কথ্য ভাষার সঙ্গে মিশে যে নতুন শংকর ভাষার উদ্ভব হয়—তাই উর্দু।

মোগল যুগ (১৫২৬-১৭০৭)

Mughal Age (1526-1707)

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের উপাদান (Historical Sources)

মোগল যুগেও সুলতানী যুগের ন্যায় ইতিহাসের উপাদানের কোন অভাব নেই। এযুগের কোন কোন শাসক স্বীয় আত্মজীবনী লিখেছেন। দরবারের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ লিখেছেন তাঁদের দেখা শাসনকালের ঘটনাসমূহ। সরকারী শাসনব্যবস্থা, দলিল-দস্তাবেজ মুদ্রা ও বিদেশী পর্যটকদের কাহিনীও আছে পর্যাপ্ত। ফলে মোগল যুগের ইতিহাস রচনা অনেক সহজতর হয়েছে।

আত্মজীবনী : মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আত্মজীবীন 'বাবরনামা' ও বাদশাহ জাহাঙ্গীরের লিখিত 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী'।

সমসাময়িক রচনা : বায়াজিদ্ সুলতান রচিত (তারিক-ই-হুমায়ুন), আবুল ফজল লিখিত (আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী), আবুল কাদির বাদায়ুনীর (মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ), খাজা নিজামউদ্দীন রচিত (তাবাকৎ-ই-আকবরী), মহম্মদ কাশিম হিন্দ্ শাহর (তারিখ-ই-ফিরিস্তা), আহমদ্ ইয়াদগর রচিত (তারিখ-ই-সালাতিন-ই আফগানা), শেখ ফৈজী (আকবরনামা), খাজা কাস্গর খৈরাত্ খান-(মাসির-ই-জাহাঙ্গীর), মোতানাদ খান্ (ইকবাল নামা), আব্দুল হাসীদ লাহোরী রচিত (বাদশাহ নামা) মোগল যুগের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে স্বীকৃত।

বিদেশী পর্যটকদের কাহিনী : র‍্যালফ্ ফিচ্, পার্চাম, স্যার টমাস রো, এডওয়ার্ড টেরী, ডি লায়েত, টেভারনিয়ার, বার্নিয়ার, মানুচি প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্যটকদের রচনা থেকে মোগল যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

এছাড়া পর্তুগীজ খ্রীষ্টান যাজন মনসেরেই ও অন্যান্য যাজকদের পর্তুগালে লেখা চিঠি, দিনলিপি ও বিবরণীও উপাদান হিসাবে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

সরকারী দলিল-দস্তাবেজ : মোগল দরবারের বিভিন্ন ঘটনার সংবাদপূর্ণ পত্র ও সরকারী ইশতেহার, বা 'আখবরাট' নামে অভিহিত মোগল শাসনের ইতিহাস রচনায় সহায়তা করে। মোগল দরবারের কার্য-বিবরণীও 'আখবরাট'-এ স্থান পেয়েছে।

চিঠিপত্র : চিঠিপত্র ও বিভিন্ন রকমের লিখিত যোগাযোগ গচ্ছিত উপাদান হিসাবে মূল্যবান। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের ১৮১টি পত্রসহ মুদ্রিত বই 'রুকাত্-ই-আলমগিরী' ঐ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আকবরের রাজত্বকালে বিভিন্ন পদস্থ কর্মচারীদের কাছে পাঠানো নির্দেশসমূহ 'জারিদা-ই-ফরমান-ই-সালাতিন-ই-দিল্লী'র নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

জীবনমূলক রচনাঃ সাম্‌সুদ্‌দৌলা শাহনওয়াজ খান রচিত 'মাসির-উল্ উমারা', কেবলরাম রচিত 'তাদ্‌কিরাত-উল্-উমারা'র নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় ভাষায় রচিত রচনাঃ বিকানীরের দলপত্ সিং রচিত 'দলপত বিলাস', কেশবদাস রচিত 'জাহাঙ্গীর চন্দ্রিকা', মারাঠা ভাষায় রচিত 'সভাসদ-বাখর' ও রাজপুত চারণ-কবিদের 'চারণগীতি' ও শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব'-এর নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এতদ্‌ব্যতীত স্থাপত্য শিল্পগুলি ও মুদ্রাসমূহ ও ঐতিহাসিক উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।

মোগল পরিচয়
(Origins of the Mughals)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোগল পরিচয়ঃ মোঙ্গল কথাটির উৎপত্তি 'মোঙ্গ' শব্দ থেকে যার অর্থ নির্ভীক। মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান চীন দেশের সন্নিকটে মোঙ্গলিয়া। দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ পশ্চিম-এশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম-শাসন অধ্যুষিত অঞ্চল দখল করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। চিঙ্গিজ খাঁয়ের দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাই ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ মধ্য-এশিয়ায় রাজত্ব করতে থাকেন। চতুর্দশ শতকে চাঘতাই-এর রাজ্যটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ঐ শতকের মধ্যভাগে দু' ভাগে বিভক্ত রাজ্যটির পশ্চিম অঞ্চলে তৈমুর লঙ্গের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তৈমুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। চিঙ্গিজ-তৈমুরের বংশধরগণ চাঘতাই তুর্কী বা মোগল নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ মোঙ্গলগণ মধ্য-এশিয়ায় শাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ীভাবে বসবাসকালে স্থানীয় তুর্কীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মোগল কথাটি 'মোঙ্গল' শব্দটির অপভ্রংশ।

বাবর কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাঃ ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবরের জন্ম হয় ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। বাবর পিতার দিক থেকে তৈমুর ও মায়ের দিক থেকে চিঙ্গিজ খাঁর বংশধর। 'বাবর' শব্দটির তুর্কী অর্থ সিংহ।

বাবরের পিতা ওমর শেখ মির্জা ছিলেন রুশ-তুর্কীস্তানের অন্তর্গত ফরগনা রাজ্যের অধিপতি। মাত্র বার বছর বয়সে বাবর পিতাকে হারিয়ে ফরগনার শূন্য-সিংহাসনে বসেন। তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ্ দখল করবার বাসনা বাবরের মনে তীব্র ছিল। ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সমরখন্দের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে বাবর পূর্বপুরুষের রাজ্যটি দখল করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফরগনা ও সমরখন্দ্ বাবরের হস্তচ্যুত হলে বাবর আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

কাবুলের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবর কাবুল দখল করেন। ইতিমধ্যে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে উজবেক সর্দার সাহেবানী খান পারস্যের শিয়া অধিপতি ইসমাইল সাফাবীর কাছে পরাজিত ও নিহত হন। বাবর সুযোগ বুঝে সাফাবী শাসক ইসমাইলের সাহায্যে সমরখন্দ্ পুনর্দখল করেন। কিন্তু শীঘ্রই উজবেকগণ নিজেদের পুনর্গঠিত করে সমরখন্দে পুনরায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। অপরদিকে অটোমান তুর্কীদের কাছে পারস্যের পরাজয়ে ট্রান্স-অক্সিয়ানার উজবেকদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বাবরের দৃষ্টি ভারতের দিকেই নিবদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ ভারতের সম্পদ বাবরকে ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয়তঃ আবুল ফজলের মতে, বাদাকসান্ কান্দাহার ও কাবুলের ন্যায় রাজ্য পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট সহজ ছিল না। তৃতীয়তঃ উজবেকগণের কাবুল আক্রমণের সম্ভাবনা বাবর কোন সময়ই বাতিল করে দেননি। ১৫১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাবর ভিরা দুর্গটি দখল করে দৌলত খান লোদী ও ইব্রাহিম লোদীর কাছে চিঠি ও দূত পাঠিয়ে তুর্কীদের অধিকারভুক্ত সকল অঞ্চলগুলি দাবি করেন। কিন্তু দৌলত খান বাবরের দূতকে আটক করে রাখেন। তাছাড়া বাবর কাবুলে ফিরে গেলে দৌলত খান পুনরায় ভিরা দুর্গটি দখল করেন। ১৫২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পুনরায় সিন্ধুনদ অতিক্রম করে ভিরা ও শিয়ালকোট দখল করেন। কান্দাহারের বিদ্রোহ দমন করে পুনরায় ভারতের দিকে নজর দেন। লাহোর আত্মসমর্পণ করে।

বাবর

এই সময়ে পাঞ্জাবের আফগান শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী পুত্র দিলওয়ার খানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বাবরের কাছে পাঠান। অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ইব্রাহিম লোদীকে সিংহাসনচ্যুত করবার অনুরোধ জানান দৌলত খান লোদী। একই সময়ে রাজপুত-নেতা রানা সঙ্গ অনুরূপ অনুরোধসহ দূত পাঠালেন বাবরের দরবারে।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পেশোয়ারে সসৈন্যে উপস্থিত হলে দৌলত খান লোদী পুনরায় মত পরিবর্তন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবরের কাছে আত্মসমর্পণ করলে বাবর পাঞ্জাব দখল করে নেন। অতঃপর বাবর দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলে দিল্লীর আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদী তাঁকে পানিপথের প্রান্তরে বাধা দিলে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হন। দিল্লী ও আগ্রা পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড মোগলগণ দখল করে নেয়। ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা হয়। যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর প্রায় পনের হাজার লোক নিহত হল। আগ্রায় ইব্রাহিম লোদীর

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ

সঞ্চিত সম্পদ বাবরের দখলে আসায় তাঁর আর্থিক অনটনেরও সুরাহা হয়। এছাড়া জৌনপুর পর্যন্ত বিস্তৃত সম্পদশালী অঞ্চল বাবরের কাছে উন্মুক্ত হয়। কিন্তু ভারতের মাটিতে পানিপথের যুদ্ধই বাবরের শেষ যুদ্ধ নয়। পানিপথের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের ইতিহাসে এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করে।

কিন্তু শীঘ্রই বাবরকে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায় স্বদেশ থেকে বহু দূরে, শত্রু-পরিবৃত অবস্থায় বাবরের সৈন্যগণ ভারতের মাটিতে দীর্ঘ অভিযান চালাতে অসম্মত হন। তা ছাড়া পূর্ব-রাজস্থান ও মালবের উপর কর্তৃত্বের প্রশ্নে মালবের মামুদ খলজীর পরাজয়ের পর রানা সঙ্গের প্রভাব আগ্রার সন্নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বাবরের সাম্রাজ্য বিস্তার রানা সঙ্গের কাছে সমূহ বিপদ হিসাবে দেখা দেয়। রানা সঙ্গ বাবরকে বিতাড়িত করবার প্রস্তুতি শুরু করলেন। ইব্রাহিম লোদীর ভাই মামুদ লোদী, মেওয়াটের শাসক হাসান খান ও প্রায় সকল রাজপুত শাসক রানা সঙ্গের দলে যোগ দিল। এমতাবস্থায় বাবর প্রথমে যে-সকল সৈন্য কাবুল ফিরে যেতে চায় তাদের ছুটি দিয়ে নিজের শক্তি পুনর্গঠন করলেন। বাবর নিজেও রানা সঙ্গের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনলেন। বাবর স্বীয় সেনাবাহিনীকে উজ্জীবিত করবার প্রয়োজনে রানা সঙ্গের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করেন।

আগ্রা থেকে ৪০ কি· মি· দূরে খানুয়ায় বাবর পরিখা খনন করে নিজের গোলন্দাজ বাহিনীকে প্রস্তুত করেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে খানুয়ার প্রান্তরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। বাবরের গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে রানা সঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনক্রমে পলায়ন করতে সমর্থ হন। দু' বছর পর রানা সঙ্গ পুনরায় বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রস্তুতির চেষ্টা করলে নিজের কর্মচারীগণই বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করে।

রানা সঙ্গের মৃত্যু ঐক্যবদ্ধ রাজস্থান গঠনের স্বপ্ন ও ভারতে রাজপুত শক্তির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট করে।

খানুয়ার যুদ্ধ বাবরকে দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে নিরাপদ করল। আগ্রার পূর্বাঞ্চলে গোয়ালিয়র, ঢোলপুর প্রভৃতি বাবর দখল করলেন। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মালবের চান্দেরী দুর্গ অবরোধ করে দখল করে নিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বাবর উত্তর-ভারতে আফগানদের মোগল-বিরোধী প্রস্তুতির খবর পেয়ে দিল্লী ফিরে এলেন। জৌনপুরের শাসনকর্তা মামুদ লোদী, বিহারের আফগান সর্দার শের খাঁ ও বাংলার নসরৎ শাহ্ সম্মিলিত হয়ে মোগল-বিরোধী শক্তি-জোট গঠন করেন। বাবর প্রথমে নসরৎ শাহের কাছে বশ্যতা দাবি করে দূত পাঠালেন। বাংলার সুলতান সরাসরি বাবরের দাবি প্রত্যাখ্যান করে সময় নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মামুদ লোদী ও শের খাঁ মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। বাবরও সময় নষ্ট না করে এলাহাবাদ, বারাণসী ও গাজীপুর দখল করে বিহারের আরা জেলায় প্রবেশ করলে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘর্ঘরা নদীর তীরে দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাঁধে এবং যুদ্ধে

আফগান শক্তি পরাজিত হয়। নসরৎ শাহ্ও যুদ্ধে বাবরের কাছে পরাজিত হয়ে বাবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু বাবর বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। ঘর্ঘরার যুদ্ধে পরাজয় সাময়িকভাবে আফগানদের দিল্লীর কর্তৃত্ব দখলের সম্ভাবনা দূর করল। দ্বিতীয়তঃ মোগল সাম্রাজ্যের সীমা অক্ষু নদী থেকে ঘর্ঘরা নদী পর্যন্ত এবং দিল্লী থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কোন শাসন কাঠামো গঠনের সময় তিনি পাননি। ভারতে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। যুদ্ধে জয়লাভ শেষ কথা ছিল না প্রকৃতপক্ষে আফগান শাসনব্যবস্থার কোন পরিবর্তনই তিনি করে যেতে পারেন নি। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়।

বাবরের আত্মজীবনী ঃ বাবরের আত্মজীবনী তাঁর মাতৃভাষা চাখতাই-তুর্কীতে লেখা। এই বইটি 'তুজুক-ই-বাবুরী', 'ওয়াকাব-ই-বাবুরী', বা 'বাবরনামা' নামে পরিচিত। বইটি বাবরের জীবনের সামগ্রিক কাহিনী নয়।

বইটির কোন ভূমিকা নেই—বাবর যখন ১২ বছর বয়সে ফরগনার সিংহাসনে বসেন সেই সময় থেকে বইটির সূচনা। বইটিতে ১৫০৯ থেকে ১৫১৯ এবং ১৫২০ থেকে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বইটি হঠাৎই শেষ হয়েছে।

আকবরের শাসনকালে 'বাবরনামা' প্রথমে পায়ান্দা খাঁ ও পরে আব্দুর রহিম মির্জা পারসিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন। লেভেন ও আরসকাইন এল্‌কিং ও মিসেস এ· এস· বেভারিজ বইটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। প্রথম দুটি অনুবাদ পারসিক ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে, কিন্তু বেভারিজ মুল চাখতাই তুর্কী ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন।

বাবরের মধ্যে একটি সুন্দর সাহিত্যানুগ রুচিবোধ ও সমালোচনামূলক কল্পনাবোধ ছিল। লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ। ভারতবর্ষ ও এদেশের মানুষ সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর বর্ণনা তিনি লিখেছেন। ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জলবায়ু, উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ, শিল্পব্যবস্থা, মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা, রাজনৈতিক চিত্র—সবকিছুই বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন। বাবর তাঁর নিজের দোষ-ত্রুটির কথাও গোপন করেননি। তিনি কখনও কখনও স্বদেশের সঙ্গে ভারতের তুলনামূলক বর্ণনা দিয়েছেন। ভৌগোলিক বিবরণ দিতে গিয়ে নিজেকে বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে গণ্য করেছেন। মোগল শাসকবংশের পতন হয়েছে কিন্তু অমর ও অক্ষয় হয়ে আছে 'বাবরনামা'।

মোগল-আফগান দ্বন্দ্ব
(Mughal-Afghan Contest)
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী, জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হন। বিপদগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আফগানগণ কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের দৃঢ় সঙ্কল্প। বাবর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রান্তরে দিল্লীর আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেছিলেন। ঘর্ঘরার যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়েছিল পূর্ব-ভারতের শের খাঁ ও মামুদ লোদীর জোট। কিন্তু আফগান শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তখনও পর্যন্ত আফগানগণ পূর্ব ও উত্তর ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে পুনরায় দিল্লীর কর্তৃত্ব দখলের স্বপ্ন দেখত। সুযোগ্য নেতার নেতৃত্ব তাদের প্রয়োজন ছিল। আফগানগণ তুর্কী শাসনের সূচনার সময়কাল থেকে ভারতের

হুমায়ুনের সিংহাসন লাভ

হুমায়ুন

বিভিন্ন প্রান্তে স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মোগলগণ ছিল নবাগত বিদেশী। সংখ্যাগত দিক থেকে আফগানরা মোগলদের থেকে সংখ্যায় ছিল বেশি। পূর্ব-ভারতে আফগান সর্দার শেষ খাঁর সাফল্য ভারতের মোগল-আফগান ক্ষমতা দ্বন্দ্বের চেহারাটা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এতদ্ব্যতীত গুজরাটের শাসনকর্তা উচ্চাভিলাষী বাহাদুর শাহ্‌র আক্রমণাত্মক নীতিও পূর্ব ও উত্তর-ভারতে আফগানদিগকে সংঘবদ্ধ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

প্রাথমিক সমস্যাসমূহ

হুমায়ুনের সিংহাসনে আরোহণের অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয় ভ্রাতা কামরান পাঞ্জাব দখল করলেন। হুমায়ুনও কাবুল, কান্দাহার ও লাহোরে কামরানের প্রভুত্ব স্বীকার করেন।

দ্বিতীয়তঃ গুজরাটের বাহাদুর শাহ মেবারের রানার সাহায্যে মালব দখল করে আহমদনগর, খান্দেশ ও মেবারের শাসকদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ইতিমধ্যে পর্তুগীজগণও বাহাদুর শাহের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই সময়ে কতিপয় বিদ্রোহী মোগল আমীরদের আশ্রয় দেওয়ার অপবাদে হুমায়ুন গুজরাট আক্রমণ করেন, বাহাদুর শাহ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। হুমায়ুন গুজরাট ও মালব দখল করেন।

শের খাঁ-র উত্থান

কিন্তু ঠিক একই সময়ে আফগান সর্দার শের খাঁ বিহারে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুলতান মামুদ শাহকে পরাজিত করে প্রচুর অর্থসম্পদের ও বাংলার একাংশের অধিকারী হন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করে গৌড় অবরোধ করলে হুমায়ুন শের খাঁর চুনার দুর্গ দখল করে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করেন। শের খাঁ হুমায়ুনের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ না করে বিহারে ফিরে যান। এদিকে হুমায়ুন প্রায় ন'মাস বাংলা দেশে কাটান। শের খাঁ এই সুযোগে জৌনপুর ও কনৌজ দখল করে নেন। এ-সংবাদে হুমায়ুন সত্বর আগ্রা যাত্রা করেন। পথে চৌসার প্রান্তরে শের খাঁর কাছে পরাজিত হয়ে কোনক্রমে আগ্রায় ফেরেন। বাংলা বিহার ও জৌনপুরে শের খাঁর কর্তৃক স্থাপিত হয়। শীঘ্রই হুমায়ুন বিশাল বাহিনীসহ শের খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে কনৌজের কাছে বিলগ্রামে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধে। হুমায়ুন পরাজিত হয়ে পলায়ন করলে 'শের শাহ' উপাধি নিয়ে শের খাঁ দিল্লীতে আফগান কর্তৃত্ব কায়েম করেন।

চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯ খ্রীঃ)

শেরশাহ (১৫৪০-৪৫ খ্রীঃ) সাম্রাজ্য স্থাপন—হাসান খাঁ শুরের পুত্র শের খাঁর জন্ম হয় পাঞ্জাবে। ছেলেবেলার নাম ফরিদ। কথিত আছে, নিজহাতে বাঘ মারার কৃতিত্বে নাম হয় শের খাঁ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিহারে সাসারামের জায়গিরদার নিযুক্ত হন।

হুমায়ুনকে পরাজিত করে 'শের শাহ' নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর প্রধান কর্তব্য হিসেবে দেখা দিল সামন্ত ভূস্বামীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা, বিশেষ করে বিহার ও বঙ্গের আফগান ভূ-স্বামীদের। অবশ্য ক্ষমতাদখলের জন্য একদা এদেরই সাহায্য নিতে হয়েছিল।

যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যে বাংলার শাসনকর্তা খিজির খাঁর বিদ্রোহ দমন করে বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করেন। শিকদারদের কাজ পরিচালনার জন্য 'আমীর-ই বাংলা' নামে একজন বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগ করেন। ১৫৪২-এর মধ্যেই মালব, গোয়ালিয়র, সারংপুর ও উজ্জয়িনী এবং তারপর পাঞ্জাব ও মুলতান অধিকৃত হল। ১৫৪৩ সালে রায়সিন দুর্গ দখল করার মধ্য দিয়ে সিন্ধুদেশে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ মাড়ওয়ারের গদিতে বসে রাজা মালদেও ক্রমে জয়সলমীর, আজমীর, মেবার, বিকানীর সহ সারা রাজস্থানে আধিপত্য বিস্তার করে নিজের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন।

সামেলের যুদ্ধ ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহ সামেলের যুদ্ধে ঐ রাজপুতদের পরাজিত করে আজমীর ও যোধপুর দখল করেন। তারপর চিতোর দখল করে মাউন্ট আবু পর্যন্ত অগ্রসর হন। দশমাস ব্যাপী যুদ্ধে শেরশাহ সারা রাজস্থান অধিকার করে নেন।

শেরশাহের মৃত্যু ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে রাজপুতানার একটি দুর্গ কালিঞ্জর অবরোধ কালে (২২শে মে) শেরশাহের জীবনাবসান ঘটে।

শের শাহ

শাসনব্যবস্থা ঃ স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী শেরশাহের কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা ছিল প্রজাহিতৈষী। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান হিসেবে তিনি সাম্রাজ্য সুষ্ঠু পরিচালনার

কেন্দ্রীয় সরকার উদ্দেশ্যে চারজন মন্ত্রী নিয়োগ করেন। যথা—দেওয়ান-ই-উজিরত্, দেওয়ান-ই-আর্জ, দেওয়ান-ই-রিসালাত্ ও দেওয়ান-ই-ইন্সা। তাছাড়া দেওয়ান-ই-কাজী ও দেওয়ান-ই-বারিদ বলেও দুজন কর্মচারীর উল্লেখ আছে।

সাম্রাজ্য সাতচল্লিশটি সরকারে বিভক্ত করা হয়। শিকদার-ই-শিকদারান ও মুনসিফ-ই-মুনসিফান নামে দুজন কর্মচারী প্রতিটি সরকারেব প্রশাসনিক

পরগনা দায়িত্বে থাকতেন। প্রতিটি সরকার আবার একাধিক পরগণায় বিভক্ত ছিল। শিকদার, আমিন ও মুনসিফ প্রতিটি পরগনা শাসন করত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবমুক্ত ভাবে। গ্রামের শাসনভার ছিল পঞ্চায়েতের উপর।

বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ছিল। 'কাজী'-র উপর ছিল দেওয়ানী বিচারের ভার আর 'মিরআদল' ছিল ফৌজদারী বিচারের দায়িত্বে। কঠোর দণ্ডবিধির তাগিদে প্রাণদণ্ড বহাল

বিচার ও পুলিসী ব্যবস্থা ছিল।

শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে পুলিশ নিযুক্ত হত। স্থানীয় অপরাধ দমন ও পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য যথাক্রমে 'মুকাদ্দম' ও 'মহতাসিফ' নিযুক্ত থাকতেন।

'দারোগা-ই-ডাক-চৌকি'র নেতৃত্বে বিশাল গুপ্তচর বাহিনী প্রশাসনকে সাহায্য করত।

রাজস্ব ঃ রাজস্বব্যবস্থার বিশেষ সংস্কার করা হয়। আবাদী-অনাবাদী সমস্ত জমি জরিপ করে উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে জমিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। শস্য অথবা মূল্যে মুকাদ্দম ও চৌধুরীগণ উৎপাদনের ১/৩ বা ১/৪ অংশ রাজস্ব হিসেবে আদায়

করতেন। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ এরা পারিশ্রমিক পেতেন। 'কবুলিয়ত ও পাট্টা' প্রথা প্রচলিত করে শেরশাহ সরকার ও কৃষকদের দেনা-পাওনার হিসেব রাখার ব্যবস্থা করেন।

তাছাড়া বিশেষ একটি খাজনা(Cess) আদায়ের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন মজুত ভাণ্ডার গড়া হত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে শুল্ক-সংস্কার করা হয়। একমাত্র সীমান্ত-অঞ্চলেই ক্রয়-বিক্রয়ে শুল্ক ধার্য ছিল। পুরানো মুদ্রা বাতিল করে নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হয়। শেরশাহ স্বর্ণমুদ্রারও প্রচলন করেন।

বাণিজ্য ও শুল্ক

শেরশাহ বহু জনহিতকর কাজের নমুনা রাখেন। তাঁর আমলেই নির্মিত হয় বাংলাদেশ থেকে সুদূর পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত আজকের গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড। তাছাড়া আগ্রা থেকে বুরহানপুর, যোধপুর ও চিতোর আর লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়।

জনকল্যাণমূলক কাজ

পথিকদের সুবিধার জন্যে রাস্তার পাশে অনেক গাছ-পালা ও সরাইখানা স্থাপন করা হয়। ঘোড়ার পিঠে ডাকের ব্যবস্থা করে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রাদানের সুবিধা করেন। সরাইখানাগুলো ডাক-চৌকির কাজ করত।

বাবরের অধীনে সামান্য সৈনিক ও পরে জায়গিরদার থেকে মোগল-শক্তিকে অপসারিত করে দিল্লীতে আফগান-শক্তির প্রতিষ্ঠা তাঁকে ইতিহাসে বিশেষ আসন দিয়েছে। সুশাসক হিসেবেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব ও গৌরবের অধিকারী। সাম্রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষ সুসংহত শাসনব্যবস্থার তিনি সফল প্রবর্তক। মাত্র পাঁচ বছরের শাসনকালে বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলোকে সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে এনে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেন। বিভিন্ন জনহিতকর ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাকে একটি জাতীয় রূপ দিতে সমর্থ হন।

অবদান

শেরশাহের উত্তরাধিকারীগণ

[শেরশাহ-স্থাপিত আফগানী সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভেঙে পড়েছিল মূলতঃ উপযুক্ত উত্তরসূরীর অভাব ও সেই সুযোগে ক্ষমতা দখলের জন্যে আফগান সর্দারদের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে। ফলে আফগান শক্তিকে অচিরেই রাজক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু দিল্লী থেকে সরে যেতে হয়। মোগলশক্তি ভারতের ইতিহাসে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে হুমায়ুনের সুদীর্ঘ ঐকান্তিক প্রয়াসেই।]

শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জালাল খাঁ সুলতান ইসলাম শাহ নামে সিংহাসনে আরেহণ করেন। তিনি শক্তহাতে তাঁর ভ্রাতা ও তদনুরাগীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে পিতার প্রশাসনিক সংস্কার ও শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সেনাদল বজায় রাখতে সমর্থ হন। বিপর্যয় ঘটে ইসলাম শাহের মৃত্যু হলে তাঁর নাবালক পুত্র ফিরোজ খাঁ মাতুল মুবারিজ-এর হাতে নিহত হলে। এই মুবারিজ মহম্মদ আদিল শাহ নামে সিংহাসনে আরোহন করেন। শাসক হিসেবে আদিল চূড়ান্ত অকর্মন্যতাই প্রমাণ করেছিলেন। এমতাবস্থায় হিমু নামে একজন হিন্দু সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক বাঁধন ধরে রাখার চেষ্টা করলে দুর্বল-সন্দিগ্ধচিত্ত আদিল সে-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে উদ্যত হন। শীঘ্রই বাংলা ও মালব তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। নিজের প্রিয়জনদেরই বিদ্রোহের মোকাবিলা

তাঁকে করতে হয়। অবশেষে আদিলের রাজকর্তৃত্বকেই সমূলে আঘাত করে শেরশাহের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র শুর রাজতন্ত্রে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জোরালো করে তোলে।

মোগলশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা

আকবরের সিংহাসনারোহণঃ আফগানী শুর সাম্রাজ্যের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা হুমায়ুনকে দিল্লীতে মোগলশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করে।

দীর্ঘ ১৫ বছর হুমায়ুন আশ্রয়ের জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভ্রাতাগণ কখনও তাঁর সহায়ক হয়নি। এমনিসময় সিন্ধুদেশে আলি আকবরের কন্যা হামিদা বাণুকে হুমায়ুন বিবাহ করেন। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হন শিশু আকবর। কিন্তু এদেশে কোন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে হুমায়ুন পারস্যের শাসক তাহমাস্পের শরণাপন্ন হলে তিনি সর্তসাপেক্ষে হুমায়ুনকে সাহায্য করেন। এভাবে পারসিক সাহায্য যা একদা প্রাচ্যে মোগলশক্তি স্থাপনে বাবরের সহায়ক হয়েছিল, আরো একবার হুমায়ুনকে হৃতসাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করল। শীঘ্রই হুমায়ুন কাবুল কান্দাহার জয় করলেন। উদ্ধত ভ্রাতা কামরানকে বন্দী করে মক্কায় প্রেরণ করা হয়; আস্কারীও মক্কায় চলে যায়। হিন্দাল হঠাৎই নিহত হয়।

আকবর

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল কর্তৃত্বাধীন হলে আফগান শুর শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ১৫৫৪-এর নভেম্বরে হুমায়ুন হিন্দুস্থান পুনর্বিজয়ে অগ্রসর হন। ১৫৫৫-তে লাহোর জয় করে ও পাঞ্জাবের সিকান্দার শুরকে পরাজিত করে দিল্লী ও আগ্রা পুনর্দখল করেন।

এভাবে হুমায়ুন হৃত-সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৫৫৬-এর ২৪শে জুলাই দিল্লীতে পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে।

আকবর হুমায়ুনের উত্তরাধিকার লাভ করেন মাত্র তের বছর বয়সে। সারা হিন্দুস্থানের বুকে মোগলরাজ তখনও প্রকৃতভাবে কায়েম হয়নি। স্মিথ যথার্থই বলেন, "পাদশা বলে ঘোষিত হওয়ার আগে দিল্লীর সিংহাসনে বহু লোলুপ দাবিদার থেকে নিজেকে যোগ্যতর প্রমাণ করে পিতার হারানো রাজ্যগুলো ফিরে পেতে হয়েছিল।" বাস্তবিকই ১৫৫৬ সালে

ভারতবর্ষে এক জটিল তমসাচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। একদিকে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীন শাসকেরা দিল্লীর ক্ষমতা দখলের জন্যে তীব্র লালসা প্রকাশ করছিল। হুমায়ুন হৃত সাম্রাজ্য সামান্যই উদ্ধার করেছিলেন। শেরশাহের সাম্রাজ্যের অধিকাংশ বিভিন্ন আফগান শাসকেরা তখনও দখলে রেখেছিল। সাহেরএবং সারা হিন্দুস্থানের উপর প্রভুত্বের প্রচ্ছন্ন বাসনা এরা অবশ্যই পোষণ করছিল। ঐতিহাসিক স্মিথের মতে 'এমন একটা পরিস্থিতি শুধুই তরবারির সাহায্যে মীমাংসা করা সম্ভব।'

পানিপথের যুদ্ধ

এই জটিল অবস্থায় সাম্রাজ্যকে সুস্থিতি দিয়ে গড়ে তোলা আকবরের পক্ষে সত্যিই দুরূহ কাজ ছিল। আকবরের সিংহাসনারোহণের অনতিকালেই আদিল শাহ শুরের সুযোগ্য সেনাপতি হিমু মোগলশক্তিকে প্রতিহত করতে অগ্রসর হয়। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ঐতিহাসিক পানিপথের প্রান্তরে মোগল বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। যুদ্ধে শেষপর্যন্ত আকবরই জয়লাভ করেন ও বিশাল বাহিনীসহ হিমুর পতন ঘটে।

এ-যুদ্ধ জয় আকবরের কাছে ছিল অসীম গুরুত্বপূর্ণ। মোগল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান হল। যুদ্ধের সুদূর প্রসারী ফল গেল মোগলেরই পক্ষে। একে একে সিকান্দার শুর আত্মসমর্পণ করে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, আদিল শাহ নিহত হয় (১৫৫৬ খ্রীঃ) বাংলার শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও ১৫৬৭-৬৮ নাগাদ ইব্রাহিম শুরেরও মৃত্যু হয়। পরবর্তী শত্রুকে আফগান অভ্যুত্থান বিক্ষিপ্ত লগ্নে দেখা দিলেও কখনও গুরুতর আকার নেয়নি।

গোড়ার দিকে আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁর হাতেই ছিল প্রকৃত শাসন কর্তৃত্ব। ১৫৫৮-৬০ এর মধ্যে গোয়ালিয়র, আজমীর, জৌনপুর অধিকৃতও হল। কিন্তু আকবরের এই অভিভাবকটির ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে অনেক শত্রুও তৈরি হয়েছিল। অনিবার্য কারণেই আকবর বৈরাম খাঁকে 'সম্মানের সঙ্গে মক্কায় নির্বাসিত' করেন। এতে বৈরাম বিদ্রোহ করলে তা সফল ভাবে দমন করা হয়। যাই হোক, মক্কার পথে কোনও এক লোহানি আফগান পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ বৈরামকে হত্যা করে।

এভাবে বৈরাম খাঁর প্রভাব থেকে অব্যাহতি মিললেও (১৫৬০-৬২ খ্রীঃ) তখন পর্যন্ত ধাত্রীমাতা মহম-আনঘা ও তার পুত্র আদম খাঁ কতিপয় পরিজনসহ অবাঞ্ছিত রাজক্ষমতা ভোগ করে চলল। এদের আচরণ ক্রমেই আকবরের সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে বাধ্য হয়ে আকবর আদমকে হত্যা করান ; কয়েকদিনের ব্যবধানে পুত্রশোকে মহম আনঘারও মৃত্যু হয়। ১৫৬২-র মে মাসের মধ্যেই আকবর সকল বাধা মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন মোগল সম্রাটরূপে রাজ্য বিস্তারে মন দেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার
(Imperial Expansion by Akbar)

সাম্রাজ্য বিস্তারে

আকবর ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তাঁর সাম্রাজ্য-বিস্তারের প্রকৃতি উগ্র সম্প্রসারণবাদী ডালহৌসিকেও ম্লান করে দেয়। যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ই তাঁকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

ঐশ্বর্যময় ও সমৃদ্ধিশালী গণ্ডোয়ানা তাঁকে আকর্ষণ করে। আফস খাঁর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরিত হল। বীরাঙ্গনা রানী দুর্গাবতীকে পরাজিত করে গণ্ডোয়ানা সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর রাজবাহাদুরকে পরাজিত করে মালবরাজ্য অধিকার করে নেন।

দূরদর্শী আকবরের রাজপুত নীতি বিশ্বের ইতিহাসে তাঁকে এক সফল সম্রাটের আসন দিয়েছে।

গণ্ডোয়ানা মালব বিজয়

তিনি বুঝেছিলেন, সমগ্র ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের খাতিরেই এই রাজপুত বংশকে মোগলের কর্তৃত্বাধীনে আনা প্রয়োজন। রাজপুতদের সাহসিকতা ও আন্তরিকতা তাঁকে মুগ্ধ করে। তাছাড়া এই রাজপুত জাতির শৌর্য ও

বীরত্ব সারা হিন্দুজাতিকে প্রভাবিত করে। এহেন শক্তির সঙ্গে মৈত্রী আকবর মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে অপরিহার্য বলেই উপলব্ধি করলেন। পাশাপাশি রাজপুতগণও তখন আকবরের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করছিল। ঐতিহাসিক টড-এর 'অ্যানালস্-অব-রাজস্থান' গ্রন্থে আকবর প্রসঙ্গে রাজপুতদের এরূপ মনোভাবের বহু সমর্থনযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আকবরের উদার রাজপুতনীতি হিন্দুগণকে আকবরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছিল।

রাজপুতনা বিজয়ী

এই রাজনীতিতে আকবর সফল হলেও মেবার তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেনি। ১৫৬৭-৬৮ সালে আকবর চিতোর অবরোধ করলে মেবারের রানা উদয়সিংহ আরাবল্লী পর্বতে পালিয়ে যান।

মেবার জয়

উদয়ের পর পুত্র রানাপ্রতাপ আবার মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। শেষে ১৫৭৬-এর ১৮ই জুন হলদীঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হন মোগল বাহিনীর কাছে।

মোগলবাহিনী ১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে রাজপুতানার রণথম্বোর দখল করার পর বুন্দেলখণ্ডের অধীনস্থ কালিঞ্জর দুর্গ দখল করে নেয়।

অতঃপর আকবর রাজ্য-সীমা সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তারে নজর দেন। পশ্চিম উপকূলে গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধানগণের মধ্যে তখন বিবাদ চলছিল ; এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে গুজরাটের এক ক্ষুদ্র নৃপতি ইতিমাদ খাঁ গুজরাটের এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আকবরকে আমন্ত্রণ জানান।

অন্যান্য রাজ্য

১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে আকবরের প্রথম গুজরাট অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে সারনাল-এর যুদ্ধে সুলতান মজফ্ফর শাহের পরাজয়ের মাধ্যমে। এই জয়লাভের ফলে আকবর সমৃদ্ধিশালী সুরাটবন্দর লাভ করেন ও পশ্চিম-এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের সুবিধা বেড়ে যায়। আকবরের দ্বিতীয় গুজরাট অভিযান সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিসম্পন্ন অভিযান হিসেবে চিহ্নিত হয়। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই অক্টোবর বিজয়ী আকবর গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদে প্রবেশ করেন।

গুজরাট অভিযানের স্মারক হিসেবে তিনি ফতেপুর সিক্রির দুর্গে বিখ্যাত 'বুলন্দরওয়াজা' নামক ফটক স্থাপন করেছিলেন।

শেরশাহের আমল থেকেই আফগান সর্দারগণ বাংলা ও বিহারের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। আফগান-সর্দার সুলেমান খাঁ বাংলার শাসনকর্তা থাকাকালীন ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করেন এবং স্বল্পস্থায়ী বাংলা সরকার গঠন করেন। পশ্চিমে রোটাসগড় পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং অবরোধ করেন। আকবর ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী প্রেরণ করেই রোটাস পুনর্দখল করেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাইয়াজিদ সিংহাসন লাভ

বাংলা ও বিহার জয়

করার কিছু দিনের মধ্যে আফগান আততায়ীর হাতে খুন হলে সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। দাউদ সম্পূর্ণভাবে আকবরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে শুরু করেন।

গুজরাট অভিযানে ব্যস্ত থাকাকালীন আকবর বাংলার শাসক দাউদের ঔদ্ধত্যের সংবাদ পাওয়া মাত্র মুনিম খাঁর নেতৃত্বে বাংলায় সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। এই অভিযানের সাফল্য পুরোপুরি অর্জন করতে না পারার ফলে আকবর তাঁর সর্বাপেক্ষা দক্ষ সেনাপতির রাজা টোডরমলকে বিহার অভিযানের দায়িত্ব দেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা আগস্ট মোগলবাহিনী পাটনা ও হাজিপুর দখল করে। পরে এই বিজয় অভিযানের আওতায় আসে মুঙ্গের, ভাগলপুর এবং দুর্ভেদ্য তেলিয়াগারহি। ক্রমশঃ বাংলার প্রবেশমুখ অবধি মোগল অধিপত্য বিস্তৃত হয়। দাউদ সাতগাঁও-এর (সপ্তগ্রাম) মধ্যদিয়ে উড়িষ্যা অভিমুখে চলে যায়। মোগলের পক্ষে সপ্তগ্রাম সহজেই দখল করা সম্ভব হয়। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা মার্চ রাজকীয় বাহিনী মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্তী বর্তমান বালেশ্বর জেলার তুকারই-এর যুদ্ধে দাউদকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে দাউদের খুল্লতাত জুনায়েৎ খাঁ পরাজিত হন। এবং পূর্ব-ভারতে বিহার ও বাংলায় মোগল আধিপত্য পরিপূর্ণতা লাভ করে।

১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলের মির্জা মহম্মদ হাকিমের মৃত্যুর পর আকবর কর্তৃক কাবুল মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথাগত কোনও নির্দেশনামায় এই অন্তর্ভুক্তি হয়নি। কারণ, কাবুল যদিও একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে শাসিত হচ্ছিল তবু একে ভারত সম্রাটের কর্তৃত্বের অধীন বলেই অভিহিত করা হত। পরবর্তীকালে মীর্জা মহম্মদ হাকিমের পুত্র মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে আকবর এই বিদ্রোহ দমন করেন। সম্ভবতঃ এই আফগান উজবেক্‌দের ভারত-আক্রমণের আশঙ্কার ফলেই আকবর বহুদিন লাহোরে অবস্থান করতে বাধ্য হন।

১৫৮১ খ্রীস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর কাশিম খাঁ-এর নেতৃত্বে মোগল বাহিনী কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ করে এবং কাশ্মীরে মোগলবিজয় সম্পন্ন করে। কাশ্মীর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কাবুলের একটি সরকার বা জেলায় পরিণত হয়। কাশ্মীর-অভিযান আকবরের নিকৃষ্ট রুচির নজির ও তাঁর উদার চরিত্রের একটি কলঙ্ক বিশেষ। কারণ, এই অভিযানের পর কাশ্মীরের সুলতান এবং তাঁর পুত্র ইয়াকুবের প্রতি আকবর অন্যায় আচরণ করে তাঁকে কারাবন্দী করেন। একদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌম সুলতান লজ্জাকরভাবে কারাবন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

কাশ্মীর অধিকার

কাশ্মীর জয় এই সময়ে পাঞ্জাবের পাহাড়ী এলাকার অর্ধস্বাধীন এবং অবাধ্য শাসকদের মধ্যে বিশেষ এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এমনকি তিব্বত অঞ্চলের লাডাক-এর বালিতিস্তান প্রভৃতি স্থানের শাসকগণও মোগল সার্বভৌমত্ব মানতে বাধ্য হয়।

বহু-প্রকল্পিত কান্দাহার পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সিন্ধু ও বালুচিস্তান অধিকার করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আকবর এই অভিযানকে বেশি গুরুত্ব দেন। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য দখল করেন।

দাক্ষিণাত্য অভিযান আকবরের কাছে অবশ্যই একটি আকাঙ্ক্ষিত অধ্যায়। আকবর দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতাকামী সুলতানী রাজ্যসমূহ তার অধীনস্থ করতে অদম্য প্রয়াস চালান। উত্তর-ভারতে মোগল আধিপত্য তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত হওয়ায় সম্রাট আকবরের দাক্ষিণাত্য অভিযান অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। সাম্রাজ্য বিস্তারের অনবদ্য প্রয়াসের ফলে দাক্ষিণাত্যে মোগল আধিপত্য বিস্তারের পরবর্তীকালে তিনি তার পূর্বপুরুষের শাসিত তুরান অঞ্চল জয়ের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শেষোক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়ার মূলে প্রধান অন্তরায় হল শক্তিশালী দক্ষিণ-ভারতের উজবেকদের বাধা। রাজ্যগুলির বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের সুযোগে দাক্ষিণাত্য অভিযানই শ্রেয় বলে আকবর মনে করলেন এবং তুরান অধিকারের পরিকল্পনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখলেন। আকবরের এই দাক্ষিণাত্য অভিযানের ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য ছিল বুরহানপুর ও আসিরগড়ের দুর্গ জয়। কারণ, বুরহানপুরে ছিল সম্পদের প্রাচুর্য ও আসিরগড়ে ছিল ইউরোপ বা এশিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুর্গ দাক্ষিণাত্যের মূল প্রবেশদ্বার। বুরহানপুরের সুলতান মোগল-আধিপত্য স্বীকার করেন। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সেনাবাহিনী আসিরগড় দুর্গ দখল করে খান্দেশে মোগল-আধিপত্য স্থাপন করে। আকবর পরে আহমদনগর আক্রমণ করেন এবং সেখানকার শাসিকা চাঁদসুলতানা পরাস্ত হন। সেটি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর দক্ষিণ-ভারত অভিযানের পিছনে ভারতকে পর্তুগীজ অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা করার প্রয়াসও ছিল।

দাক্ষিণাত্য বিজয়

আসিরগড় দুর্গ ও খান্দেশ দখল করা সাম্রাজ্য বিস্তারে আকবরের বিজয় অভিযানের শেষ পর্ব।

কাশ্মীর অভিযান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করার প্রয়াসে যখন আকবর লাহোরে অবস্থান করছিলেন সেই সময় তিনি সংবাদ পান যে মানসিংহের নেতৃত্বে মোগল বাহিনী উড়িষ্যার আফগানদের পরাজিত করে উড়িষ্যা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই নতুন প্রদেশকে বাংলা সুবার অধীনস্থ করা হয়।

উড়িষ্যা বিজয়

আধুনিক শাসন-ব্যবস্থার পরিকাঠামোর সুপরিকল্পিত রূপায়ণের প্রাথমিক পর্ব আকবরের এক সুমহান সৃষ্টি। সম্রাটের শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে কর্তব্যসাধনের মাধ্যমে আকবর রাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা দেন। তিনি সুলতান আখ্যা পরিত্যাগ করে সম্রাটের পদমর্যাদাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত করে রাষ্ট্রের প্রধান এবং সর্বশক্তির আধাররূপে প্রতিস্থাপন করেন। জনগণ সম্রাট-পদমর্যাদাকে আরও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করে। আকবরের প্রবর্তিত 'শাহেনশা' উপাধি মানবীয় যোগ্যতা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার উৎস বলে সূচিত হয়।

শাসন ব্যবস্থায় নয়া কাঠামো

শাসনকার্যে সম্রাটের নিরপেক্ষ ভূমিকাকে জনমানসে ফুটিয়ে তোলার জন্যে তিনি নিরপেক্ষ শাসনের প্রবর্তনে এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষকে একটি ইসলামী শাসনের আওতায় আনার প্রচেষ্টা কার্যতঃ আকবরের সময় বন্ধ হয়। রাজ্যজয়ের নীতি আকবরের সময় থেকে মূলতঃ ধর্মনৈতিক প্রয়োজনের পরিবর্তে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই পরিচালিত হতে আরম্ভ করে। হিন্দু নীতিশাস্ত্রের অনুসরণে

আকবর সম্রাটের দায়িত্বকে দুই ভাগে বিন্যস্ত করেন ; (১) জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত প্রজা-রক্ষার দায়িত্ব, (২) সমস্ত দেশে ধর্মসহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি করে ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার বন্টণ। জনগণের একাধারে শাসক ও পিতৃত্বের দায়িত্ব বহনে সম্রাট অঙ্গীকারবদ্ধ হন। জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অধ্যাত্মবাদের ক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। সম্রাট প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বময় প্রধান, শাসন এবং বিচার বিভাগের প্রধান ও ইসলামী আইনের মুখ্য ব্যাখ্যাকারী বলে ঘোষণা করেন। আকবরের পূর্বে বা আকবরোত্তর কালে ভারতে কোন মুসলমান শাসকই আকবরের ন্যায় নৈতিক মর্যাদা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়নি। ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে সম্রাটের নিরপেক্ষ ভূমিকার গুরুত্ব আকবর প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করতেন। ফলে তিনি জনগণের কাছে শাসক হিসেবে একজন মহামানবরূপে প্রতিপন্ন হন।

শেরশাহের শাসনব্যবস্থার অনুকরণে শাসনযন্ত্রকে পরিপূর্ণরূপে কার্যকরী করলেও আকবরের এই ব্যবস্থার মধ্যে বহু মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে। মৌর্য রাজতন্ত্রের সূত্র অনুসারে তিনি নিজের বেশির ভাগ সময়কে জনগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করেছিলেন।

প্রাচীন হিন্দু প্রথানুযায়ী সাধারণ মানুষ বিনা বাধায় সম্রাটের কাছে তাঁদের অভাব-অভিযোগ জানাতে পারত। এটা প্রথাবহির্ভূত দরবার হিসেবেই চিহ্নিত ছিল। এই দরবার-সভার পর আকবর 'দেওয়ানী-আম' অর্থাৎ দরবারের সভায় উপস্থিত হতেন। শাসনক্ষেত্রে আকবর বিস্তারিত শাসনতন্ত্রের পত্তন ঘটিয়ে মধ্যযুগের ভারতীয় রাজনীতিকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে এক সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি

ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর-প্রবর্তিত শাসনকাঠামো অবশ্যই আধুনিককালের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে, বৈদেশিক বংশোদ্ভূত একজন স্বৈরাচারী শাসকের পক্ষে জনগণের মন জয় করার একমাত্র উপায় হল সরকারের গৃহীত সকল নীতি ও কার্যাবলীর দায়িত্ব স্বস্কন্ধে গ্রহণ করা।

আকবর ভারতে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের নীতি রূপায়িত করেন তাঁর প্রবর্তিত সর্বজনীন ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শের মাধ্যমে। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষের দিন আকবর বিধবা-বিবাহ, অপ্রাপ্তবয়সে বিবাহ, বহুবিবাহ, বিবাহের প্রকৃতি সম্বলিত একটি বিধান জরুরী নির্দেশনামা জারী করেন। হিন্দু-মন্দির ও খ্রীষ্টান গীর্জা-নির্মাণের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তাছাড়া তিনি হিন্দুদের উপর থেকে অন্যায় কর প্রত্যাহার করে নেন।

আকবর স্বৈরাচারী শাসক হয়ে ও জ্ঞানোদীপ্ত ছিলেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নীতি এবং সর্বোপরি সম্রাটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা শাসনক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসা ্য রক্ষার প্রবণতা বিদ্যমান ছিল।

জায়গিরদারী প্রথা

প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে আকবর ১৫৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে খলিসাভুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে সমানুপাতিক হারে জায়গির জমির পরিমাণ কমিয়ে দেন। ফলে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা, বিহার ও গুজরাট ব্যতীত সমস্ত প্রদেশই ব্যক্তিগত

মালিকানার অধীনস্থ জমির পরিমাণ প্রায় শেষ হয়ে যায়। এইভাবে অধিকৃত জমি খলিসাভুক্ত জমিতে রূপান্তরিত করা হয়। এভাবে ব্যক্তিগত অধিকর্তাভুক্ত (জায়গির) জমির পরিমাণ ক্রমশঃ কমতে থাকে। তবে জায়গির ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিলোপ সাধন হয়নি। জায়গির প্রথায় রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতি দেখা দেওয়ায় এই সময়ে জায়গির-ব্যবস্থার পরিচালনা ও শাসন এবং জায়গির জমির রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সমস্ত কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত হয়। এযাবৎ ব্যক্তিগত বা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে এই জায়গির জমির দেখাশুনা ও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা রদ করা হয়।

ইসলামীয় আর্থিক নীতি পরিপূর্ণভাবে অচল করার ইচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়ে আকবর ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ওপর ধার্য তীর্থকর ও ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করে নেন। তবে এই কর প্রত্যাহারের দরুণ রাজস্বের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতি হয়। এর অব্যবহিত পরে তিনি মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাসহ প্রচলিত রপ্তানি ও আমদানি শুল্ক ব্যবস্থা বাতিল করেন। পরিবর্তে সকলের ক্ষেত্রে একই হারে শুল্ক দানের আদেশ দেন। আইন-ই-আকবরী-র বিবরণে দেখা যায় যে আকবর হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের আমল থেকে এযাবৎ জনগণের উপর প্রবর্তিত কর প্রত্যাহার করে নিয়ে জনগণের করের বোঝা লাঘব করেন।

সরকারী রাজস্বব্যবস্থা

আকবরের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যেগুলো প্রধান উৎস ছিল সেগুলো হল যথাক্রমে—করদ রাজ্যসমূহ, উত্তরাধিকার বিহীন সম্পত্তি, যুদ্ধের লভ্যাংশ, জরিমানা, বাণিজ্য, টাকশাল, বন, উপহারাদি, উত্তরাধিকার সূত্র, লবণ, পেশায় অনুমতি দান, রাজকীয় জনকল্যাণমূলক সূত্র যেমন, সেচ, খাল, মৎসাধার এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক শুল্ক। উপরন্তু ভূমি রাজস্ব থেকে জমির বহুবিধ বিন্যাসের ফলে নানাবিধ কর এবং উৎপাদিত শস্য বা ফসলের উপর কর ধার্যের মাধ্যমেও ভূমিরাজস্ব আদায় হত। ঐতিহাসিক স্মিথ মোরল্যাণ্ড আকবরের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

মোগল সম্রাট আকবর যেমন শাসকরূপে বহু প্রশংসিত তেমনি প্রথিতযশা সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বও ছিলেন। শিল্প ও সাহিত্যে ছিল তাঁর অসামান্য অনুরাগ। রাজদরবারকে ঐতিহ্যশালী করে তোলার জন্যে মহামতি আকবর যে-প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন সম্ভবতঃ ভারতের ইতিহাসে একমাত্র সমুদ্রগুপ্ত ব্যতীত এত অলঙ্কৃত রাজদরবারের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাদি

রামায়ণের বা রামচরিতমানসের স্রষ্টা তুলসীদাস এই সময় আকবরের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তাঁর স্বকীয় সাহিত্য-মাধুর্যকে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৌলিক হিন্দু-সাহিত্য ও কবিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করার মূলে ছিল প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি সম্রাটের অতিশয় অনুরাগ এবং সরকারী নীতি। হিন্দি সাহিত্যের প্রতি আকবরের উৎসাহ সাম্রাজ্যে এত গভীরভাবে রেখাপাত করে যে তাঁর মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরও এই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

রামচরিত-মানস, তুলসীদাস

সঙ্গীতকলা সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ করে। সঙ্গীতের প্রতি ছিল সম্রাটের অকুণ্ঠ অনুরাগ

এবং সঙ্গীতকলা সম্পর্কে তাঁর ছিল সবিশেষ জ্ঞান।

আকবরের দরবারে মিঞা তানসেনের অন্তর্ভুক্তি দরবারের মর্যাদা ও গৌরব অভূতরূপে বৃদ্ধি করে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তানসেনকে যুগাবতাররূপে বর্ণনা করে বলেছেন যে, আবহমানকালেও ভারতে এই পর্যায়ের সঙ্গীত বিশারদ সৃষ্টি হয়নি। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আকবরের বিশেষ আগ্রহ ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তাছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, অথর্ব বেদ, লীলাবতীর গণিতশাস্ত্র ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। এছাড়া গ্রীক ও আরবী সাহিত্যেরও সংস্কৃত অনুবাদ হয়। এই অনূদিত মূল্যবান সাহিত্য-গ্রন্থগুলি উপযুক্তভাবে আগ্রায় অবস্থিত রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল।

তানসেন

সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ

নিরক্ষর আকবর তাঁর পূর্বসূরীদের অনুগামী হয়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের প্রসারতা ঘটিয়ে গ্রন্থাগার জগতে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আগ্রার রাজকীয় গ্রন্থাগারে বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষিত মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সংখ্যা চব্বিশ হাজারের কাছকাছি। আকবর যান্ত্রিক মুদ্রণব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্ষম না হলেও সমসাময়িককালের বিশিষ্ট হস্তলিপি বিশারদের মাধ্যমে অমূল্য গ্রন্থাবলীগুলি নানাভাবে অঙ্কিত চিত্রাদির দ্বারা রক্ষিত ছিল।

গ্রন্থাগারের উন্নতি

বিশিষ্ট হস্তলিপি বিশারদগণ সম্রাট আকবর কর্তৃক সমাদৃত হতেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজল আট ধরনের হস্তলিপির উল্লেখ করে এই শিল্পের প্রতি সম্রাটের অনুরাগের কথা প্রকাশ করেছেন। বিশিষ্ট হস্তলিপি বিশারদ মহম্মদ হোসেন 'গোল্ডপেন' (জারিন্-কলম) উপাধিতে ভূষিত হন।

আকবরের রাজত্বকালে চিত্রশিল্পে এক অভিনব বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। রাজত্বের প্রথমভাগে বিলাসবহুল চিত্রশিল্প বিকাশে মনোনিবেশের সময় না থাকলেও পরবর্তীকালে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হয় প্রখ্যাত ইন্দো-পারসিক চিত্রশিল্পের মাধুর্যময় রূপায়ণে । এ যাবৎ ভারতে কেবলমাত্র পারসিক চিত্রশিল্পেরই প্রাধান্য ছিল। আকবরের সুযোগ্য চিন্তাধারায় প্রকাশ পায় সুষম ভারতীয় ও পারসিক চিত্রকলা শিল্পের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ফতেপুর সিক্রিতে এই সমস্ত চিত্রকলার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাটের শৈশবে নিযুক্ত চিত্রশিল্পের শিক্ষক আবদুল সামাদের প্রচেষ্টায় এক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় ইন্দো-পারসিক শিল্পের সমন্বয়ের নিদর্শন। সতের জন শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রকলা লণ্ডনের প্রধান চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। আজও সেগুলি মানুষের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করছে। আকবরের চিত্রশিল্পের প্রতি উৎসাহের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় ফতেপুর সিক্রির দেওয়ালে অঙ্কিত ফ্রেস্কো চিত্রশিল্পের নিদর্শনের মাধ্যমে।

ভারতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিদ্বেষমূলক আবহাওয়া আকবরের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তিনি সর্বান্তঃকরণে অনুভব করেছিলেন যে ভারতের ঐতিহ্যসম্পন্ন ও উন্নত হিন্দুসমাজে ইসলামকে জাতীয় ধর্মে রূপান্তরিত করলে কখনই তা মঙ্গলজনক হবে না। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা ও বিবেচনার মাধ্যমে আকবর বুঝেছিলেন একমাত্র কোন সমন্বয়বাদী ধর্মমতই এদেশে গ্রহণযোগ্য হতে

ধর্মীয় ক্ষেত্রে

পারে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি ধর্মীয় সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তাঁর ধর্মবিষয়ক চিন্তাধারাকে উত্থাপিত করেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদৎখানায় সর্বধর্মসভা আহ্বান করেন। তাতে যোগ দেন বিশিষ্ট হিন্দু, খ্রীষ্টান, পার্শী ও সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ। এঁদের সকলের সঙ্গে নিবিড় আলোচনায় আকবরের উপলব্ধি হয়—সকল ধর্মের শেষকথা বা মূলকথা মূলতঃ অভিন্ন। তাঁর ভেতর সর্বধর্মসমন্বয়ের সঙ্কল্পই দৃঢ়মূল হয়। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে নিজস্ব বিশ্বাস ও অনুভূতিপ্রসূত নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তা-ই দীন-ই-ইলাহি।

'দীন' শব্দটির অর্থ পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিভ্রা ি র সৃষ্টি করে। কারণ, তাঁর আকবরের এই দীন-ই-ইলাহি মতবাদকে একটি ি ন্নধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি কোন ভিন্ন ধর্মমতই নয়। কারণ, এর উপাসনার জন্যে নির্দিষ্ট কোন মন্দির বা মসজিদ ছিল না। অথবা এর উপর কোন ধর্মীয় পুস্তক বা নির্দেশাদি রচিত হয়নি। এই মতবাদে ঈশ্বরের একাত্মতাকে স্বীকার করা হয়। এই ধর্মমত পালনের জন্যে ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল না। আকবর এই ধর্মে আকৃষ্ট করার জন্যে কোনপ্রকার প্রয়াস দেখান নি।

দীন-ই-ইলাহি মতবাদ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা বিতর্কের সূচনা করে। ঐতিহাসিক স্মিথের মতে এই মতবাদের সৃষ্টি হয় এক হাস্যকর দম্ভের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে এবং এটি অনিয়ন্ত্রিত স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবের ভয়ঙ্কর প্রকাশ। দীন-ই-ইলাহিকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ আকবরের বিজ্ঞতার পরিবর্তে মূর্খতার প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। যদিও ডঃ স্মিথ আলাদা ধর্ম না বলে সুফীবাদের ন্যায় একটা তত্ত্ব হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবু এক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া আকবরের মূর্খতারই পরিচায়ক।

যাইহোক, এই আদর্শস্থানীয় কর্মসূচীকে রূপায়িত করার পক্ষে এই ধর্মমত যুগোপযোগী ছিল না। তবু এ ধরনের প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

আকবরের আমলে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের সুনিপুণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্থাপত্য শিল্প

সর্বধর্মের প্রতি নিরপেক্ষতার আদর্শ সম্রাট আকবরের আমলে স্থাপত্যশিল্পীদের নিজপ্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে কোন বাধার সম্মুখীন হতে দেয়নি। এই সময় স্থাপত্য-শিল্পীগণ নিজেদের স্বাধীন চিন্তাধারা অবলম্বনে নিজেদের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিতে পারতেন। স্বভাবতই আকবরের সময় নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে বিভিন্ন জাতির স্বকীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে। আকবর নিজেও ছিলেন নিখুঁত ও নিপুণ স্থাপত্য শিল্পের উপাসক, তাঁর সময় নির্মিত হুমায়ুনের সমাধি, গোয়ালিয়রের মহম্মদ ঘাউসের সমাধি, ফতেপুর সিক্রির অনবদ্য স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। বুলন্দরওয়াজা, সন্ত সেলিম চিস্তির দরগা এবং ফতেপুর সিক্রির বিভিন্ন অংশে নানাধরনের স্থাপত্যকলা সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বলে আজও বিদিত।

সর্বশেষে এককথায় বলা যায় যে আকবরের সময়ে সৃষ্ট স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় স্থাপত্য শিল্প রূপায়ণের সূচনা বলা যেতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান

শাসক জাহাঙ্গীর ঃ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় ভাস্বর ঘটনাবহুল মোগল রাজতন্ত্রের তৃতীয় সম্রাট জাহাঙ্গীর শাসকহিসেবে কোন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দাবি না করলেও মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে তিনি মুখ্য ঐতিহাসিক আলোচ্য বস্তু। মোগলযুগের প্রথম সারির ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক না হয়েও জাহাঙ্গীরের ঐতিহাসিক গুরুত্বলাভের পিছনে ছিল ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণাবলী। তাঁর প্রতি ঐতিহাসিকদের জালিয়াতী এবং পরিব্রাজকদের বর্ণনায় অবিচারের জন্যেই বোধহয় তাঁর যথাযোগ্য মূল্যায়ন হয়নি। তাঁর চরিত্র বর্ণিত এবং বিশ্লেষিত হয়েছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্তভাবে সংযোজিত তথ্যাদির ভিত্তিতে। একদিকে পিতার অর্জিত গৌরবের ঔজ্জ্বল্য অন্যদিকে পুত্রের অতীব জাঁকজমকপূর্ণ রাজত্বকাল পরিপূর্ণভাবে তাঁর যশ প্রতিভাত হতে দেয়নি। এককথায়, পূর্বসূরী মহান আকবর এবং উত্তরসূরী মোগলযুগের জাঁকজমকের স্রষ্টা শাহজাহান জাহাঙ্গীরকে উপচ্ছায়ার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

জাহাঙ্গীরের সামগ্রিক জীবনের আলোচনাকালে তাঁর যৌক্তিকতাবাদ, দয়া, অনাবিল পারিবারিক স্নেহ, সকলের প্রতি প্রশ্নাতীত বদান্যতা, উৎপীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো তেজ এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিকতার পুরোপুরি সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর মানবতাবোধ, অমায়িকতা এবং সরলহৃদয়তা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরকে একজন আস্তিক হিসেবে চিহ্নিত করে বলা যায় যে আন্তরিকভাবেই তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন এবং ঈশ্বরের প্রতি পরিপূর্ণ মনোনিবেশের মধ্যে দিয়ে আনন্দ লাভ করতেন। বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত বিশ্লেষণে তিনি সুফীবাদ বা বেদান্তবাদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। সম্ভবতঃ ধর্মান্ধতার কলুষতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

ধর্মীয় নীতি অনুসরণে জাহাঙ্গীর প্রকৃতপক্ষে খুব গোঁড়া ছিলেন না। কারণ, তিনি জানতেন ধর্মীয় গোঁড়ামি সাম্রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। তাই কোনক্ষেত্রেই এই ধরনের ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর শাসনকালে সহ্য করা হত না বরং তা কঠোর হস্তে দমন করা হত। অধ্যাপক ব্ল্যাকমেন জাহাঙ্গীরকে একাধারে একনিষ্ঠ মুসলমান, সরল হিন্দু ও নিঃসন্দেহে একজন পার্শী হিসেবে বর্ণিত করেছেন। ঐতিহাসিক 'রো'-র (Roe) মন্তব্য অনুসারে জাহাঙ্গীর ছিলেন সমস্ত ধর্ম সম্পর্কেই উদার। সিংহাসনে আরোহণের পর কিছু অনুরাগীদের চাপে ইসলাম ধর্ম সমর্থন করার প্রতি তাঁর প্রবণতা কিছুকালের জন্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পিতা আকবরের নির্ধারিত সকলের প্রতি শান্তিরক্ষা করার নীতির প্রতি অবিচল বিশ্বাসের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর লিখিত ডায়েরীর পাতায়।

শাসকরূপে জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। শাসনক্ষেত্রে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করাই সুবিবেচিত পথ বলে জাহাঙ্গীর মনে করতেন। ঐতিহাসিক হেনরী ইলিয়ট অভিযোগ করে বলেছেন যে, বিশেষতঃ জাহাঙ্গীরের আমলে বিখ্যাত নিয়মনীতি

সমূহের মধ্যে কোন মৌলিকতা ছিলই না, উপরন্তু বাস্তবে এগুলো কার্যকরীও ছিল না। জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে এই উপরোক্ত প্রথম অভিযোগটি কি সত্যাই নিন্দনীয়? শাসনতন্ত্রে মৌলিকতার বৈশিষ্ট্য খুবই বিরল। এমনকি আকবর বা শেরশাহেরও এ ব্যাপারে বৈশিষ্ট্য খুব একটা ছিল না। শাসক ও কূটনীতিকের পরীক্ষা হয় মৌলিকতার পরিবর্তে ধারণা ও কার্যকরী করার পদ্ধতির মাধ্যমে। বিরাট এলাকার উপর কর্তৃত্বধারী মধ্যযুগের কোন সরকারই তাঁর কর্তৃত্বকে রাজ্যের দূরবর্তী সীমান্ত পর্যন্ত যথার্থভাবে কার্যকরী করতে সক্ষম হয়নি। বরঞ্চ জাহাঙ্গীরের শাসনকালে স্বাস্থ্যের অবনতির পূর্বমুহূর্ত অবধি শাসকের পৌরুষ বলে তিনি তাঁর প্রজাদের সরকারী কর্মচারীদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন।

অত্যধিক সুরাশক্তির অভিযোগ এনে সংযম ও মিতাচারকে ছোট করে দেখানোর প্রচেষ্টা প্রচারকদের মানসিক সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। উপরন্তু সে-যুগে কোন রাজপুত্র ও অভিজাতই এই সুরাশক্তির থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল তা অবিশ্বাস্য। শোনা যায়, রাজপুত্র মুরাদ এবং জালালউদ্দিন মামুদ, শাহনওয়াজ খাঁ প্রমুখ অনেক অভিজাতগণ অত্যধিক সুরাপানের দরুণ মারা যায়। প্রজাদের সুরাপান থেকে বিরত থাকতে তিনি উৎসাহ দিতেন। জাহাঙ্গীরের ধূমপান-বিরোধী বক্তব্য দ্বারা তাঁর প্রশংসনীয় মানসিকতা প্রকাশ পায়।

খোজা বা ইউনাক বিক্রয়ের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফরমান জারী করে জাহাঙ্গীর জঘন্য অমানবিক আচরণবিধি বন্ধ করেছিলেন। এই ব্যবসায় জড়িত অপরাধীদের তিনি প্রাণদণ্ডও দেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁর এই মহৎ প্রচষ্টাকে রক্ষা করতে পারে ন নি। কারণ নিজেও খোজা ও ইউনাকীদের নিয়োগ করেছিলেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন যে ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণভাবে রাজকীয় বিধিগুলি মানবতাবোধের আদর্শেই রচিত হত।

রাজনীতিক হিসেবে মেবার ও বাংলায় প্রবর্তিত তাঁর অনুরক্তকরণের নীতি যথার্থ বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। যদিও দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের নীতি ব্যর্থ হয়েছিল তথাপি অনুশোচনা করার কিছু ছিল না; কারণ এখানে সার্থকতা হয়তো সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারকই হত।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবনে ও রাজত্বকালে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশের পিছনে ছিল তাঁর পরিবেষ্টিত পৃষ্টপোষকগণ যাঁরা তাকে স্নেহ করত। এরই পরিণতি স্বরূপ দেখা যায় সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষভাগে জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহ। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পরিচালিত অনুচরগণ প্রকৃতপক্ষে দশবছর তাঁকে পরিচালনা করে। পরবর্তী পাঁচবছর নূরজাহান ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে পরিচালনা করতেন। যদিও সম্রাটের উপর এঁদের প্রভাব তাঁর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি থেকে তাঁকে সরাতে পারেনি তথাপি এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নানা হাঙ্গামার সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যকে আন্দোলিত করেছিল। জাহাঙ্গীর এর দায়িত্ব অস্বীকার করতে না পারলেও তাঁর পক্ষে একমাত্র যুক্তি হল জাহাঙ্গীরের ভগ্নস্বাস্থ্যের সুযোগেই এগুলো ঘটেছিল। এক কথায় বলা যায় যে সম্রাট যদি কোনমতে দৃঢ়তা দেখাতে পারতেন তবে রাজ্যের গৃহযুদ্ধকে তিনি সঠিকভাবেই মোকাবিলা করতে পারতেন।

অবশেষে সাধারণভাবে তার রাজত্বকাল সাম্রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ বলেই আখ্যা দেওয়া যায়। এই সময়ে শিল্প ও বাণিজ্য উন্নত হয়। শিল্পকলা, চিত্রাঙ্কন এবং সাহিত্য উৎকর্ষের চরমে পৌঁছায়। এ সময় তুলসীদাস রচিত রামায়ণ উত্তর-ভারতের মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। তুলসীদাসের রচনার প্র ভাবকে হোমার, বাইবেল, শেক্সপিয়র, মহাকবি মিল্টন সৃষ্ট রচনার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়। দেশীয় ও পারসিক কবিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে গীতি-সাহিত্যের প্রসারকে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'অগস্টী যুগের' সঙ্গে তুলনা করা হয়। রাজনৈতিক প্রভাব অপেক্ষা সংস্কৃতির সাফল্য জাহাঙ্গীরের শাসনকে স্মরণীয় করে তুলেছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লিপি 'জাহাঙ্গীর-নামা' বা 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' প্রভৃতি পুস্তকগুলিতে জাহাঙ্গীরের শাসনকালের এক অনবদ্য বর্ণনা দেখা যায়।

শাসক শাহজাহান ঃ ইতিহাসের প্রবাদপুরুষ মোগলসম্রাট শাহজাহান ছিলেন একঅবিস্মরণীয় কর্তৃত্বের অধিকারী। সমস্ত শাসনতন্ত্রে গতিশীলতার উৎস ছিলেন সম্রাট নিজে এবং সমস্ত পার্থিব কর্তৃত্বের সু-উচ্চ শিখরে। উপরন্তু তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি ছিল

শাহজাহান

ধর্মীয় অনুমোদন। তাঁকে এ জগতে ভগবানের ছায়া হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। স্বভাবতই তাঁর নির্দেশাবলী ছিল জনগণের পক্ষে প্রশ্নাতীত আনুগত্যের প্রতীক স্বরূপ। সমস্ত শাসনতান্ত্রিক বিধির উৎস ছিলেন সম্রাট এবং মুসলিম অনুশাসনের প্রতিপত্তির বাইরে ধর্মসংক্রান্ত বিতর্কিত আলোচনায় সম্রাটের আদেশই ছিল চূড়ান্ত। তাঁর শাসন কাঠামো ছিল সর্বত্রই সম্রাট আকবর-প্রবর্তিত নীতির অনুসরণে রচিত। আবুল ফজলের মতে সম্রাট যুগধর্মকে গ্রাহ্য করে মধ্যযুগীয় প্রচলিত আইন মোতাবেক চলতেন।

লিখিত-আইনের ব্যবস্থা না থাকার ফলে সম্রাট যথেচ্ছারিতার আশ্রয় গ্রহণ করতেন বলে প্রচলিত, কিন্তু মোগল শাসনতন্ত্র-লিখিত নথিপত্রের ধারাবাহিকতা লিপিবদ্ধ আকারে থাকার ফলে প্রধানতঃ এগুলো নিখুঁত ছিল। ফলে লিপিবদ্ধ আইনের অভাববোধ হত না। সেযুগে লিখিত আইন না থাকা পরোক্ষভাবে জনগণের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল; কেননা লিখিত আইনের সুযোগে অসৎ আইনজীবীগণ জনগণের অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে শোষণ করতে পারত না।

শাহজাহানের স্বৈরতন্ত্র যা মোগল শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল, তা সাধারণভাবে সমাজের জনকল্যাণকর মানসিকতার পরিচয় বহন করে। তুলনাগত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সুলতানী আমলে এই মানসিকতার অভাব সুলতানী শাসনের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। তাছাড়া সম্রাট তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কখনই বৈদেশিক অনুমোদনের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এই চিন্তায় উদ্ভূত অতিরিক্ত সুযোগে ভারতের মাটিতে মোগল সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে সক্ষম হয়েছিল। ঐতিহাসিক টেভারনিয়ার (Tavarnier) শাহজাহানকে শাসকের ভূমিকায় সম্রাট অপেক্ষা পিতৃ-কর্তৃত্বের ন্যায় উল্লেখ করেছেন। শাহজাহান মোগল শাসননীতিকে সাম্রাজ্যের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে শাসনযন্ত্রের মধ্যে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ স্তরের প্রবর্তন করে একটা সুবিন্যস্ত শাসন কায়েম করার ব্যবস্থা করেন।

শাহজাহানের রাজত্বকালে প্ররোচনা এবং বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা চালান হয়। কথিত আছে, নয়া ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণকে সম্রাট উপাধি বা সম্মানে ভূষিত করতেন। এক কথায়, শাহজাহান ছিলেন গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার সমর্থক। তবে সম্রাটের এই ধর্ম-অসহিষ্ণুতার নীতি কেবলমাত্র রাজধানীর সন্নিহিত অঞ্চলেই ফলবতী হয়। সাম্রাজ্যের সর্বত্র তা কার্যকর হয়নি। অনেকক্ষেত্রে তিনি হিন্দুদের সঙ্গে আপোসও করেন। সাম্রাজ্যে তীর্থকর আদায়েরও ব্যবস্থা ছিল।

প্রকৃতপক্ষে শাহজাহানের শাসন ছিল পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিকে জাঁকজমক ও ঔজ্জ্বল্যের সমাহার, অপরদিকে সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণুতার আভাস, এই ছিল শাহজাহানের রাজত্বের বৈশিষ্ট্য। মূলতঃ তাঁর রাজত্বকালের উৎকর্ষের দিক প্রকাশ পেলেও রাজ্যশাসনের নানা ত্রুটি সাম্রাজ্যের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। এই ত্রুটিসমূহ ধীরে হলেও ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বে আঘাত করে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

যে-সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি ছিল সামরিক শক্তি, নানা বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতা সেই সামরিক মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছিল। জায়গির প্রথার সম্প্রসারণ এবং আনুপাতিক হারে প্রয়োজনীয় বিভাগীয় তৎপরতার অভাব মনসবদারী প্রথার দক্ষতা খর্ব করে। তাছাড়া এই সময় নাবালকদের মনসব প্রদানের রীতি সাম্রাজ্যের শাসনে শিথিলতা আনে।

প্রয়োজনাতিরিক্ত সেনাবাহিনী সম্প্রসারণ এবং সেই বাহিনীকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে বৈদেশিক অভিযানে সফলতা লাভ করা সম্ভব হত না এবং সমরাস্ত্রের উন্নয়নের অভাবও সেনাবাহিনীর নৈপুণ্য নষ্ট করে। রাজস্বক্ষেত্রে শৈথিল্য সাম্রাজ্যের সম্পদকে বিশেষভাবে আঘাত করে। শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের সংযোগের অভাব উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে তোলে। পর্যটক বার্নিয়ার বলেন, কর্ষিত জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুর্নীতি ও ঘুষ প্রদানের প্রাবল্য এবং সেই সঙ্গে শাসকশ্রেণীর মধ্যে জোরপূর্বক উপঢৌকন গ্রহণ সাম্রাজ্যের আবহাওয়া বিষিয়ে তোলে।

১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহানের রাজত্বকালে দেশে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে শিল্প ও স্থাপত্য

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ঃ সম্রাট আকবরের সময় যে পারসিক ও হিন্দু রীতির সমন্বয় ঘটেছিল জাহাঙ্গীরও সেই ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করেন। জাহাঙ্গীরের আমলে সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি স্থাপত্য শিল্পের এক মহৎ সৃষ্টি। এই সৌধের স্থাপত্যে বৌদ্ধ বিহারের স্থাপত্যশিল্পের প্রভাব দেখা যায়। জাহাঙ্গীর ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এক চিত্ররসিক সম্রাট। তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক চিত্রাঙ্কনের প্রতি। জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় মোগল চিত্রকলা কাংড়া চিত্রশিল্পের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

শাহজাহানের রাজত্বকাল ঃ সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের সুমহান কীর্তি তাঁর স্থাপত্যশিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ। তাঁর আকর্ষণ ছিল স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষে। শাহজাহানের রাজত্বকালে নির্মিত ইমারত ও সৌধগুলি কারিগরীবিদ্যার বাস্তব প্রয়োগের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তাঁর ঐ মহান সৃষ্টিগুলি মানুষকে শুধু আকর্ষণ করেনি প্রতিপন্ন হয়েছে এক অভিনব স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বও। স্থাপত্যশিল্পের এই বিরল সম্পদ ও সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করে। ইতিহাসের সাক্ষ্যের এই উপাদানগুলোর লিখিত বিবরণ নষ্ট হয়ে গেলেও শাহজাহানের অমরকীর্তি অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। বস্তুতঃ সম্রাটের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট এই স্থাপত্যশিল্প ছিল অনবদ্য। একথা সত্য যে ভারতে বিভিন্ন স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে শাহজাহানের রাজত্বকালে।

এই প্রসঙ্গে শাহজাহানের স্থাপত্য-শিল্পের প্রতি অনুরাগ তাঁর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। সৌন্দর্যপিপাসু সম্রাট শাহজাহান শিল্পের এই নতুন সংযোজনের মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ লাভ করতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে একমাত্র স্থাপত্যবিদ্যা ও শিল্পের মান উন্নয়নের মাধ্যমেই শিল্পকলার উন্নতি সম্ভব। তাঁর রাজত্বকালে নির্মিত সৌধগুলি স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।

আজমীরের শেখ মইনুদ্দিন চিস্তির সমাধি সৌধ, দেওয়ানী-আম ও দেওয়ানী-খাস, আগ্রার কেল্লা, মতি মসজিদ, অপরদিকে সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা বেগমের তৈরি জামি মসজিদ, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল তাঁর স্থাপত্যশিল্প-সৃষ্টির অভূতপূর্ব নিদর্শন। এই মহান সৃষ্টিগুলিই তাঁকে ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। তিনি মণিমুক্তাখচিত বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল মোগল সাম্রাজ্যের 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত। অনেকে বলেন ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর ন্যায় শাহজাহানের রাজত্বকালে বাহ্যিক জাঁকজমকের মধ্যেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কিছুটা লুক্কায়িত ছিল।

স্থাপত্যশিল্পের প্রতি শাহজাহানের অত্যুৎসাহী মনোভাব প্রকাশ পেলেও চিত্রকলা শিল্পেও তাঁর পিতা প্রবর্তিত ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। এই চিত্রশিল্পের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মহম্মদ ফারুকউল্লাহ খাঁ এবং অন্যান্য চিত্রকলা পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সম্রাটের দরবারের আসফ খাঁ ও রাজপুত্র দারাসুকো।

শাহজাহান সঙ্গীতশিল্পের একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মৌলিক সঙ্গীতচর্চার

প্রতি তিনি উৎসাহী ছিলেন। তাঁর আমলে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আকবরের সভাসদ তানসেনের জামাতা ও হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ জগন্নাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

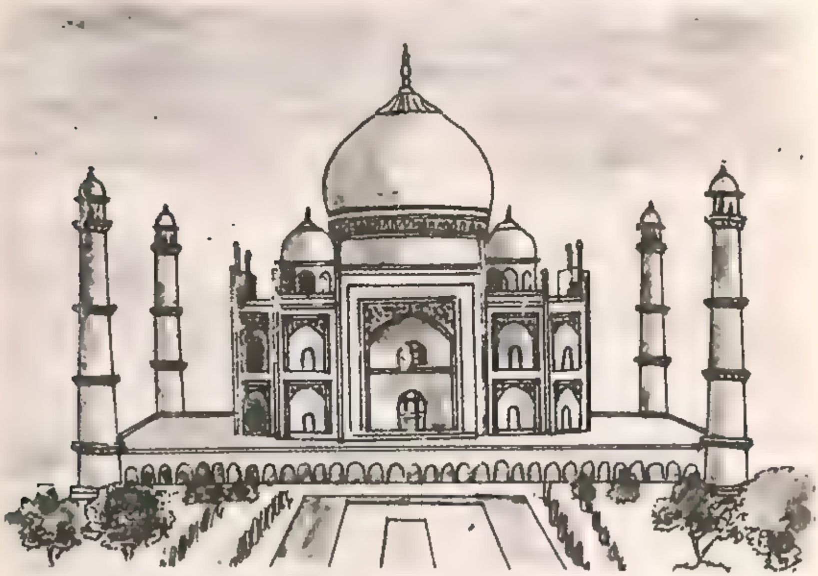

তাজমহল

ইউরোপীয় বণিকদের প্রতি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের নীতি

জাহাঙ্গীর ও বিদেশী বণিকগণ ঃ ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক জাহাঙ্গীরের আমলে উন্নত হয়। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজদের সুরাটে বাণিজ্যাধিকার দেন। ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স-এর দূতরূপে স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন এবং 'ফরমান' লাভ করেন। ড. ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, এই ফরমান ভারতে ইংরেজদের অর্থনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা করে এবং পরবর্তীকালে তা ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবিস্তারের সহায়ক বলেই প্রতিপন্ন হয়।

শাহজাহান ও বিদেশী বণিকগণ ঃ শাহজাহানের আমলে পর্তুগীজ বণিকগণের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি ক্ষুণ্ণ হয়; অপরদিকে ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকদের অবস্থার উন্নতি হয়।

প্রকৃতপক্ষে পর্তুগীজ বণিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শাহজাহানের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না। ওলন্দাজ সংস্থার প্রতি শাহজাহানের প্রীতির নিদর্শন হিসেবে শাহজাহান দিল্লীর দরবারে প্রেরিত একজন ওলন্দাজ কর্মকর্তাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। নীল ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির প্রতিও শাহজাহান সহানুভূতি ও মিত্রতা দেখান। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ড ডেভিজ নামে ইংরেজ কোম্পানির একজন প্রতিনিধি কিছু অভিযোগ ও আবেদন নিয়ে শাহজাহানের দরবারে উপস্থিত হলে সম্রাট পথকর থেকে ইংরেজ বণিকদের রেহাই দেন এবং সুরাট ও সিন্ধুর প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের বিরূপতা ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। এইভাবে তাঁর রাজত্বকালে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঔরঙ্গজেব ও মোগল সাম্রাজ্য

ঔরঙ্গজেব ঃ সম্রাট শাহজাহানের সঙ্কটজনক অসুস্থতার খবর প্রকাশিত হলে সাম্রাজ্যব্যাপী এক আতঙ্কের আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণের মনে পরবর্তী মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতে মুসলমান শাসন প্রবর্তনের পরে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদ ও সংঘর্ষ একটি নিয়মিত ব্যাপার। শাহজাহানের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তবে শাহজাহানের পর উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে যে ভ্রাতৃবিরোধ ও রক্তপাত হয় তা অবশ্যই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শাহজাহানের চার পুত্রেরা প্রত্যেকেই নিজেদের পরবর্তী সম্রাট বলে মনে করতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দারার

শাহজাহানের উত্তরাধিকার সমস্যা

আওরঙ্গজেব

আচার-আচরণে সেইরূপ প্রতিপন্ন হত। কিন্তু দারার মানসিকতা ও শিক্ষাদীক্ষা কোনমতেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার উপযুক্ত ছিল না।

দ্বিতীয় পুত্র সুজা বুদ্ধিমান ও চতুর হলেও বিলাসব্যসন, প্রাদেশিক শাসক হিসাবে তার কর্তব্যে শৈথিল্য এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রতি অনীহার কারণে উত্তরাধিকার লাভ করার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা ব্যক্তিত্ব ছিল না।

উত্তরাধিকার

তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব অন্যান্য তিন ভ্রাতা অপেক্ষা অনেক বেশি চারিত্রিক গুণ ও উৎকর্ষের অধিকারী ছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁর গুণাবলী তাঁকে এই উত্তরাধিকারের যুদ্ধে জয়ী করেছিল।

চতুর্থ পুত্র মুরাদের মধ্যে সকল সৎ গুণাবলীর অভাবের ফলে তাঁর সিংহাসন লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাতুলতা বলে প্রতিপন্ন হয়।

উত্তরাধিকারের যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে দারার বিরুদ্ধে অন্য তিন ভ্রাতার ঈর্ষাপরায়ণতার ফলেই সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে ঐক্যভাব দেখা গিয়েছিল।

একসময় ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের বোঝাপড়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠতার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় ঠিক হয়েছিল উত্তরাধিকারের যুদ্ধে জয়লাভের পর মুরাদকে সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ অর্পণ করা হবে।

ঔরঙ্গজেবের এই ভ্রাতৃবন্ধন বাহ্যতঃ দারার কবল থেকে সম্রাট শাহজাহানকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল কুটিল ছলনা মাত্র। এই অভিসন্ধি তাঁর সিংহাসন লাভের সহজাত প্রচেষ্টার পরিচায়ক। সুজা ও মুরাদকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মধ্যে কতটা আন্তরিকতা ছিল তা বিচার করা খুবই কঠিন। তবে পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করে যে

ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতৃবন্ধনের উদ্দেশ্য

সে-প্রতিশ্রুতি ছিল নেহাতই ভণ্ডামি, কপটতা প্রতারণার নির্লজ্জ প্রকাশ। মুরাদকে সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ অর্পণ করলে আরও বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীনের সম্ভাবনা আন্দাজ করার মতো বিচক্ষণতা ঔরঙ্গজেবের অবশ্যই ছিল। তাঁর দূরদর্শিতা তাঁকে মুরাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে উদ্যোগী করেছিল এবং সঙ্কটের ঝড় কেটে যাওয়ার পরমুহূর্তেই তিনি মুরাদকে কারাবন্দী করলেন। ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিকতার বিচারে তাঁর আচরণ নিন্দনীয় হলেও সিংহাসনলোভী ঔরঙ্গজেবের পক্ষে তা ছিল সফল কূটনৈতিক বোধের পরিচায়ক।

সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার প্রারম্ভেই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। ফলে দারা ক্রমশ তাঁর অবস্থাকে দৃঢ়তর করতে আরম্ভ করেন

দারার অভিলাষ

এবং শাহজাহানের আদেশ ছাড়াই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ শাহজাহানের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা অন্যান্য ভ্রাতাদের মধ্যে আশঙ্কার সূচনা করে। এমনকি গুজব রটে যায় যে বেরার ঔরঙ্গজেবের হস্তচ্যুত করে দারাকে দেবার প্রস্তুতি চলছে। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সংঘর্ষ শুরু হবার পক্ষে এসব ঘটনা অবশ্যই ইন্ধন যোগায়।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় শাহজাহানের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে দাক্ষিণাত্যে ও বাংলায় সম্রাটের কতকগুলি ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে গুজব রটনা হয় এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়

শাহজাহানের মানসিকতা

রাজপুত্র দারার প্রস্তুতি। এই গুজবকে কেন্দ্র করে মুরাদ তাঁর দেওয়ানকে হত্য করেন ও সুরাট লুঠ করেন ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর নিজেকে গুজরাটের শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করেন। দারা ও মুরাদ পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠেন। মুরাদকে কোনমতেই বশে আনা যায় না। উপরন্তু ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। একইভাবে সুজাও তাঁকে বাংলার শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করলেন।

শাহজাহানের কাছে ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের এই কার্যকলাপের খবর পৌছলে তিনি শাস্তিপ্রদানের জন্যে তাঁদের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। কোয়াশিম খান ও যশোবন্ত সিংহের অধীনে দুটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন গুজরাট থেকে মুরাদকে অপসারণ এবং দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরঙ্গজেবের অগ্রগতিকে বাধা দেবার জন্যে। ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে উত্তরাভিমুখী অভিযানের জন্যে পরিকল্পনা হয়েছিল। অবশেষে দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের আজ্ঞাবহ মিরজুমলাকে কারারুদ্ধ করে

ঔরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ বুরহানপুরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন এবং নর্মদা নদী অতিক্রম করে মুরাদের সঙ্গে মিলিত হন। এই সময়ে যশোবন্ত সিংহের অধীনে মোগল রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে ধরমত নামক স্থানে ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর এক রক্তাক্ত সংঘাত বাঁধে।

ধরমতের যুদ্ধ

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে রাজপুতবাহিনীর শৌর্য ও দক্ষতাপূর্ণ যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব প্রায় পরাজয়ের মুখ থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সুসংহতভাবে পরিচালনা করে জয়লাভ করেন। ধরমতের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ভাবেই এই উত্তরাধিকারের যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল সূচিত করে। ঔরঙ্গজেবের সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধি

করে এবং ভারতে তার প্রতিপ্রত্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে সাব্যস্ত হয়। যাঁরা এ যাবৎ অনিশ্চিত অবস্থায় কোন পক্ষকে সমর্থন না করে দোদুল্যমান গণ্ডিতে ছিল তাঁরা নিশ্চিত হয়ে গেল যে চার ভ্রাতার মধ্যে ঔরঙ্গজেবের শ্রেষ্ঠ তাঁকে জয়গৌরব এনে দিয়েছে। তারপর ঔরঙ্গজেব

সামুগোধের যুদ্ধ

বুন্দেলপ্রধানের সাহায্যে চম্বল নদীর ওপারে ভাদওয়ার নামক স্থানে উপস্থিত হলে, দারা আগের জায়গা থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে সামুগোধ নামক স্থানে উপস্থিত হন। উভয় বাহিনীর তুমুল লড়াই হয় এবং দারা পরাজিত হয়ে আগ্রায় পলায়ন করেন এবং ঔরঙ্গজেবের মোগল সাম্রাজ্যাধিপতি হওয়ার স্বপ্ন সফল হওয়ার পথ প্রায় উন্মুক্ত হয়।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাবলী এবং ঔরঙ্গজেবের কূটনৈতিক ও সামরিক দক্ষতা এবং অবশেষে এই উত্তরাধিকারীর যুদ্ধে তাঁর সাফল্য অবশ্যই কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু সিংহাসনলাভের উদ্যম বাসনা ও ভ্রাতাদের প্রতি প্রতারণা এবং অসুস্থ পিতার প্রতি অমানবিক ব্যবহার কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদকে হত্যা, এবং দ্বিতীয় ভ্রাতা সুজার পলায়ন, ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভের পথ সুগম হয়।

সিংহাসনে আরোহণের পর ঔরঙ্গজেব উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়াবার জন্যে এমনকি দাক্ষিণাত্যে ভারতের ভৌগোলিক সীমা বিস্তৃত করার প্রয়াস

সাম্রাজ্য বিস্তার

আরম্ভ করেন। সেনাপতি মীরজুমলার নেতৃত্বে বাংলা সীমান্ত অঞ্চলে মগ ও কোচগণকে দমন করে তিনি বাংলার দক্ষিণ-পূর্বে মোগল আধিপত্য বিস্তৃত করেন। বাংলায় যে অস্থিরতা বিরাজ করছিল তার অবসান হয় এবং পূর্ব-ভারতের বৃহদাংশে শান্তি ফিরে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে শায়েস্তা খাঁর পরিচালনাধীনে আসাম, কুচবিহারের বেশ কিছু অংশ ও আরাকান অঞ্চলে মোগল আধিপত্য স্থাপিত হয়।

ঔরঙ্গজেবের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা তাঁর শাসনকালের প্রাথমিক পর্বে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দেয়। ভারতের নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে দুর্ধর্ষ পাঠান আফ্রিদি ও বরকজাই উপজাতি সম্প্রদায়সমূহ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলার নানাভাবে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা ঔরঙ্গজেব উপযুক্ত চাতুর্য এবং দক্ষতার সঙ্গে উপদলীয় ভেদনীতির প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনবোধে সামরিক শক্তির মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্যের অনুগত করেছিলেন।

ঔরঙ্গজেব সমগ্র ভারতে একক রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই ধরনের চিন্তাকে রূপায়িত করা অবশ্যই সেই সময় সম্ভব হল না।

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তারের জয়যাত্রায় মোগল শাসকগণ অনেকাংশে সফল

অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা

হলেও নানাভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধার অভাব থাকায় প্রকৃতপক্ষে ভারতের গরিষ্ঠ অংশে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পরিপূর্ণ অখণ্ডতা লাভ সম্ভব হয়নি। তা উপলব্ধি করা যায় যখন প্রত্যক্ষ করা যায় যে, বিশাল ঐতিহ্যবাহী শক্তিশালী মোগলসাম্রাজ্য সামান্য কয়েক বছরের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

উত্তর-ভারতের ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা মোগল আমলে বিশেষ করে সম্রাট আকবরের শাসনকালে স্থিরতা ও অখণ্ডতার চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তার মধ্যে ক্রমশ অস্থিরতা ও বিভেদ দেখা দেয়। উত্তর-ভারতে যে শিখশক্তি সেইসময় রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে,

শিখ সম্পর্ক

ঔরঙ্গজেবের ভ্রান্ত নীতি সেই শক্তিশালী শিখগোষ্ঠীকে সংযত করার পরিবর্তে দুর্ধর্ষ করে তোলে। সেজন্য সমগ্র ভারতে শিখ সামরিক শক্তি মোগলদের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে শিখগুরু তেগবাহাদুরের প্রতি ঔরঙ্গজেবের কঠোর ব্যবহার ও তেগবাহাদুরের মৃত্যুদণ্ড

শিখগোষ্ঠীকে পুরোপুরি মোগলবিরোধী করে তোলে। বস্তুতঃ ঔরঙ্গজেব শিখ অভ্যুত্থান দমন করতে ব্যর্থ হন এবং ফলে পাঞ্জাব মোগলদের হাতছাড়া হয়।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজপুতশক্তি মোগল আমলের শুরু থেকেই মোগল সম্রাটগণের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। রাজপুত জাতির বীরত্ব ও শৌর্যের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে সুবিদিত। ঔরঙ্গজেবের পূর্বসূরিগণ রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে সক্ষম হন এবং রাজপুত সামরিক শক্তি মোগল সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে চিরাচরিত মোগল-রাজপুত নীতি গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে তাঁর দূরদৃষ্টির অভাবজনিত কারণে এই রাজপুতদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করেন এবং রাজপুত রাজ্যগুলিকে মোগল আধিপত্যে আনার চেষ্টা করেন। তার ফলে রাজপুতদের মোগল আনুগত্য বিচ্ছিন্ন হয়। ঔরঙ্গজেব প্রথমপর্বে মাড়োয়ারের যশোবন্ত সিংহ ও অম্বরের জয়সিংহকে রাজকার্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, পরে এই নীতি থেকে সরে গিয়ে তিনি রাজপুতদের ওপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপিত করেন এবং রাজপুত-রাজগণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নেন। ঔরঙ্গজেবকে মাড়োয়ার ও মেবারের রাজপুত রাজাগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। রাজপুতদের আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করতে না পেরে ঔরঙ্গজেব মেবারের রানা রাজসিংহের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং জিজিয়া কর প্রত্যাহার করে নেন। ঔরঙ্গজেবের রাজপুতনীতিতে সাম্রাজ্যের সম্পদের অপচয় হয় এবং মোগল সামরিক বাহিনীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

রাজপুত সম্পর্ক

ঔরঙ্গজেব দুর্ধর্ষ জাঠশক্তিকে সম্পূর্ণ দমন করার ক্ষেত্রে সফল হননি। ফলে জাঠ বিদ্রোহ সেই সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। যদিও মোগলগণ জাঠশক্তিকে দমন করতে সমর্থ হলেও ঐ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি।

জাঠ বিদ্রোহ

ঔরঙ্গজেবের বুন্দেল নীতিও বুন্দেলগণকে বিদ্রোহী করে তোলে। এই সময় বুন্দেলরাজ ছত্রশাল মোগল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে মালবে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া পাঞ্জাবের পাতিয়ালার সৎনামী সম্প্রদায় ঔরঙ্গজেবের অন্যায় দমননীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে বহু সামরিক শক্তির ক্ষয় করে ঔরঙ্গজেব এই সৎনামী বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন।

বুন্দেল নীতি, সৎনামী বিদ্রোহ

সর্বোপরি ঔরঙ্গজেবের মারাঠা শক্তির প্রতি অমর্যাদা মোগলদের নিকট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। মারাঠাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ঔরঙ্গজেব মেনে নিতে পারেন নি। ঔরঙ্গজেব মারাঠা শক্তির দুর্বলতার প্রকৃত মূল্যায়ন করতে না পারার ফলে মারাঠাগণের সঙ্গে তাঁর স্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি হয়। মারাঠাদের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সাম্রাজ্যের সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি করে। তাছাড়া এই অঞ্চলের উন্নতি ও শান্তি বিঘ্নিত হয়। মারাঠাদের হাতে বিপর্যয় মোগল সামরিক শক্তির খ্যাতি অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করে। মারাঠাগণ পরবর্তী মোগল অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে লুঠতরাজ ও চৌথ আদায় করে। এভাবে দাক্ষিণাত্যের দুটি মোগল সুবার রাজস্ব আদায় প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

মারাঠাদের সহিত সংঘর্ষ

পরবর্তীকালে উত্তর-ভারতে মারাঠা আধিপত্য বিস্তারের ফলে মোগলদের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আরও দুর্বল হয়ে ওঠে। এই মারাঠা শক্তিকে সর্বশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ধ্বংস করার কাজ সম্পন্ন করার জন্যে সম্রাটকে দীর্ঘ ২৫ বছর দাক্ষিণাত্যে সামরিক প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়। ফলে সমগ্র উত্তর-ভারতে রাজকীয় কর্তৃত্ব অবহেলিত হয় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিশাল অংশে প্রকৃত নজরদারীর অভাবে বৈদেশিক আক্রমণ এবং আঞ্চলিক অভ্যুত্থানের পথ সুগম হয়।

সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে মোগল সামরিক অভিযানের ফলে ঐ অঞ্চলের কৃষিজাত উৎপাদন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রেও তা দারুণ ক্ষতি করে। তাছাড়া সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে অবস্থান উত্তর-ভারতের প্রাদেশিক শাসকগণ স্ব স্ব এলাকায় পূর্ণ প্রাধান্য স্থাপনে তৎপর হয়ে ওঠে। তাই প্রসঙ্গত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার

দাক্ষিণাত্য নীতি

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি নেপোলিয়নের স্পেনীয় নীতির সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে, 'স্পেনীয় ক্ষত যেমন নেপোলিয়নের পতন' ঘটিয়েছিল তেমনই দাক্ষিণাত্যের ক্ষত (Deccan Ulcer) ঔরঙ্গজেবের পতন ঘটায়। দক্ষিণ-ভারতে ঔরঙ্গজেবের ত্রুটিপূর্ণ নীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা নামক দুই শিয়া রাজ্যকে ধ্বংস করা। সম্ভবত এই দুই রাষ্ট্রের সহায়তায় ঔরঙ্গজেববের পক্ষে মারাঠাদের মোকাবিলা সহজসাধ্য হত। দাক্ষিণাত্যে এই দুই রাষ্ট্র নবীন মারাঠাশক্তির ওপর নজরদারের কাজ করতে পারত এবং তাঁদের পক্ষে

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা

এই মারাঠা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ সহজ হত। ঔরঙ্গজেব নিজে সুন্নি মুসলমান হওয়ার ফলে এই শিয়া রাজ্যদ্বয়কে তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। তবে স্যার যদুনাথ সরকার এই ধারণাকে সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। স্বভাবতই তাদের পক্ষে মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হত না। তাছাড়া এই বিশাল ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের পক্ষে সুষ্ঠু পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিল না। কারণ সে-যুগে যোগাযোগ ও রাস্তাঘাটের অভাবে অখণ্ড সংহতি ও কর্তৃত্ব স্থাপন কল্পনাতীত ছিল।

ভারতে বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি বিশেষত ইউরোপীয়গণের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ভারতের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। মোগল সাম্রাজ্যে সপ্তদশ শতকের শেষাশেষি ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে বিশেষতঃ ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে এই আভাস পাওয়া যায়। যদিও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নৌযুদ্ধের কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে; যেমন বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে বর্তমান চট্টগ্রামের সুদূর দক্ষিণ-পূর্বদিকে মগ ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে নৌশক্তির ব্যবস্থা করা হয়। তবে সাধারণভাবে ভারতের এত বিরাট সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষা করার জন্যে যে পরিমাণ ও যে ধরনের নৌশক্তির প্রয়োজন ছিল, ঔরঙ্গজেব সে-সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। স্বভাবতই ইউরোপীয়রা এই সুযোগ গ্রহণে সচেষ্ট হয়।

ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড বলেছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করত। প্রকৃতপক্ষে মোগল শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ এ ধরনের আভাস দিয়েছিলেন। কারণ, মোগল শাসনতন্ত্রে

মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য তাদেরকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে প্রভাবিত করে। প্রসঙ্গত মোরল্যাণ্ড ঔরঙ্গজেবের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ প্রসঙ্গে তার মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করেন।

শাসনব্যবস্থা

ঔরঙ্গজেবের বেসামরিক শাসনব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো তিনভাগে বিভক্ত ছিল। যথা (১) কেন্দ্রীয় (২) প্রাদেশিক এবং (৩) স্থানীয়। তবে প্রথমোক্ত দুটি সুবিন্যস্ত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে উকিল (Vakil), প্রাদেশিক সরকারের প্রধানকে বলা হত সুবেদার বা সিপাহসালার।

মোগল শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল তার সামরিক চরিত্র। এবং সাম্রাজ্যের সমস্ত সামরিক সাংগঠনিক ব্যবস্থা মনসবদারী প্রথার উপর ভিত্তি করেই পরিকল্পিত। ঔরঙ্গজেব এই মনসবদারী প্রথা বজায় রাখলেও তাঁর রাজত্বকালের শেষ অধ্যায়ে এই

সামরিক বাহিনী

মনসবদারী প্রথার মধ্যে গলদ দেখা দেয় এবং মনসবদারী রীতিনীতিতে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। তার ফলেই মোগল সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক ত্রুটিগুলি প্রবল হয়ে ওঠে ও মোগল সামরিক বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে।

ধর্মভীরু ঔরঙ্গজেব ইসলামের অনুশাসনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার জন্যে এবং অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের ফলে ধর্মীয় উদারতার অভাব শাসনকার্যে ও সাম্রাজ্যে পরিচালনার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। আকবর যে-মোগল সাম্রাজ্যকে ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার করে নতুন এক যুগের সূচনা করেন, ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা সেই সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মূলে ঠেলে দেয়। তিনি ভারতবর্ষে অমুসলমান ধর্মাবলম্বীদের উচ্ছেদ করে বা ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে ইসলামীয় রাষ্ট্রে পরিণত করণে উদ্যত হন। ধর্মীয় আচার-আচরণে রক্ষণশীলতা ও সাম্রাজ্যের অমুসলমানদের প্রতি বৈষম্য

ধর্মান্ধতা

ও বিরুদ্ধ আচরণ আকবরের জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে। তিনি আকবর-প্রবর্তিত এলাহিসম্মতের বদলে আরবীসম্মত প্রচারের উদ্যোগী হন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেব নির্দেশনামা জারির মাধ্যমে গুজরাটের সোমনাথ, বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির ও মথুরার বিখ্যাত কেশব মন্দির ধ্বংস করেন। হিন্দুধর্মের আচার-আচরণের ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা ও উচ্চহারে হিন্দুদের উপর কর চাপিয়ে হিন্দু দমননীতি ও হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ চরমাকারে প্রকাশ করেন। মারাঠা, জাঠ, বুন্দেলগণকে তিনি তাঁর ধর্মান্ধতার ফলে বিদ্রোহী করে তোলেন। শিখদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের ফলে শিখ সম্প্রদায়কে মুসলমানবিরোধী করে তোলেন।

ঔরঙ্গজেব ভারতের বাদশাহকে ইসলামের রক্ষক ও প্রচারক বলে মনে করতেন। এবং রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম—প্রাচীন ইউরোপীয় মতবাদের ন্যায় তিনি সাম্রাজ্যে অমুসলমানকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে প্রায় বাধ্য করার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে তিনি নতুন হিন্দুমন্দির তৈরি নিষেধ করলেও পুরানো মন্দির ধ্বংসের অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। বর্তমান ঐতিহাসিকের অনেকের মত হল, তাঁর জমিদারগণের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা, (যেখানে বেশিরভাগ কৃষকই হিন্দু), ব্যাপক হিন্দু অত্যাচারের প্রমাণের অভাব। বিরোধী হিন্দু রাজা বা সেনাপতিদের ক্ষেত্রে বরখাস্ত করার নীতি প্রভৃতি তাঁর পরিপূর্ণ হিন্দুবিদ্বেষের নীতিকে খণ্ডন করে। তবে স্যার যদুনাথ সরকার ও পার্সিভ্যাল স্পিয়ারের

মতে ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতেন। হিন্দুধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখালেও সাধারণ ভাবে তিনি হিন্দু নির্যাতন করতেন এ-ধরনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যুক্তিযুক্ত বলে অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করেন না।

তবে ঔরঙ্গজেবের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বেশির ভাগ সময়েই তাঁর ধর্মান্ধতার মনোভাব প্রকাশ পায়। সাম্রাজ্য শাসন পরিচালনায় ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা অনেক ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থায় নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ভারতের ন্যায় বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্রে রাজকীয় কাজকর্ম এবং শাসনতন্ত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির সূত্রে পরিচালিত হলে অবশ্যই তা দেশের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সম্ভবত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির কূপমণ্ডুকতা ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মিত্রতার বন্ধন অনেকটা শিথিল করে এবং দেখা দেয় ব্যবধান।

ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল বলেছেন, ঔরঙ্গজেব ধর্মের জন্য রাজ্যকে বিপন্ন করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ এবং তদুপরি জিজিয়া কর স্থাপনের ব্যাপারে মারাঠা-নেতা শিবাজী ঔরঙ্গজেবকে তিরস্কারের ভাষায় লিখেছিলেন, 'হিন্দুস্থানের সম্রাট ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রের উপর লোভাতুর নজর দিয়ে তৈমুর বংশের সম্মান নষ্ট করেছেন।' এককথায়, ঔরঙ্গজেববের সিংহাসনারোহণ ভারতের ইতিহাসে ধর্মীয় নির্যাতনের এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল।

ঔরঙ্গজেবের সন্দিগ্ধচিত্ততা এবং শাসনক্ষেত্রে কপটতা তাঁর প্রশাসনিক ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার কীর্তি, কর্মচারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যম ও উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব ও শাসকের অভাবে মোগল সাম্রাজ্যের হাল ধরার মতো ছিল না। ইউরোপের ইতিহাসে প্রবল পরাক্রমশালী প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের মতো নীতি গ্রহণ করার ফলে পরবর্তী শাসকদের যোগ্যতা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ঔরঙ্গজেবের ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের অন্যতম প্রধান কারণ, সকলের প্রতি অবিশ্বাস। রাষ্ট্র শাসনযন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এই অবিশ্বাসের মনোভাব বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিরাট প্রতিবন্ধক।

তাছাড়া সাম্রাজ্যের মূল শক্তি সে সময় গড়ে উঠেছিল রাজনীতি ও সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে এবং সম্রাটের এই দুই ক্ষেত্রে অহেতুক গুরুত্ব সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে।

তবে ঔরঙ্গজেবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নীতি গ্রহণ করার ব্যাপারে অনীহা, তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও উদারতার অভাব ঔরঙ্গজেবের ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক চূড়ান্ত অসফলতার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজত্বকাল শেষ হয়। ভারতে মোগল শাসকদের অন্যতম হয়েও তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে এক বিয়োগান্ত চরিত্রে পরিণত করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু সদ্‌গুণের অধিকারী হয়েও যে সমস্ত শাসক ব্যর্থ হয়েছেন অবশ্যই ঔরঙ্গজেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সে সময় রাজকীয় পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও কলুষিত চরিত্র প্রায় স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হত। ঔরঙ্গজেবের চারিত্রিক দৃঢ়তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। যে মোগল অভিজাততন্ত্রের উপর মোগল সাম্রাজ্যের

ভিত্তি ও দায়িত্ব বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল, ঔরঙ্গজেবের জীবদ্দশার শেষ পর্বে সাম্রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতির আপেক্ষিক ভারসাম্যের অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে নানা গলদ ও ত্রুটি দেখা দেয়। সমস্যাকীর্ণ অবস্থায় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পক্ষে উপযুক্ত তৎপরতার সঙ্গে এই অবস্থা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি।

শিবাজীঃ মারাঠা-নায়ক শিবাজী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মারাঠা রাজ্য স্থাপন করতে হলে তাঁকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বিজাপুর ও মোগলদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। বিজাপুর রাজ্যের তৎকালীন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শিবাজী বিজাপুরের কয়েকটি দুর্গ দখল করেন এবং বিজাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শিবাজী

অতঃপর শিবাজীর পরবর্তী লক্ষ্য ছিল মোগল সাম্রাজ্যের সীমানায় অনুপ্রবেশ করে বারংবার উপদ্রব শুরু করলে মোগল সম্রাটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ হয়ে উঠবে। স্বভাবতই শিবাজী তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী মোগল সাম্রাজ্যে ঢুকে লুঠতরাজ ও উপদ্রব শুরু করলে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীকে দমন করে উদীয়মান মারাঠা শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য দক্ষিণে পাঠান। শায়েস্তা খাঁ মারাঠা অধিকৃত পুনা, চাসান, কল্যাণ স্থানগুলো দখল করেন। এমতাবস্থায় শিবাজী একযোগে বিজাপুর ও মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয় ভেবে বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং মোগলদের বিরুদ্ধে তাঁর পুরো শক্তি প্রয়োগ করতে উদ্যত হন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগলবাহিনী শিবাজীর অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে মহারাষ্ট্র থেকে পলায়ন করে। শিবাজী ইত্যবসরে মোগল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধশালী সুরাট লুঠ করেন ও প্রায় এককোটি টাকা পান।

ঔরঙ্গজেব শিবাজীর অপ্রতিহত গতিকে খর্ব করার জন্যে দুজন দক্ষ সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর-খাঁর অধীনে মোগলবাহিনী প্রেরণ করলেন। জয়সিংহ নানাভাবে কূটনীতির অপপ্রয়োগ ও ভেদনীতির সাহায্য গ্রহণ করে পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করেন এবং শিবাজী উপায় না দেখে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত পুরন্দর সন্ধি স্থাপন করেন। পুরন্দরের সন্ধি শুধুমাত্র জয়সিংহের কূটনৈতিক সাফল্যই এনে দেয়নি সেই সঙ্গে শিবাজীর তেইশটি দুর্গ মোগল অধিকারে চলে আসে এবং বিজাপুরের বিরুদ্ধে

সম্ভাব্য মোগল আক্রমণের ক্ষেত্রে শিবাজী মোগলদের সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

তারপর শিবাজীর সঙ্গে মারাঠা কলহ নতুন মোড় নেয়। শিবাজীকে আগ্রায় নিয়ে আসা হয়, সঙ্গে শিবাজীপুত্র শম্ভুজীকে আনা হয়। ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে উপযুক্ত সম্মান না পেয়ে শিবাজী দরবার কক্ষে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করলে ঔরঙ্গজেব তাঁকে নজরবন্দী করেন। শিবাজী কৌশলে কারাবাস থেকে পালাতে সক্ষম হন। অবশেষে তিনি বহু কষ্টস্বীকারের পর সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর তিন বছর ধরে শক্তি সঞ্চয় ও উপযুক্ত প্রস্তুতির পর তিনি ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট বন্দর পুনরায় লুঠ করেন এবং প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা পান। মোগল সৈন্যদের কাছ থেকে তিনি কোঙ্কন প্রদেশ, পুরন্দর ও আরও কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। ক্রমশঃ তাঁর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে দক্ষিণের জিঞ্জি, ভেলোর প্রভৃতি দুর্গ মোগলদের হাত থেকে অধিকার করেন।

মারাঠা জাতি প্রাচীন ঐতিহ্য ও সামাজিক সাম্য প্রচারের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলে, এই নতুন শক্তির উৎস, শিবাজীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভ করে।

শিবাজী মারাঠাগণকে যে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি দানে সমর্থ হয়েছিলেন তা তাঁকে অমরত্ব দান করে এক নজিরবিহীন অক্ষয় কীর্তির অধিকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঐতিহাসিক গ্রান্ট ডাফের মতে শিবাজীর রাজ্য পরিধি খুব বিস্তৃত না হলেও একটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে ও প্রেরণা দান করে। মারাঠা জাতির জাতীয়তার কর্ণধার শিবাজী ভারতের ইতিহাসে এক প্রবাদ পুরুষ। ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে শিবাজীর রাষ্ট্রনীতি গড়ে উঠেছিল এক মহান আদর্শ ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে। যদিও তিনি দাক্ষিণাত্যে এক সমৃদ্ধিশালী হিন্দু রাষ্ট্রের জনক তথাপি তাঁর ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ মুসলমান প্রজাদের প্রতি যুক্তিপূর্ণ নীতি গ্রহণে সাহায্য করেছিল। শিবাজীর সর্ব বর্ণের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছে।

ভারতের ইতিহাসে শিবাজীর মূল্যায়ন নানাভাবে বিতর্কিত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কাফি খাঁ নামক সমসাময়িক কালের একজন লেখক শিবাজীর লুণ্ঠননীতিকে আলাউদ্দিন ও তৈমুরলঙ্গের হিন্দু সংস্করণ বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ্ ও পার্সিভ্যাল স্পিয়ার শিবাজীকে দস্যুনেতা ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে 'দস্যুরাষ্ট্র' বলে সমালোচনা করেছেন। অপরপক্ষে সরদেশাই ও রাজ দোয়ার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর চরিত্রের নির্মল ও কলুষমুক্ত গুণাবলীর উল্লেখ করে তাঁর লুণ্ঠননীতিকে বিশ্লেষণ করে এটাই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন যে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ; রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ব্যাতিরেকে লুঠ করতেন না যা ছিল, শিবাজীর চারিত্রিক একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁরা পৃথিবীর ইতিহাস উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানই এ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই। শিবাজীর মৌলিক আদর্শ ছিল হয় মোগলবশ্যতা স্বীকার নতুবা মারাঠা জাতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। মধ্যযুগের প্রতিভাবান শাসকদের অন্যতম ছিলেন শিবাজী।

শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে শিবাজী সুনিয়ন্ত্রিত শাসন কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেন।

শাসনের শীর্ষে ছিলেন 'ছত্রপতি' বা রাজা, মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হত অষ্টপ্রধান বা আট প্রধানের মাধ্যমে। পৃথক পরিচালনা ও রাজাকে পরামর্শ দানই তাঁদের কাজ ছিল। প্রধানমন্ত্রী "পেশোয়া" নামে পরিচিত হত। পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সামন্ত, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অমাত্য নামে অভিহিত হত। সমস্ত রাজ্য চারটি প্রান্ত বা প্রদেশ, প্রদেশ আবার কয়েকটি তরফ বা জেলায় বিভক্ত ছিল। প্রতি প্রান্তে বা প্রদেশে একজন শাসন-কর্তা থাকত। জমি জরিপের মাধ্যমে উৎপন্ন ফসলের খাজনা ধার্য হত। প্রজাদের উৎপন্ন ফসলের ১/৩, পরবর্তীকালে ২/৫ অংশ রাজস্ব দিতে হত। প্রতিবেশী রাজ্য থেকে চৌথ (১/৪ অংশ), সরদেশমুখী (১/১০ অংশ) আদায় করা হত। ইংরেজ পর্যটক ফেয়ার এই রাজস্ব নীতিকে শোষণের নীতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। অপরপক্ষে, ফরাসী পর্যটক ভিল শিবাজীর শাসনকে জনপ্রিয় বলে উল্লেখ করেছেন।

মারাঠাদের সামরিক সংগঠন ছিল স্থায়ী সৈনিকদের দ্বারা গঠিত। অশ্বারোহী বাহিনীর দুটি অংশ ছিল—একটি 'বর্গীর' বা নিয়মিত বাহিনী, দ্বিতীয়টি 'শিলাদার' বা অনিয়মিত বাহিনী। শিবাজীর এই অশ্বারোহী বাহিনীই ছিল সর্বাধিক। এছাড়া সেনাবাহিনীতে পদাতিক ও নৌবাহিনীও ছিল। নৌ-সেনাবহরের সংখ্যা ছিল ২০০টি জাহাজ। রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির মূলঘাঁটি ছিল দুর্গ। তাঁর সামরিক শক্তিকে অটুট রাখার জন্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর শিবাজী বলপূর্বক কর আদায়ের ফলে সার্বিকভাবে মারাঠাদের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। তাছাড়া সামরিক বাহিনীর সেনাপতিগণ তাঁর অবর্তমানে স্বার্থপর হয়ে ওঠে।

শিবাজীর ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা কালক্রমে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর্থিক সঙ্গতি বাড়াবার জন্যে কৃষি বা শিল্পের কথা তিনি কখনও ভাবেননি। উপরন্তু মারাঠা কর্তাব্যক্তিদের আচার-আচরণ বাহ্যতঃ একসূত্রে গ্রথিত হলেও অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস প্রথম থেকেই দেখা দেয়। কিন্তু রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত শিবাজীর এই মারাঠা রাষ্ট্রে জাতিভেদ প্রথা চালু থাকায় প্রকৃত জাতীয় ঐক্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ভারতে বিদেশী বণিকদের অনুপ্রবেশ

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্যসংস্থাগুলির দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের দিকে। প্রায় এক শতাব্দীকাল অবধি ভারতের মাটিতে বাণিজ্যিক লেনদেনে নিযুক্ত ছিল পর্তুগীজগণ। কোচিন, গোয়া, দিউ ও দমন ছিল তাদের বাণিজ্যিক কর্মকেন্দ্র। প্রথম থেকেই পর্তুগীজগণ বাণিজ্যিক তৎপরতার পাশাপাশি রাজনৈতিক শক্তি-বৃদ্ধির কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করে। ভারতের সতকালীন রাজন্যবর্গের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে পর্তুগীজগণ তাঁদের শক্তিবৃদ্ধিতে সমর্থও হয়। মোগল শাসকদের কাছ থেকে তারা এ সময় বিশেষ বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে। ভারতে পর্তুগীজগণ ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করলে ভারতীয়গণ এই প্রচেষ্টাকে ঘৃণা করে। দক্ষিণ-ভারতে তাঁদের অবস্থানগুলো মোগলশাসকের আওতার বাইরে থাকার ফলে বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায়

মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দিলে তাদের হুগলীর কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত হতে হয়। তাছাড়া আরব সাগরে পর্তুগীজগণের ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সমুদ্রের ওপর পর্তুগীজদের আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গুজরাটে তাদের প্রভাবও অনেকটা কমে যায়।

পর্তুগীজদের পর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ কোম্পানি ভারতে ব্যবসা করতে এসে ক্রমে পাটনা, চুঁচুড়া, বরাহনগর, কোচিন ও কালিকট, কাম্বে, আহমেদাবাদ, মাদ্রাজের নাগাপট্টম এবং অন্ধ্রের মুসুলিপট্টমে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা সিংহল জয় করে। ভারত থেকে ওলন্দাজগণ প্রধানতঃ নীল, কাঁচা সিল্ক, সুতীর কাপড়, ধাতু জাতীয় পদার্থ ও আফিম রপ্তানি করত।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে বাণিজ্যকেন্দ্র খোলার অনুমতির জন্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ক্যাপটেন হকিন্‌স নামক এক ইংরেজকে জাহাঙ্গীরের দরবারে পাঠান। মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজ দূতের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব দেখান। কিন্তু পর্তুগীজদের চক্রান্তের ফলে হকিন্‌সকে আগ্রা ত্যাগ করতে হয়। মোগল সম্রাটের দরবারে পর্তুগীজ আধিপত্য কমাতে না পারলে ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে ব্যবসা সংক্রান্ত সুবিধালাভ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

১৬১২ এবং ১৬১৪ খ্রীঃ সুরাটের কাছে সোওয়ালীতে পর্তুগীজ নৌ-বহরের কাছে পরাজিত হলে মোগলসম্রাট উপলব্ধি করলেন যে প্রয়োজনবোধে পর্তুগীজদের সঙ্গে সমুদ্রবক্ষে মোকাবিলা করার জন্যে ইংরেজদের সাহায্যলাভ প্রয়োজন। তাছাড়া ভারতীয় বণিকগণ ও ইউরোপীয় ক্রেতাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় লাভবান হবে। ফলে ভারতের পশ্চিম তীরবর্তী অনেক স্থানে কোম্পানিকে কুঠি স্থাপনের অনুমতিদান সংক্রান্ত রাজকীয় ফরমান জারি করা হয়।

ইংরেজগণ এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ রাজকীয় প্রতিনিধি স্যার টমাস রো-কে জাহাঙ্গীরের দরবারে পাঠিয়ে সম্রাটের নৌ-শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমুদ্রবক্ষে ভারতীয় বণিকদের নানাভাবে হেনস্থা করে সম্রাটের কাছ থেকে ভারতব্যাপী সর্বত্র ব্যবসার অনুমতি লাভ করল। টমাস রো-এর সফল উদ্যোগে পর্তুগীজগণ ঈর্ষান্বিত হয় এবং দুই পক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়। অবশেষে ১৬৩০ খ্রীঃ পর্তুগীজগণ পরাজিত হয়। কার্যতঃ এর থেকেই একমাত্র গোয়া, দমন, দিউ ছাড়া সবই পর্তুগীজদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এর ফলে বিদেশীগণের মধ্যে ওলন্দাজ ও ইংরেজগণই লাভবান হয়।

ভারতে বিদেশী কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকারসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো ক্রমশঃ ইংরেজদের ও ওলন্দাজদের হাতে চলে এলে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ১৬৫৪ থেকে ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ ও ওলন্দাজের মধ্যে বহুবার যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে ১৯৭৫ খ্রীঃ ভারত থেকে ওলন্দাজ উৎখাত হয়।

ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়িক আধিপত্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পরোক্ষ প্রয়াস আরম্ভ হয়। ১৬২৫ খ্রীঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের সুরাটের কুঠিকে সুরক্ষিত করার জন্যে চেষ্টা করলে মোগল সরকার বাধা দেয় এবং তা বন্ধ করতে ইংরেজ কোম্পানি বাধ্য

হয়। মোগল নৌ-বাণিজ্য বন্দরকে সমুদ্রবক্ষে নানাভাবে ইংরেজগণ আক্রমণ করলে মোগল সম্রাট সুরাটস্থ ইংরেজ কর্মকর্তাদের শাস্তি প্রদান করে। এইসময় দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের সুবিধাজনক পরিস্থিতি থাকায় মাদ্রাজ ও সন্নিহিত অঞ্চলে ব্যবসার পরিধি বিস্তৃত করে এবং প্রয়োজনে তাদের বাণিজ্য কুঠিগুলিকে সুরক্ষিত করতে উদ্যোগী হয়। ১৬৮৮ খ্রীঃ পর্তুগীজদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বোম্বাইয়ে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয় এবং বোম্বাই বন্দরকে উপযুক্তভাবে ব্যবসা প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে।

ভারতে ইংরেজ কোম্পানি পূর্ব উপকূলের উড়িষ্যাতে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ১৬৩৩ খ্রীঃ। ১৬৫১ খ্রীঃ ইংরেজগণ বাংলার হুগলিতে বাণিজ্য অধিকার লাভ করে। ক্রমশঃ তাঁদের এই সুবিধা পাটনা, বালেশ্বর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেব মারাঠা শক্তির দমনে ব্যস্ত থাকায় ইংরেজ কোম্পানির প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রপাত করে। মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের দুর্ধর্ষ প্রতিপত্তির ফলে বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের কুঠিগুলি অবরুদ্ধ হলে ইংরেজগণ আবার সম্রাটের কাছে আবেদন ও নিবেদনের মাধ্যমে পুনর্বার হৃত অধিকার লাভ করে।

পরবর্তী পর্যায়ে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বল মুহূর্তে সাম্রাজ্য যখন ক্রমশঃ টুকরো টুকরো হতে বসেছে সেই সময় ইংরেজরা আবার জঙ্গী হয়ে ওঠে এবং আগামীদিনের ইউরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road

তৃতীয় অধ্যায়

মোগলদের অধীনে ভারত
(India under the Mughals)

রাজনৈতিক ঐক্য ঃ ভারতে মুসলমান শাসকগণের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা ও বহুবিধ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রভাব দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন যুগের শাসক শ্রেণীর মধ্যে। তবে সাধারণভাবে এটা প্রতিপন্ন হয়েছে যে এই মুসলমান শাসকগণ ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেও পুরোপুরি দেশীয় আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধকে কখনও অমান্য করেছে বা তাঁদের সঙ্গে আনীত বৈদেশিক চিন্তাধারাকে এদেশের মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। কোন দেশের শাসকশ্রেণী, যাদের দেহে ভিন্‌দেশী রক্ত, তাঁরাযদি স্থানীয় মতবাদ ও অনুভূতিকে উপযুক্ত ও বিবেচিত বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁদের আমদানীকৃত মতবাদ ও চিন্তাধারাকে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য ঘটাতে না পারে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঐক্য আনয়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ সেই কারণে ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে মোগল সম্রাটগণই প্রথম যাঁরা উপরোক্ত যুক্তি গ্রহণ করে নিজেদের সর্বাগ্রে ভারতীয় করে তুলেছেন এবং নিজেদের ভারতীয় হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেছেন। ভারতীয়দের কাছে মোগলগণ আগন্তুক ও অপরিচিত। তবু যে মুহূর্তে ভারতের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে, তারা তখন আর নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে মাতামাতি করে নি। কিভাবে ভারতের জনমানসে নিজেদের ভারতীয় বলে প্রতিপন্ন করতে পারেন তার জন্যে নিরলস প্রয়াস চালিয়েছে।

মুসলমান শাসকদের চিন্তাধারা

কার্যতঃ মোগল শাসনকালেই ভারতে রাজনৈতিক ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের একটা সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালান হয়। সম্রাট আকবরই প্রথম মুসলমান শাসক যিনি ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এই আদর্শকে সম্পূর্ণতাদানের জন্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে এই ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খালজী এবং মহম্মদ বিন তুঘলক অনেকটা এগুতে চেষ্টা করেছিলেন, তবে তাঁদের কর্মোদ্যম এ ব্যাপারে ব্যাপকাকারে প্রকাশ পায়নি। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অখণ্ডতা আনয়নের জন্যে প্রয়োজন ছিল সর্বোতমুখী পরিকল্পনা, যার প্রভাবে সর্বজনীন সাহিত্য-শিল্পকলার সৃষ্টি হয়ে প্রবর্তিত হবে সকলের জন্যে একটি গ্রহণযোগ্য সমাজ যা অন্ততঃ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

মোগল আমলে, বিশেষতঃ আকবরের প্রচেষ্টায় তাঁর অভীষ্ট ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের

প্রয়াস আজীবন অব্যাহত থাকে। ফলে তাঁর কুটনৈতিক ও সামরিক তৎপরতায় সমগ্র উত্তর-ভারত ও আহমদনগর অবধি প্রসারিত দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ একটি শাসনব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব হয়। তিনি এই প্রচেষ্টার দ্বারা ভারতের আঞ্চলিক ও জাতীয় এক মহান ঐক্যের সূচনা করেন। তাঁর এই কার্যসূচী রূপায়ণে জনগণের সর্বসম্মত সমর্থন অর্জন করেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'আকবরনামা' নামক গ্রন্থে সম্রাট আকবরের এই মহান প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। আবুল ফজল আকবরের সমগ্র রাজ্যজয়ের প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন যে, এই নতুন তত্ত্ব 'ঐক্যবদ্ধ ভারত' গঠনের উদ্দেশ্য ছিল সমৃদ্ধিশালী, শান্তি ও ন্যায়ের আদর্শে একটি উন্নত সরকার স্থাপনের মধ্যদিয়ে তাঁর স্বপ্ন সফল করা।

ঐক্যবদ্ধ ভারত

মোগল সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সীমান্ত গড়ে তোলার জন্যে তাঁর আপ্রাণ প্রয়াসের ফলে মোগল রাজ্যসীমা উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ, পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও উত্তব-পূর্বে আসামের পার্বত্য এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। স্থলবাহিনীর শৃঙ্খলা ও দক্ষতা যুদ্ধজয়ের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে এবং ফলে সৃষ্টি হয় অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা। বিদেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করত।

আকবরের অবদান

মোগল শাসকগণ সমগ্র ভারতে একটি অভিন্ন শাসনব্যবস্থা কায়েম করে একটি মাত্র মুদ্রাব্যবস্থা, একটি সরকারী ভাষা এবং প্রশাসন প্রবর্তনের এবং সরকারী কর্মচারীর আন্তঃপ্রাদেশিক বদলীর ব্যবস্থা সমগ্র দেশে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

বিজ্ঞানভিত্তিক সীমান্ত

বংশানুক্রমিক জায়গিরদারী ব্যবস্থার বিলোপসাধন করে জায়গিরদারগণকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করে এই গোষ্ঠী, যাতে নিজেদের বহুদিন জায়গির ভোগের ফলে কোথাও স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সচেষ্ট না হতে পারে, সেরূপ দৃষ্টিভঙ্গি মোগল শাসকদের সমগ্র ভারতব্যাপী অভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের নিদর্শন। তাছাড়া আমরা লক্ষ্য করব যে ঔরঙ্গজেবোত্তর অপদার্থ মোগল সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে স্বার্থান্বেষী জায়গিরদারগণ সাম্রাজ্যবিরোধী কাজে প্রয়াসী হয়। ফলে পূর্ববর্তী দক্ষ, দূরদর্শী শাসকদের তৈরি শাসনযন্ত্র বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে ও তৎকালীন ভারতের শাসনতান্ত্রিক তথা রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়।

মোগল আমলে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে সমগ্র দেশে 'স্বৈরতান্ত্রিক জ্ঞানোদ্দীপ্ত' শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়। সাংবিধানিক কাঠামোর সুপরিকল্পিত রূপরেখার উল্লেখ না থাকলেও মোগল শাসকগণ ভারতে ঐক্যবদ্ধ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্যে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকেই অগ্রাধিকার দান করে সমগ্র দেশের শাসনযন্ত্রকে এককেন্দ্রিক করে তোলার চিন্তা করেছেন। যদিও তুলনামূলকভাবে প্রাদেশিক সুবা বা গ্রামভিত্তিক শাসনকাঠামো রচিত হয়েছিল, তথাপি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ও শাসনযন্ত্রই ছিল

অভিন্ন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাদি

সর্বপ্রধান। শাসনকার্যের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় মোগল সম্রাটগণের অধিকাংশই নিজেদের তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ সম্রাট আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে সম্রাট সকল ক্ষমতার আধার হওয়ার ফলে শাসকের ত্রুটি, দায়িত্ব অবশ্যই সম্রাটের ওপর ন্যস্ত থাকবে। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অর্থাৎ সম্রাট ও মন্ত্রিপরিষদের সাংগঠনিক তৎপরতা এমনই কেন্দ্রীয় নজরদারীর সৃষ্টি করে যে আমলাগণ কোনমতেই তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারতেন না। তাছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের সরকারী কাজের নির্ঘন্ট কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে জানানো আবশ্যিক ছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উপযুক্ত জনসংযোগের ব্যবস্থা থাকার জন্যে সর্বোচ্চ শাসক থেকে সাধারণ মানুষ অবধি কার্যতঃ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধীনেই থাকত। কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় শাসনের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা কখনই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে অবমাননা বা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বই সন্দেহাতীত ভাবে কায়েম ছিল। কারণ বহুক্ষেত্রে সম্রাট প্রাদেশিক শাসকগণকেও শাস্তি প্রদানে কোন দ্বিধা করেন নি।

মোগল শাসকগণের অধিকাংশই শাসন যন্ত্রের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখেছেন। সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের একটা প্রবণতা দেখা দেয়। উপযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োগ করার জন্যে যে বিচারশক্তি প্রয়োজন মোগল শাসকগণের মধ্যে তা দেখা যায়। সম্রাটগণের সতর্ক দৃষ্টি থাকার দরুণ মোগল শাসনতন্ত্র সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সরকারী কর্মচারীগণ যাতে স্বাধীনভাবে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে সেজন্যে সম্রাটগণের ভূমিকা ছিল তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণমূলক। সম্রাটগণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে সবসময়ে ধরে নেওয়া হত না। কারণ, অনেকক্ষেত্রে যদি কোনও সিদ্ধান্ত আলোচনার মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনস্থ হত সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হত। গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক বা সামরিক সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গুণাগুণ বিচার করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত।

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস

মোগল আমলে ভূমিবন্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জায়গির ও খলিসা জমি সংক্রান্ত একটি অভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পন্ন হয়। ১৫৮১-৮২ সালের মধ্যে জায়গির নথিভুক্ত জমির পরিমাণ বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়। ১৫৮০-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হস্তান্তরযোগ্য পূর্বতন ভূমিব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন হলে সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ বেতনের পরিবর্তে জায়গির লাভ করেন। ফলে প্রায়শই হস্তান্তরযোগ্য জমির হাত বদলের ব্যবস্থা চালু হয়। এর ফলে হস্তান্তরিত জমির ব্যক্তিগণ নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ফলে জায়গিরদারগণের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ পায়। আকবর এই জায়গির প্রথার ত্রুটিগুলো দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই প্রচলিত জায়গির-ব্যবস্থা কৃষক বা রায়তদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক ছিল।

জায়গীরদারী প্রথা

জায়গিরদারগণ কৃষকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বেশি খাজনা আদায় করতেন। শাস্তিদানের ক্ষেত্রে জায়গিরদারগণ আনুপাতিক শাস্তি পেতেন না। খুব বেশি শাস্তিস্বরূপ জায়গির পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই হত না। তবে এই ত্রুটিগুলো একমাত্র জায়গিরলব্ধ জমির ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হত।

১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে মোগল যুগের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্গঠন শুরু হয়। শেরশাহ-প্রবর্তিত ব্যবস্থার ফলে ফসলের মূল্য কম হওয়ায় কৃষকগন খাজনা মেটাতে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিল। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ পরিপূর্ণ সংস্কার সংঘটিত হয়। সমস্ত খলিসা জমিকে চারটি আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভক্ত করে চারটি রাজস্ব এলাকা চিহ্নিত করে প্রত্যেক এলাকা একজন বিত্তশালী ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয়।

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

মোগল আমলের মধ্যবর্তী সময়ে জমির গুণাগুণ অনুসারে নতুন করে বিন্যাস করে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা চালু করা হয়। ফলে কর্ষিত জমি, কর্ষণযোগ্য জমি পৃথক করে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন পোলাজ, পারৌতি, চাচর ও বনজার। এই খালি জমি জরিপ করে নতুন খাজনা আরোপ করার সময় গড়ে দশ বছরের শস্য ফলনের খতিয়ান বিচার করে ভূমিরাজস্ব আরোপিত হত।

ভূমিরাজস্ব আদায় করা হত শেরশাহের নির্দিষ্ট হারে অর্থাৎ সামগ্রিক উৎপাদনের ১/৩ অংশ। প্রত্যেকটি পরগনার ভূমিরাজস্ব সরাসরি কৃষকদের থেকে আদায় করত। গ্রামের প্রধানকে সরকারি ভূমিরাজস্ব আদায়কারীদের সাহায্য করতে হত। ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মরশুমে আগাম পাওনা সংক্রান্ত নথি বিলি করা হত। ফলে কৃষকগণ জুলুমের কবলে পড়ত না।

ভারতে মোগল শাসক সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদাকে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত করা হয়েছে। সমসাময়িক কালে বহু বৈদেশিক পর্যটক এবং ঐতিহাসিকগণ ভারতে এসেছিলেন এবং অনেকে এদেশে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতায় মোগল শাসনতন্ত্র নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে।

মোগল শাসক সম্প্রদায়

প্রাথমিক পর্যায়ে বহু জেসুইট ধর্মপ্রচারক ও পর্যটকগণ ভারতে আসার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের বিবরণ ওঁদের লেখা থেকে পাওয়া গেছে।

ঐতিহাসিক লেনপুল বাবরকে মধ্য-এশিয়া ও ভারত-লুণ্ঠনকারী যাযাবর জাতি ও রাজকীয় সরকার এবং তৈমুরলঙের সঙ্গে আকবরের যেগসূত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। রেভারেণ্ড ফাদার টমাস স্টিভেন্স নামক একজন ইংরেজ ধর্মপ্রচারক ভারতে এসে বহুদিন গোয়ায় অবস্থান করেন। ইংল্যাণ্ডে পিতার কাছে লিখিত এস পত্রের মাধ্যমে ভারতের সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উজ্জ্ব সম্ভাবনার উল্লেখ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জন নিউবেরী রানী এলিজাবেথ-প্রদত্ত সনদ (১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে)-এর ফলে ভারতে প্রথম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী হিসেবে আগমন করেন। এই সময় ব্যাল্‌ফ ফিচ্ নামে একজন পর্যটক তাদের সঙ্গে ভারতে আসেন। এই বিদেশী পর্যটকগণ তাঁদের বিবরণে মোগল আমলে বিশেষভাবে আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বিবরণ রচনা করে গেছেন। এ-সময় পর্যটকগণ ব্যাপকভাবে পশ্চিম থেকে পূর্ব ও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত যাতায়াত করেন। এই ব্যাপক ভ্রমণ তাঁরা দেখেছেন মোগল শাসকগণের অধীনে ভারতের আইন ও শৃঙ্খলার উন্নত অবস্থা।

বিদেশী পর্যটক

১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নিউবেরীর হাতে রানী এলিজাবেথ আকবরকে সম্বোধন করে একটি পত্র পাঠান। সম্রাট আকবরকে তিনি একজন অপরাজেয় ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বরূপে বর্ণিত করেন। ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণে মোগল আমলের দরবার ও সম্রাটের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

সমসাময়িক কালের পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আসলে প্রধান নগরগুলির সম্পদ ও উন্নয়ন অসাধারণ ছিল।

মোগল শাসনাধীন ভারতবর্ষের জনপথ ও শহরগুলি ছিল বিস্তৃত ও জনবহুল। ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল উন্নত। এই প্রসঙ্গে র‍্যাল্‌ফ ফিচের বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতে মোগল সম্রাটদের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যবস্থাও ছিল সমৃদ্ধ। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে এই সমৃদ্ধিশীলতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

সরকারী নীতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালীন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানাকারণে প্রকৃত বিপত্তিজনক পরিস্থিতিতে মোগল সরকার নানাপ্রকার ত্রাণ ও সাহায্যের কাজ পরিচালনা করতেন। ১৫৯৫-৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত দুর্ভিক্ষের সময় জনগণের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্যে আকবর শেখ ফরিদকে বিশেষ দায়িত্ব দান করে এই ত্রাণকার্য পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কৃষিজমি

ঐতিহাসিক ওল্ডহ্যাম মোগল আমলে কৃষিজমির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির উল্লেখ করেছেন আকবর বর্তমান উত্তর-প্রদেশের (United Province) প্রায় ১/৬ অংশ জমি কৃষিকার্যের আওতায় আনেন।

অন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্য

অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মোগল যুগের কার্যকলাপ পর্যটক ফিচের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়। বহির্বাণিজ্যে মোগলশাসকগণ খুবই উৎসাহ দেখান। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় বিলাসদ্রব্যের বাণিজ্যের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। পর্যটক টেরীর বিশদ বিবরণে এর উল্লেখ আছে। মোগল আমলে চীনামাটির দ্রব্যাদির খুবই প্রচলন ছিল।

সাম্রাজ্যের প্রধান রাজপথগুলিকে বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং পথিকদের জন্যে পথিমধ্যে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন।

ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প

পর্যটক টেরী এই রাজপথগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মোগল আমলে শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে দেখা যায় যে কাশ্মিরী শাল লাহোরে ও কাশ্মীর অঞ্চলে ব্যাপকাকারে তৈরি হত। কার্পেট ও অন্যান্য বস্ত্রবয়নের মূল কেন্দ্রগুলি ছিল আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রিতে। উচ্চমানের সূতীবস্ত্র তৈরি হত গুজরাটের পাতনে এবং খান্দেশের অন্তর্ভুক্ত বুরহানপুরে। বাংলার পূর্ব প্রান্তের জেলা ঢাকার সোনারগাঁ অঞ্চলে সূক্ষ্ম ও উচ্চমানের বস্ত্র উৎপন্ন হত। এছাড়া লবণ, আফিম, সীসা, কার্পেট, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবসা চলত। পর্যটক টেরী বলেছেন, তুলাজাত বস্ত্রে প্রধান কেন্দ্র ছিল বারাণসী। পাটনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে

কাঁচা সুতা, সূতীর কাপড় ও চিনি উৎপাদিত হত। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে ছিল প্রচলিত হস্তশিল্পের নানা কেন্দ্র।

বহির্বাণিজ্য সংঘটিত হত পশ্চিমাঞ্চলে বিখ্যাত সুরাট বন্দরে। পূর্বাঞ্চলে হুগলী নদীর সন্নিহিত সাতগাঁও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার।

টেরীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে বহির্বাণিজ্য শুল্কের হার খুব বেশি ছিল না। স্বভাবতই বিদেশী ব্যবসায়ীগণ আকৃষ্ট হত ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্যে। রূপা খুব বেশি পরিমাণ আমদানি করা হত এবং ব্যবসায়ীদের রূপার ব্যবসা করা নিষিদ্ধ ছিল।

রপ্তানি বাণিজ্যে সূতীবস্ত্র, তুলাজাত বস্ত্র ও নীলই ছিল উল্লেখযোগ্য পণ্য।

বিলাসবহুল পণ্য সম্রাটের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত। নানাধরনের সৌখিন কাচ ও চীনামাটির পাত্রাদি এই সময় বহুল পরিমাণে আমদানি করা হত।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ

মোগল আমলে সাংস্কৃতিক ভাবধারা বিকাশ দেখা দেয় শিক্ষায় নানা সংস্কারের মাধ্যমে। প্রথমত ইসলামী ধাঁচে শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে নতুন শিক্ষাসূচী প্রবর্তন করে শিক্ষাকে সমসাময়িক কালের উপযোগী করে গতিশীল করা হয়। ভারতীয় ভাবধারা, সংস্কৃতি ও দর্শনকে উপযুক্তভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে মোগল আমলে হিন্দির মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করা হয়। ভারতীয় ইতিহাস ও হিন্দু দর্শনের উপর পড়াশুনার ব্যবস্থা চালু হয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহক সংস্কৃত চর্চাও এ সময় সক্রিয়ভাবে শুরু হয়। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে উদার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করে এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল প্রয়োজনভিত্তিক জনশিক্ষার। মোগল আমলে এ ক্ষেত্রে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সমাজের প্রতিটি স্তরে এক নতুন আলো সঞ্চারিত হয়।

ভারতের প্রাচ্য সংস্কৃতিতে নানা সংস্কৃতির সুষম সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন এক প্রাণবন্ত সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়। জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনধারা দেশের মূল জীবনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার ফলে ভারতবর্ষে মোগল আমলে সমাজব্যবস্থায় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান লক্ষ্য করা যায়। সমকালীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুরোধা বহু গুণীজন মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে স্বীয় ক্ষেত্রে তাঁদের সাংস্কৃতিক অবদানে নানাভাবে জনগণকে প্রভাবিত করে বিভেদ, বিচ্ছেদ, কূপমণ্ডুকতা, অশ্লীল ও কুরুচির অবসান ঘটান। সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এক মননশীলতার পরিবেশ, যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ঐক্যবোধ এবং একাত্মতা।

মোগল যুগের স্থাপত্য শিল্প এক অবিস্মরণীয় বিষয়বস্তু। এই যুগের স্থাপত্য নিদর্শন আজও চোখ-ধাঁধানো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে কি প্রভাব ছিল এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। ফার্গুসন নামক এক চিত্রসমালোচক এই স্থাপত্যশিল্পকে মূলতঃ পারস্য-প্রভাবিত বলে বর্ণনা করেছেন। অপরপক্ষে ঐতিহাসিক হ্যাভেল বলেছেন কিছু পরিমাণ বৈদেশিক প্রভাব থাকলেও মোগল শিল্পীগণ একে আত্মস্থ করে প্রায় ভারতীয় করে তুলেছেন। তবে সুলতানী আমলে স্থাপত্যরীতিতে যে ইন্দো-মুসলিম নির্শন দেখা যায় তা মোগল আমলে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

নানা সুদৃশ্য প্রাসাদ দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লা, পানিপথের মসজিদ, কাবুলের জামি-মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হুমায়ুনের আমলে এনামেল করা টালির প্রস্তুত ফতেহাবাদের মসজিদ বিখ্যাত। সাসারামে শেরশাহের সমাধি, আকবরের তৈরি ফতেপুর

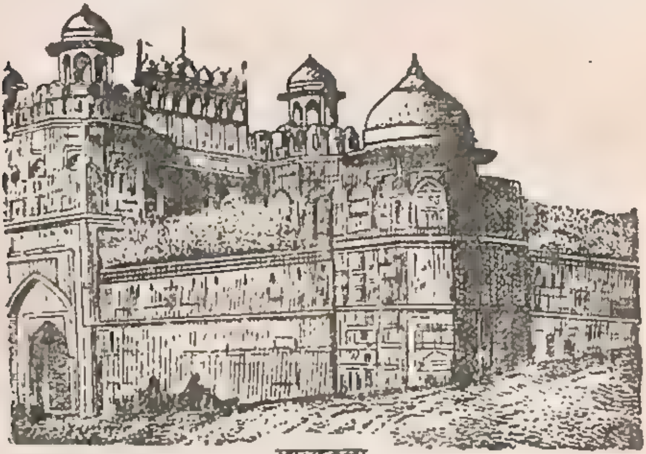

লালকেল্লা

সিক্রি মোগল স্থাপত্য-শিল্পের মহান উৎকর্ষের পরিচায়ক। ডঃ স্মিথের মতে "ফতেপুর সিক্রি হল প্রস্তরে নির্মিত কাব্য"। এছাড়া আগ্রা দুর্গের জাহাঙ্গীর মহল, হিন্দু-স্থাপত্য প্রভাবে তৈরি। ফতেপুরসিক্রির যোধাবাঈ মহল, জামি মসজিদ, বুলন্দরওয়াজা, সেখ সেলিম চিস্তির দরগা বিস্ময়ের বস্তু। জাহাঙ্গীর সেকেন্দ্রায় যে আকবরের সমাধি নির্মাণ করেন তা স্থাপত্যশিল্পের অনবদ্য সৃষ্টি। মোগল সম্রাট শাহজাহান ছিলেন ভারতে মোগল আমলে স্থাপত্যশিল্প বিকাশের অন্যতম ধারক। দিল্লীর দেওমান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, আগ্রার মতি মসজিদ ও জামি মসজিদ প্রশংসার দাবি রাখে। সর্বোপরী শাহজাহান নির্মিত আগ্রার তাজমহল পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। শাহজাহানের কোহিনূর খচিত বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন স্থাপত্য শিল্প ও রুচির এক অমরকীর্তি।

চিত্রশিল্পের স্বাভাবিক বিকাশ মোগল যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই চিত্রশিল্প ত্রিমূখী প্রভাবে সৃষ্ট হয়।

ভারতীয়, পারসিক ও চৈনিক ধারায় প্রকাশিত এই চিত্রশিল্প সমসাময়িক কালে এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি। পাটনায় খুদাবক্স পান্থশালায় রক্ষিত খানদান-ই-তৈমুরিয়া ও বাদসা নামক চিত্রপটগুলি এই ত্রিমুখীধারার বিকাশ। চিত্রশিল্পে মোগল-সম্রাট আকবরের অত্যুৎসাহী মনোভাব প্রকাশিত হয়। এই আমলের চিত্রগুলির মধ্যে চিঙ্গীজনামা, জাফরনামা, রামায়ণ, নল দময়ন্তী, কালীয়দমন প্রভৃতি চিত্রগুলি বিখ্যাত। জাহাঙ্গীর চিত্ররসিক ছিলেন এবং তাঁর সময় চিত্রশিল্পের মধ্যে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক শিল্পের প্রকাশ বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। মোগল যুগে রাজপুত চিত্রকলা ও পাঞ্জাবের কাংড়া চিত্রকলা শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় এবং এগুলো আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই চিত্রশিল্পের

স্থাপত্য শিল্প

মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও পুরানের কাহিনী নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ঔরঙ্গজেব ব্যতীত অপরাপর মোগল সম্রাটগণ ছিলেন সঙ্গীত শিল্পে আকৃষ্ট। আকবরের সময় তাঁর দরবারে আনুমানিক ৯০ জন সঙ্গীত শিল্পীও সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। এঁদের মধ্যে তানসেন ছিলেন শীর্ষস্থানীয়; তাছাড়া রাজবাহাদুর ছিলেন একজন দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ। মোগল আমলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিশেষভাবে প্রসার ঘটে। জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে তানসেনের জামাতা সঙ্গীতশিল্পীর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। শাহজাহানও ছিলেন সঙ্গীতপিপাসু ও রসিক।

চিত্রকলা

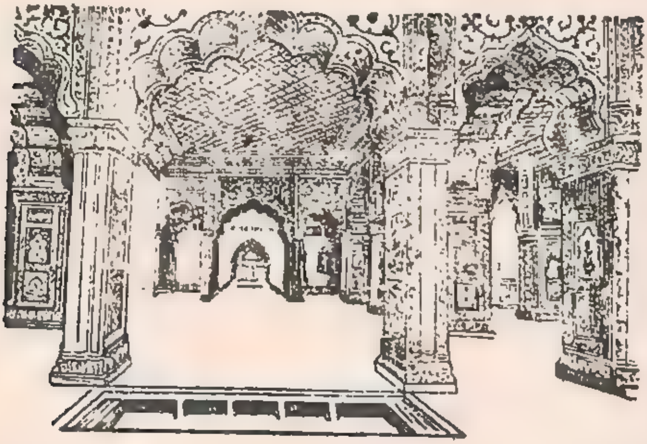

দেওয়ান-ই-খাস

সাহিত্যের ক্ষেত্রে মোগল যুগ এক নতুন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করে। সাহিত্য-সৃষ্টি ও ইতিহাস রচনা ছিল এ যুগের বৈশিষ্ট্য। ফার্সি ভাষায় রচিত বিভিন্ন রচনাবলী সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

সঙ্গীত

অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি সম্ভব হয়েছিল মোগল শাসকগণের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়। আকবরের আদেশে বাদাউনী বাল্মীকির রামায়ণ ও মহর্ষি ব্যাসের মহাভারতের কিছু অংশ ফার্সী অনুবাদ করেন। হাজি ইব্রাহিমের অথর্ব বেদের অনুবাদ, ফৈজীকৃত লীলাবতীর গণিতের অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শাহজাহানের আমলে ভাগবদ্‌গীতা ও উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ অনবদ্য সৃষ্টি।

কবিতা ও গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ফৈজীর কাব্যগ্রন্থ, খিজাকীর কাব্য, নাজিরির গজল, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী—তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি, আবদুল হামিদ লাহোরীর বাদশানামা, দারাসিকোর দার্শনিক রচনাবলী গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সৃষ্টি। ঔরঙ্গজেবের রচিত ফতোহা-ই-আলম-গিরি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম।

সাহিত্য

মোগল আমলে ভারতেই ঐতিহাসিক তথ্যাদি সম্বলিত রচনাগুলো সমধিক প্রসিদ্ধ। এগুলোর মধ্যে ফার্সী রচনা বাবরের আত্মজীবনী, গুলবদন বেগমের হুমায়ুননামা, মোল্লা দাউদের তারিখ-ই-আলাফি, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদ সাহিত্য

সম্ভবতঃ মোগল আমলে হিন্দী সাহিত্যের বিকাশের ফলে ভারতের এক বৃহৎ আঞ্চলিক সংস্কৃতি উন্নত হয়। হিন্দীবলয়ের এই আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আকবরের উদারতা ও নিরপেক্ষ মানসিকতায় ভারতে হিন্দী সাহিত্যিকদের নবজীবন সম্ভব হয়েছে। বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন টোডরমল, রাজা ভগবান দাস, মানসিংহ, বীরবল ও আবদুল রহিম খান-ই-খানান। আকবর কবিখ্যাতির স্বীকৃতি স্বরূপ বীরবলকে 'কবিপ্রিয়' উপাধি প্রদান করেন। হিন্দী ভক্তি-সাহিত্যের অমরস্রষ্টা তুলসীদাস তার বিখ্যাত 'রামচরিতমানস' মোগল আমলে রচনা করেন। সুরদাস তাঁর ভজন গানগুলি ব্রজবুলিতে রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এই ব্রজবুলির জনপ্রিয়তা অর্জন আঞ্চলিক সংস্কৃতির উৎকর্ষতারই পরিচায়ক।

হিন্দী সাহিত্য

আঞ্চলিক সাহিত্য-সংস্কৃতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মোগল যুগে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলা রচনায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি হল বৈষ্ণব পদাবলী, কৃষ্ণদাসের কড়চা, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, কাশীরাম দাসের মহাভারত। মোগল আমলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিকাশের ফলে সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির অভিন্ন ভাণ্ডারে এগুলির অবদান অনস্বীকার্য।

তৃতীয় পর্ব

ভারতবর্ষের ইতিহাস

আধুনিক যুগ (১৭০৭-১৮৫৭)

HISTORY OF INDIA : 1707—1947.

(1). Decline and integration of the Mughal Empire—beginning of the process during Aurangzeb's time—threats to the Mughal Empire from different quarters—drain on the imperial finances due to wars—implications of the fast increasing jagirs, while the revenue income did not increase—increased factionalism in the Mughal Court—different parties and factions—Weakness of the successors of Aurangzeb—power struggle—the nobles etc. further consolidated their powers—Central control over the different Subas and regions gradually disappeared,—effects of the invasion of Nadir Shah.

(2). Growth of regional powers (emphasis on those, whose encounters with the British affected the later political scene)—

(i). The regions to be particularly studied—Bengal, Hyderabad, Mysore, Awadh, the rise of the Sikhs up to Guru Govind.

(ii). Growth and decline of the Marathas (till 1761)—Expansion of the Maratha Power—Third battle of Panipath (1761)—its impact.

(3). Growth of European Commerce and conflict among European trading Companies—Anglo French conflict—Carnatic : the first area of conflict—Effects of the Anglo-French rivalry in Europe and elsewhere—War of Austrian succession and Seven Years' War—Reaction of Carnatic rulers to the growing conflict—Result of the Wars—causes of French failure.

(4). Growth of English East India Company's Commerce and political power in Bengal till 1765—Growth of English trade in Bengal in the first half of 18th Century—Farman of 1717—frictions with the Nawabs—conflict between the English and Siraj from 1756 to Plassey—its results—conflict with Mir Qasim : Buxer (1764)—Dewani (1765).

(5). 1767—1857

British Imperial Expansion :

(The War operations to be described as briefly as possible. The main stress should be given on (a). The British Motives, (b). The decisive factors in the British victory)—

(a) Marathas (one long narrative).

(b) Mysore (one long narrative).

Subsidiary Alliance (1798) as an instrument of British political control.

(c) Other conquests, (excluding relationship with the Sikhs—Anglo—Sikh relations till the death of Ranjit Singh.

(d) Annexation of the Punjab.

(e) Dalhousie and British imperial expansion—Novel features.

(6) Administrative Foundations :

(i) Nature of the growth of British political power till 1765 (two short paragraphs)—Implications of Diwani of 1765—and of Diarchy in 1772.

(ii) Growth of centralisation : (Hastings to Cornwallis).

(iii) Organisation of a new and judicial and police system.

(iv) Need for an increased income from land—revenue— Types of arrangements in this connection—their broad effects.

(7). Industry and Trade :

Expansion of India's foreign trade and decl ne of some Indian industries—(To stress, cotton-goods during the period, 1965—1857).

(8). The Cultural Scene :

(i) Brief note on the old educational system : The changes : English Education—Decline of vernacular Education. Contact with western culture.

(ii). A history of social and cultural Movements with special reference to Bengal and Maharashtra.

(9). Peasant unrest and uprisings :

(a). Peasant Rebellions—Ferazi—Wahabi Movement.

(b). Tribal Movements—Kols—Santhals.

(10). The Revolt of 1857—causes :

Extent of popular participation—leadership—Nature of the Revolt.

সিলেবাসের বাংলা অনুবাদ

আধুনিক যুগ

(১৭০৭ খ্রীঃ—১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত)

১) মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঃ জায়গিরের মূল্যবৃদ্ধি ও রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস। মোগল দরবারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ঔরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরাধিকারী। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আমীর ও অভিজাত ব্যক্তিদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।

২) আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঃ (ক) বাংলা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, অযোধ্যা অঞ্চলের উত্থান কাহিনী। গুরু গোবিন্দ পর্যন্ত শিখ শক্তির অভ্যুদয়। (খ) মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ঃ মারাঠা ক্ষমতা সম্প্রসারণ—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)—তাহার ফলাফল।

৩) ইউরোপীয় বাণিজ্য নীতি ও পারস্পরিক সংঘর্ষ—ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ—কর্ণাটক ঃ সংঘর্ষের প্রথম অঞ্চল—ইউরোপে এবং অন্যত্র ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের ফল—অস্ট্রিয় যুদ্ধের সাফল্য এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ—ক্রমবর্দ্ধমান সংঘর্ষে কর্ণাটক শাসকবর্গের প্রতিক্রিয়া—যুদ্ধের ফলাফল—ফরাসী পতনের কারণ।

৪) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারঃ (১৭৬৫ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত ইংরেজ বাণিজ্য বৃদ্ধি। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফারমান। ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের দ্বন্দ্ব। ইংরেজ ও সিরাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ১৭৫৬ পলাশীর যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলাফল—মীরকাশিমের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও বক্সারের যুদ্ধ।

৫) ১৭৬৭-১৮৫৭—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণঃ [যুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সহ (ক) ব্রিটিশ অগ্রগতি এবং (খ) যুদ্ধ-সাফল্যের নিয়ামক সূত্র আলোচনা।]

(ক) মারাঠা (একটি বিশদ বিবরণী)

(খ) মহীশূর দ্বৈত শাসন—ব্রিটিশ রাজনীতি

(গ) অন্যান্য বিজয় (শিখ—ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক বাদে ; রঞ্জিৎ সিংহর মৃত্যু পর্যন্ত)

(ঘ) পাঞ্জাব সম্প্রসারণ

(ঙ) ডালহৌসি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার—মূল ঘটনাবলী।

৬) ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত্তিস্থাপনঃ (ক) দুটি অনুচ্ছেদে ব্রিটিশ রাজনীতির (১৭৬৫ পর্যন্ত) প্রকৃতি বিশ্লেষণ—১৭৬৫-এর দেওয়ানী ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

(খ) কেন্দ্রীকরণ পর্যালোচনা (হেস্টিংস থেকে কর্ণওয়ালিস)

(গ) নতুন শাসন ও বিচার নীতির পর্যালোচনা

(ঘ) ভূমিরাজস্ব থেকে বর্দ্ধিত আয় ও তার বিস্তৃতি পর্যালোচনা

৭) শিল্প ও বাণিজ্যঃ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি—ভারতীয় শিল্পের (মূলত বস্ত্রশিল্প ১৭৬৫-১৮৫৭) আলোচনা।

৮) সংস্কৃতির বিকাশঃ (ক) পুরানো শিক্ষা পদ্ধতি—পরিবর্তন। ইংরেজী শিক্ষা—মাতৃভাষা শিক্ষার রূপরেখা, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব।

(খ) বাংলা ও মহারাষ্ট্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিহাস।

৯) কৃষি-বিদ্রোহ ও তাদের উত্থান

(ক) কৃষক বিদ্রোহ—ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলন

(খ) কোল-সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১০) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহঃ মহাবিদ্রোহের কারণ, বিস্তার—নেতৃত্ব—প্রকৃতি আলোচনা।

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ইতিহাস ঃ (১৭০৭-১৮৫৭)

History of India (1707-1857)

দুইশত কালের প্রবল পরাক্রম ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন মোগল আধিপত্য অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ঐতিহ্যশালী বিশাল সাম্রাজ্যের ক্রমান্বয়ে অবক্ষয়ের ঘটনাসমূহ ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর ত্রুটিগুলিই ভারতের উপর বৈদেশিক শক্তির সাম্রাজ্য বিস্তারের আগ্রাসী দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মৌলিক কারণ

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই দেশব্যাপী অনৈক্য ও অস্থিরতার আবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের অনুসৃত ত্রুটিপূর্ণ নীতি সত্ত্বেও মোগল শাসনব্যবস্থা এবং রাজকীয় সেনাবাহিনী ছিল যথাক্রমে দক্ষ ও শক্তিশালী। সমসাময়িক কালে মোগল রাজতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থাও ছিল অটুট। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই রাজকীয় শক্তি ও স্থায়িত্বের মধ্যে দেখা দিল দুর্বলতা এবং অনিশ্চয়তা।

ঔরঙ্গজেবের ভূমিকা

মোগল সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা মূল্যায়ন করলে এটা প্রমাণ হয় যে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁর নীতিগুলিই মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে বহুলাংশে দায়ী। তাছাড়া ঐ নীতি প্রণয়নে সুচিন্তিত দূরদৃষ্টির অভাব ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে মোগল রাজশক্তির পরিপূর্ণ অন্তর্ধান হয় ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে মোগল সমরশক্তি লুপ্ত হওয়ার পরই, যদিও শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ইংরেজ-আশ্রিত সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছিলেন। প্রায় একশ বছর ধরে এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির কারণ, ভারতীয় জনমানসে মোগল রাজতন্ত্র ছিল রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক।

মোগল রাজতন্ত্রের এই চূড়ান্ত অবক্ষয়ের ইতিহাসকে দু'টি অংশে ভাগ করা যায় যেমন, (১) ঔরঙ্গজেবের দায়িত্ব (২) ঔরঙ্গজেবোত্তর মোগল শাসকদের দায়িত্ব।

ঔরঙ্গজেবের দায়িত্ব ঃ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের আরম্ভ ঔরঙ্গজেবের শাসনকালেই। বিরাট সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েও তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় মোগল সাম্রাজ্যের সীমানাকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে ভারতের ভৌগোলিক রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে উদ্যোগী হলেন। বিপুলসংখ্যক মানুষ এবং প্রভূত রসদের বিনিময়ে তিনি এই আগ্রাসী নীতিকে কার্যকর করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তদানীন্তন যোগাযোগ

ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোয় দেশের সর্বত্র একটা সুবিন্যস্ত ও সংহত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু করা সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই সমগ্র দেশকে একত্রীভূত করে একমাত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বস্থাপন নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য হলেও বাস্তব দিক থেকে তা খুব সহজসাধ্য ছিল না।

ঔরঙ্গজেবের ব্যর্থতার মৌলিক কারণগুলোর অন্যতম হল রাজনীতিক হিসেবে তাঁর ব্যর্থতা। মারাঠাদের পূর্ণ আঞ্চলিক কর্তৃত্বদানের দাবিকে সম্রাট কোনমতেই গ্রহণ করতে পারেন নি। অপরপক্ষে, মারাঠা শক্তির উপযুক্ত পরিমাপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে সম্রাট আকবরও রাজপুতদের ব্যাপারে এক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে রাজপুতদের সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন। অথচ ঔরঙ্গজেবের মারাঠানীতি মারাঠাদের সম্পূর্ণরূপে তাঁর বিরোধী করে তুলেছিল। এখানেই দেখা যায় ঔরঙ্গজেবের প্রকৃত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব। এই মারাঠাশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর নিষ্ফল ও দুঃসাধ্য অভিযান সাম্রাজ্যের সম্পদের অপব্যবহার এবং সেই সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের ব্যবসা ও শিল্পের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। পঁচিশ বছরের বেশি সময় দাক্ষিণাত্যে অবস্থান এবং মারাঠাদের দমনে ব্যর্থতা সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্রকে দুর্বল করেছিল এবং সাম্রাজ্য আর রাজকীয় মর্যাদার হানি ঘটিয়েছিল। সম্রাটের দীর্ঘদিন উত্তর-ভারতে অনুপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল অবহেলিত হয় এবং প্রাদেশিক এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা দেয় এবং প্রত্যেকেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে মারাঠা অভিযান শুরু হলে মোগল শাসনের দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ।

রাজপুতদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বিরোধ মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে আরও দুর্বল করে ও শুরু হয় সমগ্র দেশে বিভেদের রাজনীতি। এবং তারই ফলে হিন্দু এবং উচ্চবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে গড়ে ওঠে একটা বিদ্বেষের আবহাওয়া। প্রাথমিক পর্যায়ে ঔরঙ্গজেব তাঁর পূর্বসূরীদের পথ অবলম্বন করে রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে অগ্রহ প্রকাশ করে মাড়ওয়ারের যশোবন্ত সিংহ ও অম্বরের জয়সিংহকে রাজকীয় বাহিনীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে অদূরদর্শিতার ফলে রাজপুতদের বশীভূত করার জন্যে রাজপুত শক্তিকে খর্ব করার প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যের পক্ষে ধ্বংসাত্মক হয়।

সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু দিল্লীতেই ঔরঙ্গজেবের শাসন সৎনামী, জাঠ এবং শিখ অভুত্থানের জন্যে এক প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়। যদিও এই অভ্যুত্থান জনসংখ্যার দিক থেকে খুব বিরাট না হলেও এতে অংশগ্রহণকারীরা ছিল জনগণের প্রতিনিধিস্বরূপ এবং তারাই কৃষকের মেরুদণ্ড। প্রকৃতপক্ষে তাদের আবির্ভাব হয়েছিল মোগল রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের কৃষকদের উপর অত্যাচারের ফলে। কৃষকদের উপর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষক জমিদার, অভিজাত সম্প্রদায়ের অবর্ণনীয় অত্যাচারের ফলে কৃষকদের অসন্তোষ এদের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছিল ।

ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা এবং হিন্দু রাজন্যবর্গের প্রতি তাঁর অনুসৃত নীতি মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান প্রমুখ সম্রাটদের

রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য মূলতঃ (ক) জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রচলিত ব্যবস্থাদিতে হস্তক্ষেপ না করা, (খ) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং (গ) রাজ্যের উচ্চপদগুলি যেকোন সম্প্রদায় ও অঞ্চলের অভিজাত এবং প্রধানদের কাছে উন্মুক্ত রাখা, রাজপুত-মোগল বন্ধুত্ব এই নীতিরই স্বার্থক রূপায়ণ। ঔরঙ্গজেব সরাসরি এই নীতি পরিবর্তন করে হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন এবং উত্তর-ভারতে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন, হিন্দুদের উপর নানা প্রকার বাধানিষেধ আরোপ করেন। তবে, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলোর মধ্যে ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির প্রভাবকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কারণ তাঁর এই হিন্দু-বিদ্বেষী নীতি তিনি রাজত্বকালের অন্তিমলগ্নে গ্রহণ করেছিলেন—আবার তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তড়িৎগতিতে এগুলোকে রদ করেছিলেন। প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের ব্যবধানে জিজিয়া কর রহিত এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক উন্নতির জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ।

বহু সমস্যার সমাধান অসমাপ্ত রেখে ঔরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজ্যকে যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করেন, তা আরও তীব্র আকার ধারণ করে এবং সাম্রাজ্যে একটা সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি করে তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কোন নীতি না থাকায়, এটা লক্ষ্য করা যায় যে মোগল সম্রাটদের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই সিংহাসন লাভের জন্যে রাজপুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হত । কিন্তু অষ্টাদশ শতকের এই উত্তরাধিকারের যুদ্ধ মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলকে প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। ফলে সাম্রাজ্যের লোকবল এবং সম্পদ অহেতুক নষ্ট হয়। ক্রমান্বয়ে গৃহযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো খুবই দুর্বল হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের-মেরুদণ্ড অভিজাত সম্প্রদায়গণ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ায় রাজশক্তির মূলে আঘাত আসে। স্বভাবতই এই অনিশ্চিত পরিস্থিতি এবং কেন্দ্রে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সুযোগ গ্রহণ করে বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং স্থানীয় প্রধানগণ স্ব স্ব শক্তিকে শক্তিশালী করতে উদ্যত হন এবং তাঁদের স্বার্থকে কায়েম করার জন্যে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন ও বংশানুক্রমিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

ঔরঙ্গজেবের শেষ পর্যায়ের দুর্বল শাসননীতি এবং পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারের যুদ্ধের কুফলগুলি এতটা প্রকট হত না বা হয়তো ঐ অবস্থা কাটিয়ে ওঠা যেত যদি পরবর্তী শাসকগণ উপযুক্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং পরিশ্রমী হতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখা যায় যে বাহাদুর শাহের স্বল্পকালীন শাসনের পর আরম্ভ হয় অপদার্থ, দুর্বল চরিত্র এবং বিলাসপ্রেমিক শাসকদের অপশাসন। একনায়কতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজন্যবর্গের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব অবশ্যই সার্থক শাসনের চাবিকাঠি। ঔরঙ্গজেবোত্তর মোগল সম্রাটদের কম বেশি প্রত্যেকেরই চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব বলতে কিছুই ছিল না।

অভিজাতদের নৈতিক অধঃপতন

মোগল সম্রাটগণের ব্যক্তিত্ব ছাড়াও সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়েছিল অভিজাতদের সংগঠন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে। সম্রাটদের বহু দুর্বলতা রাজানুগত যোগ্য অভিজাতদের জন্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিজাতদের চারিত্রিক অধোগতি ঘটে এবং তাঁদের জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে উচ্ছৃঙ্খল। নতুন অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টির

পথ আর উন্মুক্ত রইল না এবং সমকালীন অভিজাতরা এই অজুহাতে রাজকীয় পদ এবং সুযোগ সুবিধাগুলি একচেটিয়া ভাবে নিজেদের কুক্ষিগত করল।

যদিও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে উপযুক্ত উদ্যোগী কিছু সেনাপ্রধান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল কিন্তু তারা সাম্রাজ্যের প্রতি করণীয় কর্তব্য পালনে অনীহা প্রকাশ করে এবং কার্যতঃ নিজ স্বার্থসিদ্ধি এবং অন্তর্কলহে লিপ্ত হয় এবং শাসনতন্ত্র বা সমাজকে কিছুই তারা দেয়নি। তাছাড়া জনশ্রুতির ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে অষ্টাদ শতকের মোগল অভিজাতদের দুর্বলতার পেছনে দক্ষতা এবং নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন যেমন ছিল, ততোধিক ছিল স্বার্থান্ধতা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অভাব। যার ফলে দেখা দেয় দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন এবং পরস্পরবিরোধী শ্লাঘা। নিজেদের শক্তি, মর্যাদা এবং আয় বৃদ্ধির জন্যে নিজেরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত হন এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্রাটের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করতেন। শক্তির লড়াইয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে বলপ্রয়োগ, জাল ও জোচ্চুরীর আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করতেন না। সাম্রাজ্যের ঐক্যকে বিনষ্ট করার ব্যাপারে অভিজাতগণ নিজস্ব নীতি বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তাই এককথায় বলা যায় যে, শেষ মোগল অভিজাতগণের পতনের কারণসমূহ নিহিত ছিল সামাজিক সততা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব ওবং সর্বোপরি স্বল্পস্থায়ী শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টায়। এই অবক্ষয় কেবলমাত্র মোগল অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—তার প্রবণতা অষ্টাদশ শতকে রাজপুত রাজন্যবর্গ, জাঠ, শিখ, বুন্দেলখন্ডের প্রধান এবং নতুন স্বশাসিত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

সম্পদের অপচয়

অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই স্বার্থান্বেষী এবং পারস্পরিক রেষারেষি ও সঙ্কীর্ণতার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হল জায়গিরের সংখ্যাল্পতা এবং তৎকালীন জায়গিরগুলো থেকে প্রাপ্ত আয় নিম্নমুখী হওয়ায় অভিজাতদের প্রয়োজনীয়তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা। স্বভাবতঃই প্রচলিত জায়গিরগুলোর ওপর অধিকার স্থাপনে নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। মূলতঃ তখন এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব ছিল না যার মাধ্যমে সব অভিজাতকেই সন্তুষ্ট করা যায়—কারণ প্রয়োজনের তুলনায় জায়গির বা পদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

জায়গির প্রথা ও খান জমি

জায়গিরের পরিমাণ কম হওয়ায় নানাবিধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষা করে অভিজাতগণ জায়গির থেকে যত বেশি সম্ভব আয় করার দিকে নজর দিতে আরম্ভ করল। এবং অধীনস্থ জায়গিরগুলোকে বংশানুক্রমিক আওতায় আনার চেষ্টা শুরু হয়। তাঁদের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে অর্জিত আয়কে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি করার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে খাসজমিও নিজেদের নামে নথিভুক্ত করেছিল। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সঙ্কট ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে লাগল। এর ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় ব্যয় কমানোর জন্যে পূর্ণসংখ্যা মাফিক সৈন্যবাহিনী পালন করা সম্ভব না হওয়ায় রাজকীয় বাহিনীর শক্তি খর্ব হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা জনগণের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে না পারার ফলে

সাম্রাজ্যব্যাপী প্রজাগণের মধ্যে হতাশা লক্ষ্য করা যায়। এতদিন পর্যন্ত যে ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায় মোটামুটি একটা আশাব্যঞ্জক অবস্থায় ছিল তা ক্রমশ অষ্টাদশ শতকে দরিদ্র, দুঃস্থ, কদর্য ও অনিশ্চয়তায় প্রতিপন্ন হল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ নিলাম ডাকধারী-কে জমির ইজারা দানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা-পুরোদমে চালু হল এবং তা জায়গির ও খাস উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। যার ফলে সৃষ্টি হয় কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর বলপূর্বক অত্যাচারের মাধ্যমে জমির রাজস্ব আদায়কারী এক নতুন শ্রেণীর জোতদার।

জমি বণ্টন ব্যবস্থায় ত্রুটি

উপরোক্ত কারণগুলো থেকেই কৃষি উৎপাদন ও কৃষি সম্প্রসারণের ব্যাপারে অবনতি ও নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয় এবং কৃষক সম্প্রদায় ক্রমশঃ দারিদ্র্যের অভিশাপগ্রস্ত হতে আরম্ভ করল। কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি হতে আরম্ভ করে এবং এর বহিঃপ্রকাশ দেখা দিল। বহুক্ষেত্রে কৃষক কর এড়াবার জন্যে জমি ত্যাগ করল। পূর্বে বলা হয়েছে যে সতনামি, জাঠ এবং শিখ বিদ্রোহের পেছনে ছিল কৃষকদের অসন্তোষ। বহু দারিদ্র্যগ্রস্ত কৃষক এক-একটি দস্যু গোষ্ঠীতে সংগঠিত হয়ে অনেক জমিদারের নেতৃত্বে দস্যু বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। ফলে আইন ও শৃঙ্খলার দারুণ অবনতি ঘটে।

কৃষির অবনতি

কৃষি থেকে আয় রাজদরবারের বর্ধিত ব্যয় বহনে অক্ষম হয়ে পড়ল। অত্যধিক সামরিক ব্যয় এবং শাসকশ্রেণীর বিলাসের ব্যয় মেটাবার জন্যে একমাত্র পথ ছিল শিল্প ও ব্যবসার প্রসার। এই দুই ক্ষেত্রেই সামগ্রিক অবস্থা খুবই করুণ ছিল। সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ঐক্যবোধের অভাব ব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যবোধের অভাব মোগল সাম্রাজ্যের পতনের আরও একটি অন্যতম কারণ। একদেশ ও একাত্মার চিন্তা জনগণের কাছে ছিল অপরিচিত।

রাজনৈতিক ঐক্যবোধের অভাব

সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্যে যে সমরশক্তির প্রয়োজন এবং রাজকার্যে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং উচ্চাভিলাষী অভিজাতদের দমন করা দূরের কথা, বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা করার ক্ষমতা তখন মোগলবাহিনীর একান্তই ছিল না।

দাক্ষিণাত্যের মোগল আধিপত্যের অবসান ঘটে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেই। দিল্লীর হুকুমনামা মেনে মোগল সুবা কর্ণাটক নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করে। হায়দ্রাবাদের শাসনকর্তা অবশ্য সরাসরি স্বাধীন বলে ঘোষণা না করলেও, তাঁর নীতি রূপায়ণে কখনও তিনি কেন্দ্রীয় আদেশের অপেক্ষা করতেন না।

স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা

বাংলা সুবার দুই প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলীবর্দী খাঁ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাকে কার্যত স্বাধীন করেছিলেন। যদিও মুর্শিদকুলিকে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বাংলা শাসন করছিলেন এবং দিল্লীকে পাওনা রাজস্ব দেওয়া ব্যতীত তিনি নিজেকে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে বাংলার শাসনকার্য স্বাধীনভাবেই পরিচালনা করতেন।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে সাদাত খান বাহারন-উল-মূলক অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত হন এবং

তিনিই নিজেকে স্বাধীন অযোধ্যার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করতেন এবং সরাসরি স্বাধীনভাবেই রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

অষ্টাদশ শতকে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মারাতণ্ডা ভারমা তাঁর নিজশক্তির বলে কালিকট অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং স্বাধীনভাবে রাজকার্য পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর রাজ্যের সীমা কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মূল রাজপুত রাজ্যগুলি মোগল শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করে এবং ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লী থেকে বিতাড়িত জাঠগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ক্রমশঃ তাদের আধিপত্য পূর্বে গঙ্গা নদী, দক্ষিণে চম্বল, পশ্চিমে আগ্রা সুবা এবং উত্তরে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করে।

পারস্যরাজ নাদির শাহ মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের কর্নুল নামক স্থানে মোগল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। নাদির শাহের লুণ্ঠিত সম্পদের মূল্য প্রায় ৭০ কোটি টাকার মতো। কথিত আছে, এই সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে তিন বছর করমুক্ত রেখেছিলেন। মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ সিন্ধুর পশ্চিম তীর পর্যন্ত সমগ্র স্থানে নাদির শাহের আধিপত্য স্বীকার করে নেন। এই সময় সম্রাট শাহজাহানের কোহিনুর হীরে আর মুক্তাখচিত ময়ূর সিংহাসন তিনি ভারত থেকে নিয়ে যান। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের শুধু ক্ষতি করেনি, তা সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যসম্পন্ন মর্যাদার প্রতি এমন আঘাত হানে যে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা মারাঠা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যসংস্থার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। কাবুল এবং সিন্ধুর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল মোগলদের হস্তচ্যুত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম থেকে বৈদেশিক আক্রমণের পথ প্রশস্ত হয়। প্রতিরক্ষার শেষ সীমারেখাটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এভাবে ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ বাইরে চলে যাওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়ে এবং সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণও বহুলাংশে মোগল সাম্রাজ্যের আধিপত্য খর্ব করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুত্থান
(Growth of regional powers)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর এবং পঙ্গু রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহুসংখ্যক আঞ্চলিক স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। এই নয়া শক্তিগুলিই অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতে ইংরেজ শক্তির ক্রমবিকাশকে বাধাদানে অগ্রণী হয়। প্রকৃতপক্ষে এই শক্তিগুলির আবির্ভাব হয় মোগল প্রাদেশিক শাসকদের স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ অথবা মোগল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত রাজ্যগুলির মধ্যে বাংলা ছিল অন্যতম। মোগল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগে মুর্শিদকুলি খাঁ এবং আলীবর্দী খাঁ নামক দুই অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কার্যতঃ বাংলাকে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলার শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনিই বাংলা সুবার দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পরই প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন। শীঘ্রই নিজেকে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করেন। কিন্তু তিনি সম্রাটকে নিয়মিত পাওনা রাজস্ব প্রেরণ করতেন। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিপদ থেকে বাংলাকে তিনি মুক্ত করে রাজ্যে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হন। জমিদারগণের বিদ্রোহের কবল থেকে মুক্ত বাংলায় মুর্শিদকুলির আমলে শুধুমাত্র তিনটি অভ্যুত্থান ঘটে। প্রথমটি সংঘটিত হয় সীতারাম রায়, উদয়নারায়ণ এবং গুলাম মহম্মদের দ্বারা, দিবতীয়টি এবং শেষটি যথাক্রমে সুজাত খাঁ এবং নাজাৎ খাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ-এর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ঐ বছরই আলীবর্দী খাঁ সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফারাজ খাঁকে গিরিয়ার যুদ্ধে সিনহাসনচ্যুতকরে নিহত করেন ।

এই উপরোক্ত তিন নবাবের আমলে বাংলায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তিশৃঙ্খলা বজায় ছিল। শাসনব্যবস্থা ছিল দক্ষ এবং শিল্প ও বাণিজ্য বিশেষভাবে উন্নত হয়। শাসনকার্যে উপযুক্ত ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। জায়গির জমিগুলিদর বেশি অংশকেই তিনি খাস জমিতে রূপান্তরিত করে নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা (মাল জামিনি) চালু করেন। রাজস্ব সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থাপরিবর্তন করে কৃষকদের থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের অসুবিধা চিন্তা করে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার নিযুক্ত করেন। তাঁর সুবিন্যস্ত বাণিজ্য-শুল্কব্যবস্থা চুঁচুড়া, কলকাতা ও চন্দননগর অঞ্চল যথাক্রমে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। যদিও ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলি বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার ইংরেজ অধিকার দস্তক (মোগলসম্রাট ফারুকশিয়ার কর্তৃক ইংরেজদের প্রদত্ত) নাকচ করেন, পরে আবার এক নির্দিষ্ট শুল্কের বিনিময়ে

বাণিজ্যিক অধিকার দেওয়া হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ ইজারাদার নিয়োগের ব্যাপারে স্থানীয় জমিদার বা মহাজনদের বিশেষ সুযোগ দান করেন। স্বভাবতই তাঁর এই নীতির ফলে বাংলায় ভূস্বামী পর্যায়ের এক নতুন অভিজাততন্ত্রে সৃষ্টি হয়।

বাংলায় এই নবাবী আমলের সর্বাঙ্গীণ এক উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া গেলেও একটা বিশেষ ব্যাপারে তাঁদের দূরদৃষ্টির অভাব এবং অবহেলার ছাপ দেখা যায়। যদিও আলীবর্দী ইংরেজ ও ফরাসী ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কলকাতা এবং চন্দননগরে তাঁদের বাণিজ্য কুঠিগুলিকে দুর্গদ্বারা সুরক্ষা নিষিদ্ধ করেন তবুও তঁদের কেউই ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের পর ইংরেজদের সামরিক শক্তির ব্যবহার অথবা ভীতি প্রদর্শন এবং তাঁদের দাবি আদায়ের প্রচেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতে পারেন নি। তাঁদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাঁরা খুব একটা সক্রিয় ছিলেন না। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল যে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থসম্পন্ন এই কোম্পানিগুলি কখনই তাঁদের অমান্য করবে না। তাঁরা ইংরেজ কোম্পানির আসল মতলব উপলব্ধি করেননি। বাহ্যতঃ একটি ব্যবসায়িক সংগঠন হলেও প্রকৃতপক্ষে এই কোম্পানি ছিল ঔপনিবেশিক বিস্তারের নায়কদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের অভাব এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার ঘটনার অজ্ঞতার ফলে এই পশ্চিমী ব্যবসায়িক সংগঠনগুলির দ্বারা আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও লাতিন আমেরিকায় ধ্বংসকারীর ভূমিকার খবরাখবর রাখতে পারতেন না।

বাংলার এই তিন নবাব শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনে উপযুক্ত মনোনিবেশ করেননি। ফলে পরবর্তীকালে মারাঠাদের এবং সর্বোপরি ইংরেজ আক্রমণের কাছে উপযুক্ত সামরিক বাহিনীর অভাবের কারণে তাঁদের পরাজয় ঘটে। এই নবাবী আমলে রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ক্রমশঃ বাড়তে শুরু করে এবং বৈদেশিক কোম্পানিগুলি এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশীয় আইন ব্যবস্থাকেও অমান্য করে।

হায়দ্রাবাদ ঃ ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পত্তন ঘটান নিজাম-উল-মূলক্-আসফজা। ইনি ছিলেন আওরঙ্গজেব-উত্তরকালের একজন প্রভাবশালী অভিজাত। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের এবং বিতাড়ণের ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকার জন্যে পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। ১৭২০ থেকে ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাটের 'ওয়াজির' পদে থাকাকালীন তাঁর শাসনকার্য সংস্কারের প্রচেষ্টা বহুলাংশে সার্থক হলেও সম্রাট মহম্মদ শাহের তাঁর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারকে বাধাদানের প্রচেষ্টায় বিরক্তি বোধ করে তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালান ও এই অঞ্চলে একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রবল শক্তির কাছে মারাঠারা পর্যন্ত গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে নি।

মহীশূর ঃ হায়দ্রাবাদের পরেই দাক্ষিণাত্যে মহীশূর নামে আরেকটি শক্তিশালী রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। এই নতুন রাষ্ট্রের নায়ক ছিলেন হায়দার আলি। মহীশূরের সামরিক বাহিনীতে চাকুরিরত অবস্থায় তিনি বৈদেশিক শিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন এবং ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী সহায়তায় দিন্‌দ্রিগুলে একটি আধুনিক অস্ত্রাগার তৈরি করেন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মহীশূর রাজ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দুর্বল এবং বিভক্ত এই রাজ্যকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। নিরক্ষর হায়দার আলি ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মসহিষ্ণু। তাঁর প্রথম দেওয়ান ছিলেন একজন হিন্দু।

রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই তিনি মারাঠা, নিজাম এবং ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করে মাদ্রাজ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হায়দার আলির মৃত্যু হয়।

হায়দার আলির পুত্র টিপু সুলতান মহীশূরে ইংরেজদের হাতে পরাস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (১৭৯৯) মহীশূরের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। টিপু সুলতান ছিলেন এক অভিনব চরিত্রের অধিকারী। তাঁর ধ্যানধারণা ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তিনি নতুন ক্যালেণ্ডার প্রথা, নতুন মুদ্রা, নতুন ওজন ও মাপব্যবস্থা প্রভৃতির প্রচলন করেন। তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার ফলে তিনি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থাগার স্থাপনে প্রয়াসী হয়—যেখানে ধর্ম, ইতিহাস, সমরবিজ্ঞান, চিসিৎসা ও গণিত শাস্ত্রের নানাবিধ পুস্তক ছিল। নিয়মানুবর্তিতার উপাসক এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ টিপু সুলতান অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক যুগান্তকাকরী ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তিনি ছিলেন দূবদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। তিনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইংরেজরা দক্ষিণ-ভারত এবং অন্যান্য ভারতীয় শক্তিবর্গের কাছে বিপজ্জনক এবং ভারতের কাছে ইংরেজরা পয়লা নম্বর শত্রু।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহীশূরে কৃষক সম্প্রদায় ছিল সবচেয়ে সঙ্গতিসঙ্গন্ন। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে মহীশূর ইংরেজদের হস্তগত হলে ইংরেজরা উপলব্ধি করে যে টিপুর অধীনস্থ মাদ্রাজের কৃষকদের থেকে অধিকতর সঙ্গতিসম্পন্ন। টিপু সুলতান আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করেন। তিনি ফ্রান্স, তুরস্ক, ইরান ও পেগুতে কূটনৈতিক দূত প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘটান। পশ্চিমী ধাঁচে গঠিত সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার প্রচেষ্টা ছিলতাঁর। চীনের সঙ্গে ও তাঁর ব্যবসায়িক লেনদেন চলত।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মতে, টিপু সুলতান ছিলেন একজন ধর্মান্ধ। প্রকৃতপক্ষে তিনি গোঁড়া ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকারী হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর সহিষ্ণুতার নিদর্শন রেখে গেছেন। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে মারাঠা ঘোরসওয়ারা শৃঙ্গেরী মন্দির লুণ্ঠন করার পর তা সংস্কারের জন্যে তিনি অর্থ প্রদান করেন। বিখ্যাত শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির তাঁর রাজপ্রাসাদ থেকে একশ গজের মধ্যে ছিল।

টিপু সুলতান ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত। শ্রীরঙ্গপত্তমে তিনি 'স্বাধীনতার বৃক্ষ' (Tree of Liberty) রোপণ করেন এবং ফরাসী জেকোবিন ক্লাবের সদস্যপদ গ্রহণ করে। টিপু সুলতান-এর ফরাসীদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পক পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

অযোধ্যা ঃ রাজকীয় হুকুম নস্যাৎ করে নিজেদের সৈন্যবাহিনী গঠন, দুর্গ নির্মাণ প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করে স্থানীয় বিদ্রোহী জমিদারগণ যখন উদ্যত, সেই সময় সাদাত-খাঁ-বাহারুণ-উল-মূলক স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত হন। সাদাত-খাঁ ছিলেন সাহসী, উদ্যোগী, একগুঁয়ে এবং চতুর। তিনি স্থানীয় বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করেন।

সাদাত-খাঁর পর তাঁর উত্তরাধিকারী সাফদার-জঙ্গ নতুন রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

বাংলার নবাবদের ন্যায় তিনি মুসলমানদের ভেদাভেদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি অযোধ্যায় এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেন। মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি করে বিদ্রোহী জমিদারদের তিনি খর্ব করেন। রোহিলা এবং পাঠানদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেন। পাঠানদের দমনে তিনি জাঠদের সমর্থন লাভ করেন। মারাঠা-প্রধান পেশোয়ার সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে তিনি আহমদ-শাহ-আবদালীর বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ, ভারতীয় পাঠান এবং রাজপুত রাজন্যবর্গের বিদ্রোহ দমনে তাঁর সাহায্য আদায় করেন।

বিচার বিভাগীয় সংস্কারের মাধ্যমে সাফদার জঙ্গ সমপরিমাণ সুযোগ হিন্দু-মুসলমানদের দেন। তাঁর রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে মহারাজা নবাব রাই নামক একজন হিন্দুকে নিয়োগ করেন।

হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে অযোধ্যাকে প্রধান শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র রূপে তৈরি করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বলা যায়, তিন স্বাধীন রাজ্যের কর্ণধারগণ উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং নিজেরা সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তাঁদের জীবনযাপনের ধারা বিচার করলে এটা কখনই বিশ্বাস করা যায় না যে অষ্টাদশ শতকে বিশিষ্ট অভিজাতগণ আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। এক কথায় বলা যায় যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক এবং রাজকার্যের স্বার্থে অনেক সময় তাঁর নানাবিধ শঠতা বা প্রতারণার আশ্রয় নিতেন।

শক্তির উত্থান ষোড়শ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে জাতি একদা ধর্মভিত্তিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একটা গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়, তা কিছুদিনের মধ্যেই এক শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত হল। পঞ্চম গুরু অর্জুনের আমল থেকে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন শিখ সম্প্রদায় এক সঙ্ঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে অর্জুনের ওপর সম্রাট জাহাঙ্গীরের অত্যাচার শিখ জাতিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে সচেষ্ট করে। প্রবাদ আছে শিখগুরু তেগবাহাদুর প্রথমে রাজপুতদের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের পাশে দাঁড়ালেও পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা তাঁকে হতাশ করে। শোনা যায় যে কাশ্মীরের পণ্ডিত কৃপারামের সঙ্গে একযোগে তেগবাহাদুরকে গ্রেপ্তার করেন এবং পরে সম্রাটের আদেশে শিখগুরুর মস্তক ছেদন করা হয়। এই ঘটনায় শিখ জাতি মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়ী শত্রু রূপে অবতীর্ণ হয়।

তেগবাহাদুরের পুত্র দূরদর্শী গুরুগোবিন্দ সিংহ দশম গুরু হন এবং শিখ জাতিকে নববলে বলীয়ান করেন। মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার সুযোগে পাঞ্জাবে এক শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। তিনি জানতেন, জাঠ সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত শিখ জাতির মধ্যে প্রভূত সামরিক গুণ আছে এবং এরই ওপর ভিত্তি করে শিখ বাহিনীর নাম দেন "খালসা" বা পবিত্রবাহিনী। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে ইংল্যাণ্ডের অলিভার ক্রমওয়েলের "লৌহ বাহিনী' অনুসারে গুরুগোবিন্দ শিখগণকে এক আদর্শবাদ দ্বারা সংগঠিত করেন। তিনি শিখ জাতিকে এক ধর্মীয় সাম...
এদের 'আকালি' বা 'খালসা' নামকরণ করা হয়।

গুরুগোবিন্দ সিংহ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নজির হিসেবে পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চল থেকে মোগল শাসকগণকে বিতাড়িত করেন। মোগল বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পর তিনি কিছুদিনের জন্যে দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকাবের দ্বন্দ্বে তিনি বাহাদুর শাহকে সমর্থন করেন এবং পরে বাহাদুর শাহকে সমর্থন করেন এবং পরে বাহাদুর শাহের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যান। এখানেই তাঁর কর্মচারী, এক পাঠান আততায়ীর ছুরিকাঘাতে ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে গুরু গোবিন্দের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে গুরু গোবিন্দ মোগলদের কাছ থেকে শিখদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে উপদেশ দিয়ে যান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মারাঠা শক্তির উত্থান ও পতন (১৭৬১ পর্যন্ত)

Growth and decline of the Marathas (Till 1761)

ম্রিয়মাণ মোগল শক্তির কাছে উদীয়মান শক্তিশালী ছিলেন এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বাধা ও বিপদস্বরূপ। মোগল শক্তির পতনের পর দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে মারাঠারাই ছিল একমাত্র বিকল্প---যারা এটা পূর্ণ করতে পারত। উপরন্তু, এই কার্য সিদ্ধির জন্যে যে উচ্চ পর্যায়ের সেনানায়ক এবং রাজনীতিকের প্রয়োজন ছিল—মারাঠারাই সেই ধরনেব নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গঠনের ভিত্তিস্থাপনেব জন্যে যে একতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচীর প্রয়োজন ছিল মারাঠাদের মধ্যে সেগুলির বিলক্ষণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই তাঁরা মোগলদের স্থান পূরণে অক্ষম হয়। অবশ্য, মোগল সাম্রাজ্যর ধ্বংসের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন সফল যুদ্ধ করেছিল মারাঠারাই।

১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে শিবাজীর পৌত্র সাহু ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব শাহু ও তাঁর মাতাকে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দান করেন এবং এই মারাঠা বন্দীদ্বয়ের ধর্ম ও জাতিগত মর্যাদার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব সাহু সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌছতে চেষ্টা করেন ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাহু মুক্তি লাভ করেন। অনতিকালের মধ্যেই [illegible] সাহু এবং কোলাপুরের তাঁরাবাঈ-এর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। তাঁরাবাঈ ১৭০০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই তাঁর স্বামী রাজারামের মৃত্যুর পর পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীর নামে মোগলবিরোধী সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় মারাঠা সর্দারগণ তাঁদের নিজ নিজ [illegible] বাহিনী নিয়ে বিবদমান দুই গোষ্ঠীতে যোগ দিতে আরম্ভ করল। এই সুযোগে মারাঠা সর্দারগণ এই দুই [illegible] গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের ক্ষমতা ও শক্তি-বৃদ্ধির [illegible] দর কষাকষি আরম্ভ করে। অনেকেই আবার দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসকদের [illegible] শুরু করে। এই দুই গোষ্ঠীর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মারাঠা সরকারে [illegible] প্রতিপত্তির সূচনা [illegible] রাজা সাহুর পেশোয়া রূপে বালাজি [illegible] এভাবেই মারাঠা ইতিহাসের দ্বিতীয় [illegible] মারাঠা রাজ্য মারাঠা সংঘে রূপান্তরিত [illegible]

ব্রাহ্মণ বালাজি বিশ্বনাথ প্রথমে একজন সামান্য রাজকর্মচারী থেকে ধাপে ধাপে এক বিশিষ্ট পদ লাভ করেন। শত্রু দমনে সাহুকে তিনি পুরোপুরি আনুগত দেখান এবং সক্রিয় সাহায্য দান করেন। কূটনীতির মাধ্যমে বহু মারাঠা সর্দারকে তিনি সাহুর সমর্তনে আনতে পেরেছিলেন। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে সাহু তাঁকে পেশোয়া পদে (মুখ্যপ্রধান) নিযুক্ত করেন। ক্রমশঃ বালাজি বিশ্বনাথ তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং রাজারামের বংশধর কর্তৃক শাসিত দক্ষিণে কোলাপুর ছাড়া সব মারাঠা সর্দারগণই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। সমস্ত শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাকে নিজেদের হাতে শক্তিশালী রূপে কেন্দ্রীভূত করে তিনি অন্যান্য মন্ত্রী সর্দারদের গৌণ করে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে বালাজি এবং তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও-এর সময় থেকেই মারাঠা সাম্রাজ্যের কার্যকরী ক্ষমতা পেশোয়ার হাতেই ন্যস্ত হয়।

মোগল সরকারের কর্মচারীদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে বালাজি বিশ্বনাথ মারাঠা শক্তিকে সুদৃঢ় করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের মোগল প্রাদেশিক শাসকগণকে প্রাদেশিক শাসকগণকে ঐ অঞ্চলের 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' করে দানে বাধ্য করেছিলেন। মারাঠা সর্দারগণকে বিভিন্ন এলাকায় চৌথ এবং সরদেশমুখী আদায়ের ক্ষমতাদানের সুযোগ বন্টনের মাধ্যমে পেশোয়া তাঁর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা-সম্পন্ন মারাঠা সর্দারগণকে পেশোয়া নিজের দিকে আনতে সফল হন। এই ব্যবস্থা অবশ্য পরবর্তীকালে মারঠা সাম্রাজ্যের দুর্বলতার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। মারাঠা সর্দারগণ তাঁদের নিজ নিজ স্বার্থ ও শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় মগ্ন হওয়ার অনতিকালেই নিজেরা স্বাধীন ও শক্তিশালী হয় এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাব পোষণ করে। মারাঠা সাম্রাজ্যের বাইরে যে-সব অঞ্চল মারাঠারা জয় করে, তা মারাঠা রাজা বা পেশোয়ার বাহিনী দ্বারা সংঘটিত হয়নি। তা সম্ভব হয়েছিল বিভিন্ন মারাঠা সর্দারদের ব্যক্তিগত বাহিনীর দ্বারাই। ঐ মারাঠা সর্দারদের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব যদি নিয়ন্ত্রণ করা যেত তবে কখনও তারা তাদের শত্রু নিজাম, মোগল বা ইংরেজদের সঙ্গে যোগসাজস করতে পারত না। যাই হোক, বালাজি বিশ্বনাথকে মারাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বললে অত্যুক্তি হয় না। এককথায়, তিনি ভারতে মারাঠাদের ভবিষ্যৎ প্রভুত্বের ভিত্তি রচনা করেন। ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বালাজি বিশ্বনাথের পর তারা পুত্র প্রথম বাজিরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন সমরকুশলী ও তীক্ষ্ণ কূটনীতিবিদ। তৎকালীন হিন্দু রাজন্যবর্গের সঙ্গে মিত্রতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে তিনি যত্নবান হন। তিনিই প্রথম এক শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্য (হিন্দুপাদ্-পাদশাহী) গঠনে উদ্যোগী হন। মহারাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় এক অখণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই বাজিরাও-এর রাজনৈতিক আদর্শের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই নীতির সাফল্যের অনুকূলে দুটি কারণ ছিল। (১) মোগল সাম্রাজ্যের দ্রুত ভাঙ্গন ও রাজপুতদের মিত্রতামূলক মনোভাব। তাঁর সময়ে বিস্তৃত মারাঠা সাম্রাজ্যের শক্তিশালী মারাঠা জায়গীরদার বা সামন্তগণ যেমন—সিন্ধিয়া, ভোঁসলে, গাইকোয়াড়, হোলকারগণকে অধীনে এনে মারাঠা রাষ্ট্রমণ্ডল (Maratha Confederacy) গঠন করেন।

তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ে মারাঠারা মালব ও গুজরাট জয় সম্পন্ন করেন। (১) চৌথ ও সরদেশমুখীর দাবি, (২) রাজ্যাংশের দাবি ও বিজিত অঞ্চলে মারাঠা নায়কদের আধিপত্য স্থাপন এবং (৩) বিজিত অঞ্চলগুলির মারাঠা সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ। মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ্ মারাঠা শক্তির প্রসারে ভীত হয়ে নিজামকে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা আধিপত্য কমাবার জন্য অনুরোধ করলে নিজাম মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। অবশেষে নিজাম পরাজিত হন এবং সন্ধির শর্ত অনুসারে মারাঠারা মালব ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল লাভ করেন। এভাবে উত্তর-ভারতে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মারাঠাদের

প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। এরপর সলসেট ও বেসিন বন্দর থেকে পর্তুগীজগণকে বিতাড়িত করেন। এই সময়ে নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সংবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য প্রতিবেশী মুসলমান রাজ্যগুলির সঙ্গে শান্তি স্থাপনপূর্বক নাদির শাহ্র বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রথম বাজিরাও অবশ্য ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হননি। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রথম বাজিরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বালাজি বাজিরাও পেশোয়াপদে নিযুক্ত হন। তিনি পিতার ন্যায় যোগ্য হলেও ততটা উদ্যোগী ছিলেন না। এই সময়ে শাহুর এক আত্মীয় বালাজি বাজিরাও-এর পেশোয়া পদে নিয়োগের বিরোধিতা করেন। অবশ্য শাহু বালাজির পক্ষ সমর্থন করলে এই বিরোধিতা কার্যকরী হয়নি। ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে রাজা শাহুর মৃত্যু হলে সমস্ত রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় পেশোয়ার ওপর। এবং ক্রমে পেশোয়া সরকারি শাসনতন্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে এবং এই অধিকারের পরিণতি

হিসেবেই পুণেতে কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত হয়। বালাজী বাজিরাও উত্তর-ভারতে মারাঠা শক্তির ঘাঁটিগুলি সুদৃঢ় করে বারবার বাংলার ওপর আক্রমণ চালান এবং অবশেষে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে বাংলার নবাব উড়িষ্যা মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দেন। বালাজী বাজিরাও পাঞ্জাবে তাঁর অভিযান চালনা করেন এবং আহমদশাহ আবদালীর এক প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করে মারাঠা আধিপত্য স্থাপন করেন। এর ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে আফগান শাসক আহমদ শাহ আবদালী পুনরায় ভারত অভিযান পরিচালনা করে বিগত দিনের মারাঠা আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আহমদ্ শাহ আবদালীর এই অভিযানকে কেন্দ্র করে ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মারাঠারা শুধু পরাজয় বরণ করেননি, তাঁদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠল। প্রধান দুই সেনাপতি বিশ্বাস রাও ও সদাশিব রাও এই যুদ্ধে নিহত হলে মর্মাহত অসুস্থ বালাজি বাজিরাও-এরও মৃত্যু হয়। (১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে)। এখানে উল্লেখ্য যে উত্তর-ভারতে মারাঠাদের অধিপত্য সুগঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ক্রমান্বয়ে আক্রমণ ও লুণ্ঠনে সন্ত্রস্ত মুসলমান শাসকগণ, যেমন রোহিলখণ্ডের নাজির খাঁ ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা আবদালীর পক্ষ সমর্থন করেন। অপরপক্ষে, বালাজি বাজিরাও-এর নীতিতে উত্যক্ত রাজপুত ও শিখগণ নিরপেক্ষ ছিলেন। জাঠগণ মারাঠাদের চাপানো করভার-এ অসহ্য হয়ে ওঠেন এবং মারাঠাদের সাহায্য করেননি। স্বভাবতই তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের একক শক্তির ওপর নির্ভর করেই যুদ্ধ করতে হয়। যদিও দিল্লীর মোগল উজির দুর্বল ইমাদ-উল্‌মুলুক মারাঠাদের সমর্থন করেছিলেন। সর্বোপরি, মারাঠা সেনানায়কদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মনোভাবে মারাঠা অভিযানের দুর্বলতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল (Third battle of Panipath : Its impact and results) ঃ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সামগ্রিকভাবে ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে, কে ভারত শাসন করবে এটা স্থিরীকৃত হয়নি। বরঞ্চ এটাই পরিষ্কার হয়ে যায় যে ভারতীয় বা আফগান কেউই আর এই অঞ্চলে তাঁদের হৃত শক্তি পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়নি। কার্যক্ষেত্রে আগামীদিনে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রভাব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়।

মারাঠা শক্তি যে অপরাজেয় নয় এটাও এই যুদ্ধে প্রমাণিত হল। মারাঠা শক্তির ওপর নির্ভরশীল হিন্দু রাজগণের মনোবল নষ্ট হয়। দিল্লীতে মারাঠা বা আফগান কেউই তাঁদের অধিকার স্থাপন করতে পারেনি। এমতাবস্থায় ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তি বলে কিছুই রইল না। ইংরেজগণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বাংলায় ও মাদ্রাজে তাঁদের ক্ষমতাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপনে সক্ষম হয়। যদিও পানিপথের ক্ষত শুকোবার আগেই মারাঠাগণ আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এলে ততদিনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজশক্তি মারাঠাদের সহজেই প্রতিহত করল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে পলাশীর যুদ্ধে জয়ের ফলে ইংরেজশক্তি যে বীজ রোপণ করে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাগণের পরাজয়ের ফলে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার শুরু হয়। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে, 'পানিপথের রণক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।'

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি এবং এর ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। এলফিনস্টোন মারাঠাদের এই বিপর্যয়কে সর্বাত্মক বলেই ক্ষান্ত হননি, এবং বলেন, 'এই পরাজয়সমগ্র মারাঠা জাতির গৌরবকে ম্লান করে দেয়।' রাজওয়াদে বলেছেন যে, পানিপথের যুদ্ধে পরাজয়ের ফল মারাঠা আধিপত্য ও মারাঠা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এবং এই যুদ্ধে রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধানও হয়নি। প্রসঙ্গতঃ সারদেশাই একথাও বলেছেন যে, যদি পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের প্রকৃত পতন ঘটত তাহলে পরবর্তীকালে মারাঠাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের তিনটি যুদ্ধে লড়তে হত না। মেজর ইভান্স বেল পানিপথের যুদ্ধকে মারাঠাদের "জয় ও গৌরব" বলে অভিহিত করেন।

কার্যতঃ পানিপথে মারাঠাদের এই পরাজয় সমগ্র মারাঠা জাতীয় শোক ও হতাশার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। মারাঠা সৈন্যের এই পতনকে মহারাষ্ট্রীয়গণ তাদের গৌরবের পতন বলে মনে করে। তবে ঐতিহাসিক ডাফ বলেছেন যে, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের এই পরাজয় অপেক্ষা পেশোয়া মাধব রাও-এর (১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে নানা সাহেব বা বালাজি বাজিরাও-এর মৃত্যুর পর পেশোয়া নিযুক্ত হন) অকালমৃত্যু মারাঠাদের যথার্থ বিপর্যয়ের কারণ হয়। ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ারের মতে, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের সামরিক পতনের ফলে ভারতের রাজনীতিতে স্থানীয় শক্তিগুলি প্রবল হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক সারদেশাই-এর মত সম্পর্কে একথা বলা যায় যে মারাঠা শক্তি পুনরায় উত্তর ভারতে কর্তৃত্ব স্থাপন করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা আর তাদের হৃত শক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজয় মারাঠা শক্তির পক্ষে বিপর্যয়ের পরিমাপ করা প্রসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক মাপকাঠি প্রয়োগ না ঘটালেও এটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে ভারতীয় উপমহাদেশ বৈদেশিক শক্তির ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত হওয়ায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতা দেখা দেয়। উপযুক্ত কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এই যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় একটা অকস্মিক ঘটনা নয়। এই পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে একাধিক পশ্চাদপট এর জন্যে দায়ী। মারাঠা সৈন্যবাহিনীর পরিচালকগণের দক্ষতার তুলনায় আক্রমণকারীদের দক্ষতা অনেক পরিমাণ বেশি ছিল। মারাঠা সেনানায়কদের হঠকারিতা এবং কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব এই বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করে। শোনা যায় যুদ্ধারম্ভের দু'মাস পূর্বে মারাঠা শিবিরে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে অভুক্ত মারাঠা সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে মারাঠাদের সম্পর্ক ভাল না থাকায় ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্ধর্ষ আফগান বাহিনীর মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তৃতীয়তঃ যুদ্ধে ব্যবহৃত আফগানদের অস্ত্রাদি মারাঠা অপেক্ষা উৎকর্ষ ছিল। চতুর্থতঃ আফগান সৈন্যবাহিনী ছিল সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। অপরদিকে, মারাঠা সৈন্যগণের মধ্যে এই দুয়েরই প্রচণ্ড অভাব ছিল। পঞ্চমতঃ মারাঠা বিপর্যয়কে কোন একক ব্যক্তির ত্রুটি বলা চলে না। মারাঠা সেনাপতি সদাশিব রাও-এর ভ্রান্ত রণকৌশল এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব এই পতনের অন্যতম কারণ। রণক্ষেত্রে

সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগের ওপর। দেখা যায় যে পেশোয়ার (রাষ্ট্র প্রধান) এ ব্যাপারে যে ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, তা তাঁরা করেননি। সারদেশাই এই কারণে যুদ্ধের পরিণতির জন্য মুখ্যতঃ পেশোয়াকেই দায়ী করেন। অবশ্য সারদেশাই সদাশিব রাও-এর সামরিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে নানা প্রশ্নের অবতারণা করেন। তিনি সদাশিব রাওকে নরমপন্থী সেনানায়ক বলে তাঁর (সদাশিব রাও) "জনগণের সেবা করার আগ্রহ" এই মনোভাবের নিন্দা করেছেন। রাওলিন্‌সন্ অবশ্য সরাসরি সদাশিব রাও -এর সেনানায়কোচিত গুণাগুণের অভাব ছিল বলে অভিযোগ করেন। ঐতিহাসিক রাজওয়াদের মতে হোলকার-এর নিরপেক্ষ ভূমিকা মারাঠাদের পতনের একটি বিশেষ কারণ। তিনি বলেন যে যুদ্ধে হোলকারের প্রথম পর্যায়ে পরাজয়ের সাথে সাথে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ অবিবেচনাপ্রসূত ছিল। উপরন্তু তাঁর আফগান সেনাপতি পশন্দ খাঁর সঙ্গে গোপন সংযোগ মারাঠাদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে। এককথায় বলা যায় যে পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা নায়কদের আচরণ অনেকাংশে এই পরাজয়ের কারণ।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের বিস্তার ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব

(Growth of European Commerce and Conflict among European trading Companies)

ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় দেশগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুকালের। বিভিন্ন পথে যেমন, জলপথে ও স্থলপথে এই বাণিজ্যচলত। এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে আরব বণিকগণ এই ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে বাণিজ্যিক তৎপরতা ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে দেখা যায়, ক্রমশঃ পরবর্তী পর্যায়ে তাতে পশ্চিমী দেশের সাম্রাজ্য বিস্তারের মনোভাব ফুটে ওঠে। অর্থাৎ একদা যা বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে রাজতন্ত্রে ভূমিকায় পর্যবসিত হয়।

যথারীতি ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং অসম প্রতিযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করে এই সময় বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি শাসকের ভূমিকা গ্রহণে উদ্যোগী হয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রবাহ যখন ঝড়ের গতিতে চলছিল এবং তদানীন্তন রাজন্যবর্গের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব দেখা দেয়, সেই সময় থেকেই ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি মুখ্যতঃ ইংরেজ, ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি ব্যবসায়ীর ভেক ধরে থাকলেও তলে তলে ভারতে তাঁদের সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সফল করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। লক্ষ্য করা যায় যে প্রথম থেকেই এই ইংরেজ কোম্পানি ব্যবসা ও কূটনীতির সমন্বয় ঘটিয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে কোম্পানির ব্যবসায়িক কুঠিগুলিকে প্রতিটি অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তারের নজির হিসারে ব্যবহার করত। সপ্তদশ শতকের প্রথমেই টমাস রো (Roe) সরাসরিই ভবিষ্যতে ইংরেজ ও ভারতের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক হবে তার ভিত্তিরচনা শুরুর উল্লেখ করেছেন। ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দে সুরাটে ইংরেজ কুঠিকে দুর্গে পরিণত করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা মোগল সম্রাটের লৌহকঠিন আদেশের মাধ্যমে বানচাল হয়ে যায়।

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেক সুবিধাজনক ছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে মাদ্রাজে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ইংরেজ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

ইংরেজ কোম্পানি ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই অধিকার করে উপযুক্তভাবে নিজেদের সুরক্ষিত করে। বোম্বাই বন্দরের সুবিধাগুলি লাভের ফলে মারাঠাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পশ্চিমের ইংরেজ মূল বাণিজ্যিক কেন্দ্র সুরাট থেকে বোম্বাই-এ স্থানান্তরিত করা হল।

অবশ্য এর পূর্বে ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব-ভারতে প্রথম ইংরেজ বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপিত হয় উড়িষ্যাতে। ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে বাংলার হুগলীতে এবং পরবর্তীকালে পাটনা, বালেশ্বর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপিত হয়।

১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে হুগলী দখলের ব্যাপারে মোগলদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ হয়।

এভাবে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশে সুরাট, বিশাখাপত্তনম, মুসুলীপত্তন অবরোধ করলে ইংরেজ ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং ভবিষ্যতে আর এই ধরনের ঔদ্ধত্য না দেখানোর অঙ্গীকার করে।

ইংরেজদের অপরাধকে মোগলসম্রাট সহজেই ক্ষমা করলেন। কেননা তাঁদের ধারণাই ছিল না যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ষতিকর নয় প্রতিপন্ন হলেও এই ইংরেজ ব্যবসায়ীগণই একদিন দেশের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তাছাড়া ইংরেজ বণিকগণের ব্যবসার ফলে ভারতীয় কারিগর ও বণিকগণ উপকৃত হচ্ছে বলে মোগল সম্রাট মনে করতেন। পরে ইংরেজগণ ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে সুতানটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারী লাভকরে এবং ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপন করে। ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে বাংলার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিল-এর অধীনে আনা হল। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজগণকে প্রদত্ত দস্তক (বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করার ছাড়পত্র)-এর সুবিধা গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে বাড়ানো হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলিবর্দীর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির ফলে ইংরেজগণ এ অঞ্চলে খুব একটা তৎপরতা দেখাতে সাহস করেননি। নবাবের অধীনস্থ জমিদার হিসেবেই তাঁর এখানে কার্য পরিচালনা করতেন।

এই সময়ে ইংরেজদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি কার্যকরী না হলেও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়। ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে বাণিজ্যের অঙ্ক ছিল পাঁচ লক্ষ স্টারলিং। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় আঠার লক্ষ স্টারলিং-এ। লক্ষণীয় যে ভারতের সূতী ও সিল্ক বস্ত্র এ-সময়ে ইংরেজগণ নিজের দেশীয় বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করার জন্যে ইংল্যাণ্ডে আমদানি করত না এবং অপরপক্ষে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে রূপা রপ্তানিও অনুরূপ কারণে বন্ধ রাখা হয়। যে ইংরেজগণ ভারতে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার জন্যে ওকালতি করছিল তাঁদের দেশে কিন্তু শিল্প রক্ষণনীতি গ্রহণ করে ভারতীয় সামগ্রীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং কলিকাতায় ব্রিটিশ উপনিবেশ শহরগুলির উন্নতি আরম্ভ হয়। বহু ভারতীয় বণিক ও অর্থলগ্নীকারীগণ এই শহরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। এর কারণ হল, এই অঞ্চলগুলিতে নতুন বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ এবং অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ঐ অঞ্চলের উপযুক্ত নিরাপত্তা (যার অভাব মোগল সাম্রাজ্যের বহুধাবিভক্ত হওয়ার ফলে অন্যানা অঞ্চলে বিরাজ করছিল)। তাছাড়া এই তিনটি শহরে ইংরেজ উপনিবেশগুলি উপযুক্তভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছিল এবং এই স্থানগুলো থেকে সামুদ্রিক কর্তৃত্ব স্থাপন সহজ ছিল। ইংরেজরা নৌ-শক্তির বিচারে বহুগুণে ভারতীয়দের থেকে উন্নত ও শক্তিশালী ছিল। কোন সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনে ইংরেজদের এই শহরগুলো থেকে সহজেই সমুদ্রপথে পলায়ন সম্ভব ছিল। অপরপক্ষে, উপযুক্ত সময়ে ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোকে তাদের বিজয় অভিযানের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা সহজ ছিল।

ভারতে অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ওলন্দাজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠিতভাবে পরিচালিত হয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকেই ভারতে ওলন্দাজ বাণিজ্যের অবনতি শুরু হয় এবং

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের সাথে সাথেই বাংলায় ইংরেজ রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য সুদৃঢ় হয়। ইংরেজদের এই প্রাধান্য ওলন্দাজদের মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি করে এবং শেষবারের মতো বাংলাদেশে ওলন্দাজগণ প্রতিপত্তি স্থাপনে সচেষ্ট হয় ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে মীরজাফরের আমলে বিদরের যুদ্ধে ওলন্দাজগণ ইংরেজদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হল। ফলে ভারতে ওলন্দাজ বাণিজ্য-কুঠিগুলি ইংরেজদের হস্তগত হয়। ওলন্দাজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালন-পদ্ধতিতেও সাংগঠনিক জটিলতার জন্য ওলন্দাজগণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে নানাবিধ বাধা ও অসুবিধার মধ্যে পড়ে। এই সময়ে ওলন্দাজ কোম্পানির আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। ওলন্দাজদের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ফরাসী বিপ্লব শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ নৌবহর ওলন্দাজগণকে বিতাড়িত করে।

সপ্তদশ শতকে ইউরোপে ফরাসী ও ওলন্দাজদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতে ফরাসীদের পরিস্থিতি জটিলাকার ধারণ করে। ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে ফরাসীদের হাত থেকে পণ্ডিচেরী ওলন্দাজদের হাতে চলে যায়। আবার ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে রাইসউইকের সন্ধি অনুসারে ফরাসীরা পণ্ডিচেরী ফেরত পেলে ফাঁসোয়া মার্টিনের সুদক্ষ পরিচালনায় পণ্ডিচেরীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে প্রতিপত্তি ও বাণিজ্যের অবনতি ঘটলে ফরাসীগণ বান্টাস, সুরাট, ও মুসুলিপট্টমের কুঠিগুলি পরিত্যাগ করে। ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে পুনর্গঠিত ফরাসী কোম্পানি পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে সামরিক উন্নতি ঘটিয়ে মাহে ও কারিকলে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসীগণের কোন প্রকার রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল না। বরং তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যের প্রসার। কিন্তু ডুপ্লের আগমণের পর থেকেই ফরাসীগণ ভারতে সাম্রাজ্যস্থাপনে উদ্যোগী হয়। স্বভাবতই ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের ইতিহাসে অবশ্যই একটি নতুন অধ্যায়।

ভারতে পর্তুগীজ তৎপরতা প্রায় একশ বছর অবধি একচেটিয়া ছিল। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার কালিকট বন্দরে চিহ্নিত করা যায়। ক্রমশঃ পর্তুগীজগণ তাদের ব্যবসা কোচিন, গোয়া, দমন ও দিউতে বিস্তৃত করে। পর্তুগীজ নৌবহরের শক্তি ও প্রাধান্য এই তীরবর্তী অঞ্চলগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্তৃত্ব স্থাপনের পক্ষে খুবই সহায়ক ছিল। পর্তুগীজগণ ভারতের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যুদ্ধ ও সমুদ্রবক্ষে লুঠতরাজ প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত হয়। যাই হোক, তাঁদের নৌ-শক্তির প্রাধান্য, সেনাবাহিনী ও শাসনতন্ত্রে শৃঙ্খলা থাকায় প্রায় একশতকাল ব্যাপী ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়। পর্তুগীজগণ ভারতে বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের কাজেও ভীতি প্রদর্শন করতেন। অবশেষে ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে মোগলগণ তাদের পূর্ব-ভারতে হুগলী কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত করে। ক্রমশঃ আরব সাগরের ওপর এবং গুজরাট অঞ্চলে পর্তুগীজ আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ অবধি পর্তুগীজ অধিকৃত স্থানগুলি যেমন—গোয়া, দমন ও দিউ এর ওপর পর্তুগীজ অধিকার বিংশ শতাব্দির ষাট-এর দশকের প্রথমাবধি বজায় ছিল। ১৯৬১ সালে এগুলি স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হয়।

সপ্তদশ শতক থেকেই অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদলও ভারতে বাণিজ্য স্থাপনে সচেষ্ট

হয়। দিনেমারগণ ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা না করতে পেরে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে তাদের বাণিজ্য কুঠিগুলি ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দেয়।

১৭২৩ খ্রীস্টাব্দে ফ্লাণ্ডর্সের বণিকগণ মোগল সম্রাট-এর কাছ থেকে সনদ লাভ করে 'ওয়েস্টেণ্ড' কোম্পানি স্থাপন করে। ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দে সুইডিস ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রীয়ান ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হয়। কিন্তু তাদের ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

দাক্ষিণাত্যের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইউরোপীয় হস্তক্ষেপের অনুকূল ছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ডামাডোল, ইউরোপীয় বণিককুলের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের শাসকবর্গের সম্পর্ক সর্বোপরি ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের অবস্থার গুরুত্ব এবং সেই সঙ্গে ইউরোপে পারস্পরিক সম্পর্ক ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের সূত্রপাত করে। অবস্থানগত পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে পশ্চিম ভারতে মোগল শক্তি তখনও প্রবল থাকায় ঐ অঞ্চলে বিদেশী অনুপ্রবেশের খুব একটা সুযোগ ছিল না। পূর্ব-ভারতে নবাব আলীবর্দী

রবার্ট ক্লাইভ

ডুপ্লে

খাঁ ইউরোপীয়দের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। তাই একমাত্র দক্ষিণ-ভারতই ছিল ইউরোপীয় হস্তক্ষেপের অনুকূল। তাছাড়া ক্রমান্বয়ে মারাঠা আক্রমণে বিপর্যস্ত ও কর্ণাটকের উত্তরাধিকার প্রশ্নে জটিল অবস্থায় স্থানীয় শক্তিগুলি ইংরেজ ও ফরাসীদের উত্তোরত্তর শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াসের প্রতি দৃষ্টিদানে সক্ষম ছিল না। অপরপক্ষে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসীদের পরস্পরবিরোধী শক্তি গোষ্ঠীরে যোগদান স্বভাবতই ভারতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। উপরন্তু এই যুদ্ধের পিছনে আমেরিকায় উভয়ের ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘর্ষের অন্যতম কারণ ছিল। ভারতে দুই শক্তির মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সাধারণভাবে ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতার

ফলে কোনভাবেই এই দুই শক্তির পক্ষে সংঘর্ষকে এড়ানো সম্ভব হয়নি। যদিও ডুপ্লে ও ভারতস্থিত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক স্তরে নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে পারেনি।

উভয় পক্ষ যখন আলোচনায় ব্যস্ত সে সময় ইংরেজগণ ফরাসীদের যুদ্ধ জাহাজ দখল করলে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ নৌ-বাহিনী ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে কয়েকটি ফরাসী জাহাজ অধিকার করে এবং ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরী আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করে। পণ্ডিচেরীর ফরাসী শাসক সুদক্ষ ও চতুর রাজনীতিক ডুপ্লের নেতৃত্বে এই ঘটনার প্রতিশোধ নেবার জন্য ইংরেজ অধিকৃত মাদ্রাজ দখল করে। এই টনা ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজগণ কর্ণাটকের নবাবের কাছে আবেদনের মাধ্যমে ফরাসীদের কবল থেকে ইংরেজদের অধিকৃত অঞ্চল রক্ষা করার কথা জানালেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মাদ্রাজ আক্রমণের প্রক্কালে ডুপ্লে কর্ণাটকের নবাব আনোয়ার উদ্দিনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মাদ্রাজ ইংরেজদের কাছ থেকে দখল করার পর তা নবাবকে প্রত্যার্পণ করবে। সঙ্গত কারণেই তিনি ইংরেজদের আবেদনে কোন প্রকার সাড়া তো দিলেনই না উপরন্তু ফরাসীদের মাদ্রাজ আক্রমণের ঘটনার বিরোধিতা বা আপত্তি করেননি। প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাজ অধিকারের পত ডুপ্লে নবাবকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার জন্য নবাব আনোয়ার উদ্দিন ফরাসীদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে সেন্ট টোমের যুদ্ধে নবাবের এই বিরাট বাহিনী ফরাসীদের অতি ক্ষুদ্র বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধে নবাবের পরাজয় পরোক্ষভাবে কয়েকটি ইঙ্গিত বহন করে। যেমন (১) ম্রিয়মান ফরাসীগণের নতুন উদ্দীপনায় ডুপ্লের নেতৃত্বে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল, (২) ফরাসী সেনাবাহিনীর খ্যাতিবৃদ্ধি প্রমাণ হওয়ায় ইউরোপীয় জাতিগুলি বিশেষ করে ইংরেজ ও ফরাসীগণ ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্যোগী হল। ঐতিহাসিক ফিলিপস্-এর মতে ভারতে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির আধিপত্য স্থাপনের পথ পরিষ্কার হওয়ায় তাঁদের ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে আর কোন বাধা রইল না।

১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে আয়লা স্যাপেলের (Aix-La-Chappel) সন্ধির মাধ্যমে ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের অবসান হলে ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। সন্ধির শর্তানুসারে ফারাসীগণ ভারতে মাদ্রাজ ইংরেজদের ফিরিয়ে দিল এবং বিনিময়ে আমেরিকার অন্তর্গত লুইসবার্গ স্থানটি লাভ করল। যদিও যুদ্ধের অবসান হল তবুও ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার এবং ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্য স্থাপনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব প্রশমিত হল না। এবং স্বভাবতই আগামী দিনে এই প্রতিযোগিতার অবসান কিভাবে সম্ভব তা স্থিরীকৃত হওয়ার সমস্যা রয়েই গেল। কারণ ভারতে উভয়েরই রাজ্যবিস্তারে ইচ্ছা ও উৎসাহ পুরোপুরিভাবে প্রকট হয়ে উঠল।

প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ডুপ্লে আগামী দিনে সুকৌশলে আধুনিক ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ফরাসী বাহিনী দ্বারা ভারতের রাজন্যবর্গের অন্তর্দ্বন্দ্বের

সুবিধানুযায়ী বিভিন্ন পক্ষে যোগদান করে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে জয়ী রাজন্যবর্গের কাছ থেকে আর্থিক, বাণিজ্যিক বা রাজ্যলাভের সুবিধা পাওয়া সম্ভব বলে চিন্তাকরতে শুরু করেন। এইভাবে তিনি ভারতীয় নরপতিগণের সম্পদ এবং সেনাবাহিনীকে ফরাসী স্বার্থে কাজে লাগিয়ে তার মাধ্যমে ভারত থেকে ইংরেজদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা করলেন। এই কৌশল কার্যকর করার ব্যাপারে একমাত্র বাধা হল নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ভারতীয় শাসকগণের বৈদেশিক শক্তির সাহায্য গ্রহণে অনীহা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শাসকগণ দেশাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ক্ষুদ্রস্বার্থের খাতিরে এবং নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের নিজ নিজ স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্যেই দেশের সামগ্রিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে দ্বিধা করত না।

আয়লা স্যাপেলের সন্ধির শর্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডুপ্লে গ্রহণ করেন। ইংরেজদের কাছে মাদ্রাজ প্রত্যর্পণের ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিল। কারণ, এইস্থানে ফরাসী আধিপত্য ভবিষ্যতে ফরাসী অধিকার বিস্তারের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করতেন।

যাই হোক, অচিরেই ডুপ্লের কাছে এক নতুন সুযোগ আসে। হায়দ্রাবাদের নিজাম আসফজার মৃত্যু হলে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে আসফজার দ্বিতীয় পুত্র নাসির জং এবং দৌহিত্র মুজাফর জং-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অন্যদিকে কর্ণাটকের নবাব দোস্ত আলির মৃত্যুর পর মারাঠাদের কবল থেকে মুক্ত দোস্ত আলির জামাতা চাঁদ সাহেব এবং নিজাম কর্তৃক নিযুক্ত কর্ণাটকের নবাব আনওয়ারউদ্দিনের সঙ্গে কর্ণাটকের উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূত্রপাত।

দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ

দেশীয় রাজগণের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ফরাসীদের কাছে প্রত্যাশিত সুযোগ এনে দিল। ডুপ্লে কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদের প্রশ্নে যথাক্রমে চাঁদ সাহেব ও মুজফ্ফর জংকে সমর্থন জানিয়ে তাদের কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে বসানোর জন্য অগ্রসর হন। এই দুই সিংহাসন-প্রত্যাশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে তিনি গোপন চুক্তি করলেন। ত্রিশক্তির মিলিত আক্রমণে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অম্বুরের যুদ্ধে আনোয়ারউদ্দিন নিহত হলেন। নিহত আনোয়ারউদ্দিনের পুত্র পলায়ন করে ত্রিচিনাপল্লীতে আশ্রয় নিলেন। চাঁদসাহেব কর্ণাটকের সিংহাসন লাভ করেন এবং ফরাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পণ্ডিচেরীর সংলগ্ন প্রায় আশিটি গ্রাম পুরস্কার হিসেবে ফরাসীদের দিয়ে দেন। হায়দ্রাবাদেও ফরাসীদের সাফল্য সূচিত হয় এবং নাসির জং নিহত হলে মুজফ্ফর জং হায়দ্রাবাদের নিজাম পদে নিযুক্ত হন। নবনিযুক্ত নিজাম ফরাসীদের পণ্ডিচেরীর কাছে কিছু ভূখণ্ড এবং বিখ্যাত শহর মুসুলিপত্তম এবং প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন দান করেন। উপরন্তু মুজফ্ফর জংকে পূর্ব তীরে কৃষ্ণা নদী থেকে আরম্ভ করে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের অংশের অবৈতনিক শাসক করা হল হায়দ্রাবাদে দক্ষ সেনাপতি বুসি-র (Bussy) অধীনে একটি ফরাসী বাহিনী মোতায়েন করা হল। প্রকাশ্যে নিজামের নিরাপত্তার জন্যে রাখা হলেও বস্তুতঃ নিজামের রাজদরবারে ফরাসী আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে মুজফফর জং রাজধানীর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়াকালীন নিহত হন। বুসি (Bussy) তৎক্ষণাৎ নিজাম-উল্-মুলকের তৃতীয় পুত্র সালাবৎ জংকে হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে বসালেন। পরিবর্তে নতুন নিজাম অন্ধ্রে মুস্তাফানগর, ইলোর, রাজমুণ্ডরী, চিকাকোল জেলাগুলি (যা উত্তর-সরকার নামে পরিচিত) ফরাসীদের দান করলেন।

দাক্ষিণাত্যে ফরাসী শক্তি সুদৃঢ় হল এবং এর প্রতিপত্তি অব্যাহত রইল। ডুপ্লের সফলতা তাঁর স্বপ্নকেও ছাপিয়ে গেল। যে-ফরাসী শক্তি ভারতীয় রাজন্যবর্গকে বন্ধু হিসেবে জয় করতে উদ্যত হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তারা আশ্রিত বা অনুচর রূপে প্রতিপন্ন হল।

এই পরিস্থিতিতে ইংরেজগণ তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের সফলতাকে নির্বাক দর্শকের ন্যায় দেখেনি। ফরাসীদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যকে খর্ব করে তাদের শক্তি-বৃদ্ধির জন্য নাসির জং এবং মহম্মদ আলির সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ তাদের পূর্ণশক্তি মহম্মদ আলির সমর্থনে নিয়োগ করলেন। ত্রিচিনপল্লীর দুর্গে আশ্রিত মহম্মদ আলিকে উৎখাত করার জন্য ডুপ্লে এবং চাঁদা সাহেবের সম্মিলিত বাহিনী ত্রিচিনপল্লীর দুর্গ আক্রমণ করল। ইতিমধ্যে মারাঠা-নেতা মোরাররাও ও তাঞ্জোরের রাজা ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করে। তথাপি মহম্মদ আলি ফরাসী বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ত্রিচিনপল্লীতেই রয়ে গেলেন।

চাঁদা সাহেব ফরাসীদের সঙ্গে ত্রিচিনপল্লী অবরোধে ব্যস্ত থাকাকালীন চাঁদা সাহেবের রাজধানীর অরক্ষিত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ (Clive) আর্কট আক্রমণ করে এবং দখল করে। এ অবস্থায় চাঁদা সাহেব ও ডুপ্লে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আর্কট উদ্ধারের জন্য ত্রিচিনপল্লী থেকে ফরাসী বাহিনীর একটি অংশ আর্কট-এ পাঠান। স্বভাবতই ত্রিচিনপল্লীতে ফরাসী শক্তি কমে যায় এবং ইংরেজরা এখানে ফরাসীদের পরাজিত করে । ফরাসী সেনাপতি জেকি-ল' এবং চাঁদা সাহেব ইংরেজদের হাতে বন্দী হন। পরে চাঁদা সাহেবকে হত্যা করা হয় এবং ইংরেজ সাহায্য পুষ্ট মহম্মদ আলি আর্কটের সিংহাসন লাভ করেন। ফরাসী কর্তৃপক্ষ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী হন। ডুপ্লের সম্প্রসারণ নীতি সমর্থনযোগ্য নয় বলে তাঁকে স্বদেশে ফিরিয়ে এনে গডেহুকে (Godehu) তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা হয় এবং সন্ধির শর্তানুসারে উভয়পক্ষ ভারতীয় রাজন্যবর্গের অভ্যন্তরীণ বিবাদে অংশ না গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাছাড়া, ইংরেজগণ উত্তর অঞ্চলে একটি নগর লাভ করে। অপরদিকে হায়দ্রাবাদে বুসি-র (Bussy) ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকে।

তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হলে ইংরেজ ও ফরাসীগণ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। স্বাভাবিক কারণেই ভারতেও ইংরেজ এবং ফরাসীগণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ কলকাতার সন্নিকটে ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর দখল করেন এবং ঐ বছরই পলাশীর যুদ্ধে বাংলার

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করে বাংলায় সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়।

১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্ট লালি পণ্ডিচেরীর শাসক নিযুক্ত হয়ে এসে সেন্ট ডেভিড দুর্গ দখল করে মাদ্রাজ অবরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফরাসী অভিযানকে সুসংহত করার জন্যে বুসিকে (Bussy) হায়দ্রাবাদ থেকে চলে আসতে বলেন। সম্ভবতঃ লালির (Lally) এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। কারণ, হায়দ্রাবাদ থেকে চলে আসার পর নিজামের দরবারে ফরাসী আধিপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই সুযোগে ফরাসীদের শূন্যস্থানে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে মাদ্রাজে একটি ব্রিটিশ নৌ-বহর পৌঁছলে লালি (Lally) মাদ্রাজ অবরোধ উঠিয়ে নেন।

ইতিমধ্যে ভারতে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলগুলি একে একে ইংরেজদের কবলে চলে আসে। অবশেষে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বন্দিবাসের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি স্যার আয়ারকূট-এর কাছে লালি (Lally) সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন এবং ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ পণ্ডিচেরী অবরোধ করে লালিকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। এর সাথেই ভারতে ফরাসী শক্তির অবসান ঘটে।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ও ইউরোপের বাইরে যথাক্রমে প্যারিসের সন্ধি এবং হিউবার্টসবার্গের সন্ধি অনুযায়ী সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। শর্তানুসারে পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে, জিঞ্জী প্রভৃতি স্থানগুলো ফরাসীদের শর্তসাপেক্ষে হস্তান্তর করা হল। ঠিক হল ভবিষ্যতে এগুলোকে ফরাসীগণ কেবলমাত্র বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত করতে পারবে। বাংলায় ফরাসীগণ কোনরূপ সৈন্য রাখতে পারবে না। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজয়ের ফলে ভারতে ফরাসী আধিপত্য বিস্তারের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হল এবং ফরাসী কোম্পানীরও বিলুপ্তি ঘটল। অপরদিকে, ইংরেজগণ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।" সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ সামগ্রিকভাবে এই বৃহৎ শক্তিগুলোর নৌ-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির সূচনা করে, যার ফলে সমুদ্রের ওপর আধিপত্য স্থাপনের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস এবং ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

একাধিক কারণে ভারতে ফরাসীগণ ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলতা লাভ করেনি। ফরাসী এবং ইংরেজ সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিল। স্বভাবতই নৌ-শক্তির বলে বলীয়ান না হলে এই যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। ফরাসীগণ এক্ষেত্রে ইংরেজদের তুলনায় দুর্বল ছিল। ফরাসী ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র অনেকাংশে তাঁদের পতনের জন্য দায়ী। ভারতে অবস্থিত ফরাসী কর্তৃপক্ষের একক বা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ,

ফরাসী ব্যর্থতার কারণ

কোম্পানির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ব্যাতিরেকে ফরাসী ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সামান্যতম সিদ্ধান্ত নিতেও অধিকার দেয়নি। প্রয়োজনে জরুরী সিদ্ধান্ত নেওয়া এদেশে ফরাসী কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ফরাসী সরকার প্রয়োজনভিত্তিক সাহায্য সময়মত পাঠাননি।

ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায় উপনিবেশ রক্ষা বা বিস্তৃতির ওপর খুব একটা আগ্রহশীল ছিলেন না। পূর্ব-ভারতে ইংরেজ ঘাঁটি থাকার ফলে বাংলার রসদপত্র ও অর্থের সাহায্য লাভের পথ ইংরেজদের পক্ষে সহজ হওয়ার ফলে ফরাসীরা বেশ বিপাকে পড়ে। দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধে ফরাসী-প্রধান ডুপ্লের ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত—যেমন, ত্রিচিনপল্লী দুর্গে আশ্রয়প্রাপ্ত মহম্মদ আলিকে দেরিতে আক্রমণের ফলে মহম্মদ আলির সঙ্গে ইংরেজদের যোগাযোগের সুবিধা হয়। ডুপ্লে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে ধরনের দক্ষ সেনাপতির প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে পারেনি। অপরপক্ষে, ইংরেজদের দক্ষ সেনাপতির সংখ্যা ছিল সুপ্রচুর। সম্ভবত রাজনৈতিক চতুরতা ফরাসীদের অপেক্ষা ইংরেজদেরই বেশি ছিল। ব্যক্তিগতভাবে ডুপ্লের দাম্ভিকতা ও উগ্রতা সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। নিদারুণ অর্থাভাব ফরাসীদের যুদ্ধ চালানোর ব্যাপারে বাধাস্বরূপ ছিল। সব শেষে ক্লাইভ আর্কট দখল করে ফরাসীদের নিদারুণ অসুবিধায় ফেলেন।

ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক বিকাশ

Growth of English East India Company's Commerce and Political Power)

চতুর্থ অধ্যায়

সপ্তদশ শতকে তৃতীয় দশকের প্রথমভাগে ইংরেজগণ প্রথমে পূর্ব ভারতে তাঁদের বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করেন উড়িষ্যাতে। তারপর ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব-ভারতে—বিহারে পাটনায়; উড়িষ্যার বালেশ্বর এবং বাংলার ঢাকায় ও মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে তাদের বাণিজ্যিক কেন্দ্রের পত্তন ঘটান। বাংলায় তাঁদের একটি স্বাধীন উপনিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ হুগলী দখল করার চেষ্টা করলে মোগলদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁ বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জব চার্নককে কলকাতা থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে উলুবেড়িয়াতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দিলেও মোগলদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সদ্য-প্রদত্ত অনুমতি প্রত্যাহার করলেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেব জব চার্নককে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনাশুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি দান করেন এবং কলকাতা জমিদারি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার প্রদান করা হয়। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জবচার্নক সুতানুটি গ্রামে এসে কলকাতা নগরীর পত্তন ঘটান। এবং ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুসারে কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গ স্থাপন করেন। এবং বাংলার বাণিজ্য কুঠিগুলিকে একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিলের অধীনে আনার ব্যবস্থা করা হয়।

অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকেই ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটে। অতিরিক্ত বাণিজ্যিক সুবিধার জন্যে ও কলকাতার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি ক্রয় করার জন্যে ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির তরফ থেকে জন সুরম্যানকে সম্রাট ফারুকশিয়ারের দরবারে পাঠান হয়। দু'বছর আলাপ আলোচনার পর ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ফরমান' প্রদান করা হয়। এই ফরমানের ফলে তিনি হাজার টাকার বিনিময়ে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার সহ এই সুযোগ প্রদানের জন্যে সম্রাটকে এক থেকে দশ হাজার টাকা প্রদান করে কোম্পানি নিজস্ব মুদ্রা প্রবর্তনের অধিকার লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার দক্ষ স্বাধীনচেতা নবাবদের সতর্ক দৃষ্টির ফলে ইংরেজ কোম্পানিকে দেয় সুবিধাগুলির অসদ্ব্যবহার ঘটাতে পারেনি। বস্তুতঃ তাঁদের এই সময় জমিদার ভিন্ন আর কোন ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

ইংরেজ কোম্পানির 'ফরমান' লাভ

বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রভুত্ব কায়েম সম্ভব হয় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পরমুহূর্তেই। ইতিপূর্বে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ সাধনের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবেই পরিগণিত হয়। এই যুদ্ধ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বাংলায় কার্যকরী করে।

বস্তুতঃ বাংলা ছিল ভারতের সবচেয়ে সম্পদশালী এবং তুলনামূলকভাবে উৎকর্ষপূর্ণ প্রদেশ। এই অঞ্চল শিল্প ও বাণিজ্যে ছিল বহুলাংশে উন্নত। ফলে ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তাঁর কর্মচারীবৃন্দের বাংলায় ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল মুনাফা-জনক। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া ফরমানের মাধ্যমে ইংরেজগণ বাংলার বন্দরগুলিকে বিনাশুল্কে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহারে সফল হয় এবং একে কেন্দ্র করেই তারা রপ্তানি ও আমদানিকৃত জিনিসপত্রের চলাচলের ওপর শুল্ক লাভের অনুমতিপত্র বা 'দস্তক' প্রদান করতে আরম্ভ করে। উপরন্তু ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীগণকেও ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁরা এই ফরমানের আওতার বাইরে ছিল। তাঁদের অবশ্য ভারতীয় বণিকদের সমপরিমাণ কর দিতে হত। ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবদের ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষের মূলেই ছিল এই 'ফরমান'। এর কারণ, (১) এই ফরমানের ফলে বাংলা সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হত (২) কোম্পানির ব্যবসায়ী সামগ্রীর জন্য দেয় দস্তক বা অনুমতি পত্র বে-আইনিভাবে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যবহার করে নিজেদের ব্যবসার ক্ষেত্রে কর ফাঁকি দিত। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে আলীবর্দী খাঁ পর্যন্ত বাংলার নবাবগণ ইংরেজদের ফরমান সংক্রান্ত ব্যবসায় আপত্তি করে এসেছেন। তাঁরা কোম্পানিকে পরিবর্তে থোক টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে বাধ্য করে দস্তক-এর অপব্যবহার বন্ধ করেন। কোম্পানি নবাবের এই আদেশ মানতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কর্মচারীগণ সর্বদাই সুযোগমত নবাবের কর্তৃত্ব অস্বীকার করত ও কর ফাঁকি দিত।

বিরোধের সূত্রপাত

এই রেষারেষির ফলে পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলার নবীন নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের মুর্শিদকুলি খাঁ-এর সময়ে প্রচলিত প্রথায় ব্যবসা করতে আদেশ দিলেন। দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্যে শক্তি সঞ্চয়কারী ইংরেজগণ নবাবের এই নয়া হুকুমনামা অমান্য করেন। সমসাময়িককালে ভারতীয় রাজন্যবর্গের দুর্বলতাও ইংরেজদের এই ঔদ্ধত্যকে জোরদার করে। নবাবকে কর দেওয়ার পরিবর্তে তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে চলাচলকারী ভারতীয় পণ্যের ওপর দ্বিগুণ কর স্থাপন করে। ইংরেজদের এই কার্যকলাপ নবাবকে ইংরেজ-বিদ্বেষী করে তোলে এবং ইংরেজরা সম্ভবতঃ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কাকেও বাংলার মসনদে বসানোর জন্যে ষড়যন্ত্র করছে বলে নবাব সন্দেহ করতে আরম্ভ করলেন। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করল যখন ইংরেজরা চন্দননগরে অবস্থানকারী ফরাসীদের সম্ভাব্য আক্রমণের অছিলায় নবাবের অনুমতি ব্যাতিরেকে কলকাতাকে সুরক্ষিত করার কাজ শুরু করলেন। সঙ্গত কারণেই ইংরেজদের এই কার্যকলাপ নবাব তাঁর সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ বলেই মনে করলেন। একজন স্বাধীন নবাবের পক্ষে বেসরকারী বণিক সংস্থাকে তাঁর রাজ্যে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বা দুর্গ তৈরির জন্য অনুমতিদান কখনই

যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। উপরন্তু নবাব মনে করলেন যে যদি তিনি ইংরেজ এবং ফরাসীদের বাংলায় যুদ্ধ করতে অনুমতি দেন তবে তাঁর ভাগ্যও কর্ণাটের নবাবদের মতোই হবে। এককথায় সিরাজ এই ইউরোপীয় সংস্থাকে নেহাতই বণিকের ভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন; এবং অবশ্যই প্রভুর ভূমিকায় নয়। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদের যথাক্রমে কলকাতা ও চন্দননগরের দুর্গগুলি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তাঁদের পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত না হতে বলেন। নবাবের এই আদেশ ফরাসীগণ মেনে নিলেও ইংরেজগণ

সিরাজ ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে সংঘাত

সিরাজদ্দৌলা

মিরজাফর

এতে কর্ণপাত করলেন না। তাই ইংরেজগণ স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলায় পূর্ববৎ অবস্থান করে এবং তাঁদের নির্ধারিত নীতিকেই ব্যবসা চালানোর মনোভাব ব্যক্ত করলেন। ইংরেজগণ বাংলায় তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য এক অধিকার দাবি করে নানা অসদুপায়ে ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা-আরোপিত সনদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে। শোনা যায় এই কার্য সম্পাদনে তাঁরা রাজা, রাজনীতিবিদ এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের ৮০ হাজার পাউণ্ড উৎকোচ হিসেবে দেন। ইংরেজদের এই আচরণ কোন নবাবের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের এই প্রয়াসের সুদূরপ্রসারী ফলাফল বুঝতে পেরেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তিনি ইংরেজদের দেশের আইন মানতে বাধ্য করলেন।

পরিকল্পিত তৎপরতার অভাব এবং উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়াই নবাব কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠি অবরোধ করলেন এবং কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং ১৭৫৩ সালের ২০শে জুন ফোর্ট উইলিয়ম দখল করলেন। ফোর্ট উইলিয়ম দখল করার অব্যবহিত পরেই জয়ের উল্লাসে ইংরেজদের প্রয়োজনীয় প্রহরা ছাড়াই কলকাতা ত্যাগ করে ইংরেজদের জাহাজগুলোকে পলায়নের সুযোগ করে দিয়ে গেলেন। সম্ভবত শত্রুপক্ষের শক্তির প্রকৃত মূল্যায়ন করতে না পারার জন্যেই নবাব এই মারাত্মক ভুল করলেন।

নবাবের পক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম দখল

ইংরেজ অফিসারগণ তাঁদের নৌ-শক্তির প্রাধান্যের বলে সমুদ্র-নিকটবর্তী ফলতায়

আশ্রয় নিলেন। সেখানে একদিকে তাঁরা মাদ্রাজ থেকে সাহায্য লাভের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করলেন এবং নবাবের প্রাসাদের কিছু মুখ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জাল বুনতে শুরু করলেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিরবক্স, মিরজাফর, মানিকচাঁদ, ধনী ব্যবসায়ী আমীর চাঁদ, বাংলার প্রধান মহাজন জগৎ শেঠ এবং নবাবের কয়েকটি সেনাবাহিনীর প্রধান খাদিম খাঁ। শীঘ্রই অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে এক বিরাট শক্তিশালী নৌ-সেনাবাহিনী ইংরেজদের সাহায্যকল্পে ফলতায় অবতরণ করল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গোড়াতেই ক্লাইভ কলকাতা পুনরুদ্ধার করলেন। সিরাজ সেই সংবাদ পাওয়ামাত্র পুনরায় কলকাতা আক্রমণ করেন এবং কিছুদিন পরে আলিনগরের সন্ধির (৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) মাধ্যমে শান্তি স্থাপিত হয়। আলিনগরের সন্ধির শর্তগুলি অবশ্যই নবাবের পক্ষে মানহানিকর ছিল। এই সন্ধির ফলে (১) দিল্লীর সম্রাট থেকে প্রাপ্ত ইংরেজদের সকল বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা নবাব স্বীকার করে নিলেন, (২) কলকাতা আক্রমণের সময় ইংরেজ কোম্পানির ও কোম্পানির কর্মচারীদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ দিতে নবাব স্বীকৃত হলেন, (৩) নবাব কলকাতায় কোম্পানিকে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেন এবং (৪) কোম্পানির নিজস্ব মুদ্রা প্রবর্তনের অধিকারও মেনে নেওয়া হয়।

আলিনগরের সন্ধি

আলিনগরের সন্ধি-পত্র সিরাজ ও ইংরেজদের সাময়িক মিত্রতা স্থাপন করলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়ের বিদ্বেষ প্রশমিত হল না। ইংরেজ উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করে প্রয়োজনমত সিরাজকে বাংলার মসনদচ্যুত করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রইলেন। তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসীদের লিপ্ত থাকার সুবাদে বাংলায়ও এই দুই শক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ সরাসরি নবাবের আদেশ অমান্য করেই ফরাসীদের অধীনস্থ চন্দননগর দখল করেন। এই সময় আহমদশাহ আবদালীর দিল্লী অধিকার ও তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুঠতরাজের ঘটনায় সিরাজ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলে এ অবস্থায় তিনি ইংরেজগণকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস করলেন না।

বাংলায় ফরাসী শক্তির সম্পূর্ণ পরাজয়ের ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবের ফরাসী সাহায্য লাভের আশাও বিনষ্ট হল। পলাতক ফরাসীদের মুর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ এবং দাক্ষিণাত্যে ফরাসী শাসক বুসির সঙ্গে সিরাজের যোগাযোগ ইংরেজদের পক্ষে সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। প্রকারান্তরে তারা উপলব্ধি করলেন যতদিন সিরাজ বাংলার সিংহাসনে আসীন থাকবে ততদিন বাংলাদেশে ইংরেজ স্বার্থ নিরাপদ নয়। স্বভাবতই ইংরেজদের মনোনীত প্রার্থীকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসানোর জন্যে তারা বদ্ধপরিকর রইল।

এই সময়ে মুর্শিদাবাদে সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র পূর্ণ আকার লাভ করার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। বাংলার বিশিষ্ট ধনী-ব্যক্তি জগৎ শেঠ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রভৃতি সিরাজকে অপসারিত করে মিরজাফরকে মসনদে বসাবার ষড়যন্ত্র করলেন। জগৎ শেঠের দেওয়া প্রাথমিক প্রস্তাব মিরজাফর প্রত্যাখ্যান করলেও তাঁরা যখন ইয়ার লতিফ খাঁকে মনোনীত করতে উদ্যোগী হলেন তখন

মিরজাফর এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। মিরজাফর ছিলেন নবাব আলীবর্দীর ভগ্নীপতি ও বাংলার সিপাহ-সালার। এই প্রস্তাব কলকাতাস্থিত ইংরেজ সিলেক্ট কমিটি সানন্দচিত্তে গ্রহণ করল। ক্লাইভের এই ভূমিকাকে ইংরেজ ঐতিহাসিক হুইলার (Wheeler) নিন্দা করে বলেন যে এই কাজ ক্লাইভের পক্ষে খুব মর্যাদাসম্পন্ন হয়নি। ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ হলে ক্লাইভ কতকগুলো অসম্ভব দাবি নবাবের কাছে উত্থাপন করলেন ও সামান্য অজুহাতে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভাগীরথীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করলে ভারতের স্বাধীনতার শেষ নক্ষত্রটি চিরতরে নির্বাপিত হল। সিরাজ পরাজিত হয়ে পলায়নকালে মিরজাফরের পুত্র মিরনের দ্বারা নিহত হন।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

পলাশীর যুদ্ধ

পলাশীর যুদ্ধকে বৃহৎ যুদ্ধের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। যদিও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য অস্বীকার করা সম্ভব নয়। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় নগ্নভাবে ভারতের দুর্বলতা প্রকাশ করল। বাংলায় এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হল। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কবি নবীনচন্দ্র সেন পলাশীর যুদ্ধকে ভারতের পক্ষে এক বিষণ্ণ, হতাশা ও অন্ধকারময় রাত্রি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ফলাফল

ইংরেজ ঐতিহাসিক এস· সি· হিল অবশ্য ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাতের জন্য সিরাজকেই দায়ী করেন। তাঁর মতে নবাব দরবারে হিন্দু অভিজাতগণ মুসলিম শাসন আর বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। ভারতীয় ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্র ও অধ্যাপক ব্রিজিন গুপ্ত অবশ্য হিলের মতামতকে পক্ষপাতদুষ্ট ও ভিত্তিহীন বলে বর্ণিত করেছেন।

পলাশীর যুদ্ধকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগসূত্র হিসেবে গ্রহণ করলে অত্যুক্তি হবে না।

পলাশীর যুদ্ধের সামগ্রিক কারণ ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে এই যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয় এবং বাংলায় দেশীয় বণিকদের পরিবর্তে ইংরেজদের একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরাজয়ের পশ্চাতে মূল নায়ক মিরজাফর বাংলার মসনদে বসলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ক্ষমতা বহু পরিমাণে খর্ব করে অর্থনৈতিক ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে ইংরেজদের হাতে চলে আসে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বাংলার ক্ষমতা ইংরেজদের হস্তগত হয়। ইংরেজগণ বাংলার কোষাগার থেকে প্রায় সব অর্থই নানা অজুহাতে বাইরে নিয়ে যায় এবং ফলে বাংলায় অর্থনৈতিক দুর্দশার যুগ শুরু হয়।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভারতে ফরাসীদের শুধু বাংলা থেকে হাত গুটাতে হয় নি, দাক্ষিণাত্যে তাঁদের চূড়ান্ত পরাজয়ও ঘটে এবং ভারতে ভবিষ্যতে আধিপত্যের কোন সুযোগই আর রইল না।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন যে, পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলায় মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং পরিবর্তে ইউরোপীয় প্রভাবের সংস্পর্শে এদেশে

নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তার ফলে বাংলায় নবজাগরণের ঢেউ দেখা যায়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ যাবৎ ইংরেজ কোম্পানি ভারতীয় রাজন্যবর্গের অনুগ্রহ ও ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজগণ প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হল।

ইংরেজগণ বাংলার সমস্ত সম্পদ গ্রাস করতে উদ্যোগী হল এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মিরজাফর তাঁদের কাছে সোনার থলিতে পরিণত হল। অর্থাৎ যখন যেভাবে প্রয়োজন, এতে হাত দিলেই তাঁদের লোভ ও অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে—এটাই বোঝা গেল। এককথায় বাংলা যেন তাঁদের 'কামধেনু'। বাংলার সম্পদে বোম্বাই এবং মাদ্রাজ বিভাগের সমস্ত খরচ চালানোর নির্দেশ জারী করা হল।

নবনিযুক্ত নবাব মিরজাফর উপলব্ধি করলেন যে তাঁর পক্ষে ইংরেজ কোম্পানি এবং কোম্পানির কর্মচারীগণের অর্থনৈতিক চাহিদা ও দাবি মেটানো সম্ভব নয়। সঙ্গত কারণেই ইংরেজগণ মিরজাফরের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁকে মসনদ থেকে সরানোর পরিকল্পনা করলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মিরজাফরকে মসনদচ্যুত করে তাঁর জামাতা মিরকাশিমকে বাংলার নবাব নিযুক্ত করলেন।

মিরকাশিমের নবাবী লাভ

মিরকাশিমকে নবাবী পদে নিযুক্ত করার পুরস্কারস্বরূপ তিনি ইংরেজ কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী প্রদান করে বাংলার গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও কোম্পানির উচ্চপদস্থ অধিকর্তাদের ২৯ লক্ষ টাকা নগদ অর্থ দেন। এইভাবেই বাংলার নবাবী বিক্রয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং ইংরেজগণের পক্ষে এটা খুবই লাভজনক বলে প্রতিপন্ন হয়।

নবাব মিরকাশিম ছিলেন দক্ষ, দূরদর্শী ও শক্তিশালী শাসক। তিনি নিজেকে পুরোপুরি বিদেশী শক্তির কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। মিরকাশিম স্বভাবতই ইংরেজদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে আঘাত করলেন। তিনি প্রথমেই বুঝেছিলেন যে মিরজাফর-এর সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পিছনে ছিল আর্থিক দুরবস্থা, সামরিক দুর্বলতা এবং সর্বোপরি ইংরেজদের অর্থলোলুপতা। মিরকাশিম মনে করেছিলেন যে বাংলার নবাবী লাভের জন্য কোম্পানি ও তাঁর কর্মচারীদের যথার্থ অর্থ তিনি প্রদান করেছেন। তাই ইংরেজদের উচিত তাঁর ইচ্ছামতো বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করার ব্যাপারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ না করা।

ইংরেজগণ মিরকাশিমের স্বাধীনভাবে অবস্থান করার ও তাঁর পরিকল্পিত অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচি এবং দক্ষ সেনাবাহিনী গঠনের ইচ্ছা কোন মতেই পছন্দ করলেন না। ফরমান-এর উপযুক্ত ব্যবহার এবং 'দস্তক' বা বিনাশুল্কে ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি বন্ধে মিরকাশিমের তৎপরতা ইংরেজগণের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। দস্তক-এর ব্যাপক অপব্যবহারের ফলে সৎ ভারতীয় বণিকদের প্রভূত লোকসান হতে আরম্ভ করল এবং ফলস্বরূপ নবাব মুখ্য রাজস্ব আয়ের থেকে বঞ্চিত

মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘাত

হলেন। উপরন্তু ইংরেজদের নতুন শক্তি বৃদ্ধি ও তাঁদের সামনে সম্পদ আহরণের লালসা-উদ্বুদ্ধ নবাবের কর্মচারীরাও দুঃস্থ বাংলার জনগণের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। ভারতীয় জমিদার ও নবাবের কর্মকর্তাদের ঘুষ ও উপঢৌকন দিতে তাঁরা বাধ্য করত। ভারতীয় কারিগর,

কৃষক ও বণিকগণকে তাঁদের প্রস্তুত করা জিনিস কম দামে বিক্রয়ে বাধ্য করে ইংরেজদের জিনিস বেশি দামে ক্রয় করতে বাধ্য করেছিল। কোম্পানির আদেশ অমান্যকারীদের কঠোর সাজা দান করার ব্যবস্থা চালু করে। ঐতিহাসিক পার্সিভেল স্পিয়ার এই বছরগুলোকে নগ্ন লুঠতরাজের বছর বলে অভিহিত করেছেন।

এই সকল অন্যায় ব্যবস্থা চালু থাকলে নবাবের পক্ষে কখনই ইংরেজের কবল থেকে মুক্তি সম্ভব ছিল না বলেই মিরকাশিম অচিরেই কঠোর ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশীয় ব্যবসায়ীর ওপর থেকে সমস্ত শুল্ক রেহাই দিয়ে নিজের প্রজাদের সুযোগ উন্মুক্ত করেন। বৈদেশিক বণিকগণ কোনমতেই নবাবের প্রবর্তিত ব্যবস্থা, যার দ্বারা তাঁদের এবং দেশীয় বণিকদের একই পর্যায়ভুক্ত করা সহ্য করতে নারাজ ছিল। বিদেশী বণিকগণ দেশীয় বণিকদের উপর পুনর্বার শুল্ক স্থাপনের জন্য-দাবি জানায়। নবাব মনে করতেন যে তিনি স্বাধীন আর স্বভাবতই তিনিই বাংলার প্রভু। অপরপক্ষে ইংরেজগণ মিরকাশিমকে তাঁদের হাতের ক্রীড়নক হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন বলেই বাংলার নবাবী তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল বলে দাবি করতেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থা বাংলার নবাবের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পরিপন্থী ছিল। মিরকাশিম কর্তৃক শুল্কবিহীন বাণিজ্যের ঘোষণা ইংরেজদের স্বার্থে আঘাত করল। পাটনার ইংরেজ বাণিজ্যকুঠির এজেন্ট এলিস (Ellis) পাটনা দখল করলে মিরকাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মিরকাশিম ক্রমান্বয়ে কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। এই সময় বিধ্বস্ত মিরকাশিম উপায়ান্তর না দেখে অযোধ্যায় পলায়ন করে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা এবং পলাতক মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্-আলম-এর সঙ্গে এক জোট তৈরি করেন এবং তাঁদের সম্মিলিত বাহিনী ২২শে অক্টোবর ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মুনরোর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ইংরেজ বাহিনী কর্তৃক অযোধ্যা বিধ্বস্ত হয় এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্-আলম ইংরেজ পক্ষে যোগ দেন। মিরকাশিম পলায়ন করে এবং ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বক্সারের যুদ্ধ ১৭৬৪

বক্সারের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হিসেবে পরিগণিত হয়। এই যুদ্ধে ভারতীয় সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সফলতা ইংরেজ সমরাস্ত্রের উৎকর্ষের প্রমাণ বহন করে। এই যুদ্ধের গুরুত্ব হিসেবে বলা যায় যে, বাংলার নবাবের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। তখন থেকে নবাবের সৈন্যবাহিনী হ্রাস করা হয় এবং নবাবের দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা হয়। অযোধ্যার নবাব কার্যতঃ কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন হন, এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ওপর প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। ভারতীয় জনসাধারণ ও রাজন্যবর্গের কাছে ইংরেজদের সম্মান ও প্রতিপত্তি অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।

গুরুত্ব

বক্সারের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পরিপূরক। অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ যে ক্ষমতা লাভ করেছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করলে বক্সারের যুদ্ধের পর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি বাংলার নবাব নিজাম-উদ্ দৌলা সিংহাসন লাভের বিনিময়ে বাংলার ইংরেজ গর্ভনরের সঙ্গে একটি নতুন চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন। এই চুক্তির ফলে নবাবের সৈন্যবাহিনী বাতিল করা হয় এবং শাসনকার্য পরিচালিত করার জন্যে ইংরেজ মনোনীত একজন 'নায়েব সুবা' (Deputy Subhadar) নিযুক্ত করা হল এবং ইংরেজদের অনুমতি ব্যতিরেকে এই 'নায়েব সুবাকে' পদচ্যুত করা চলবে না বলে স্থির করা হল। বাংলার কাউন্সিলের সদস্যগণ নতুন নবাবের কাছে পনের লক্ষ টাকা আদায় করলেন।

রোহিলখণ্ড অধিকার

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজদের প্রতি বৈরী-ভাবাপন্নগণ প্রচার আরম্ভ করেন যে ইংরেজগণ ভারতে মুসলিম শক্তি ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। তাই এই অবস্থায় দ্বিতীয় শাহ-আলমের মৈত্রী অর্জন করে এই অপপ্রচার বন্ধ করাই ছিল কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য। এই সাফল্যের ফলস্বরূপ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। তখন থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ইংরেজদের হাতে ন্যস্ত হয়। দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরেজদের এই আইনসঙ্গত রাজস্ব আদায়ের অধিকার স্থাপিত হল। ভারতের সবচেয়ে সম্পদশালী প্রদেশের রাজস্বের পুরোপুরি কর্তৃত্ব ইংরেজরা লাভ করল। পরিবর্তে ইংরেজগণ সম্রাট শাহ-আলমকে বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর দানে সম্মত হয়। সম্রাটের সম্মানার্থে অযোধ্যার নবাবের থেকে প্রাপ্ত কারা ও এলাহাবাদ সম্রাটকে দেওয়া হয়।

সম্রাট দ্বিতীয় শাহ-আলমের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের মাধ্যমে দেওয়ানী লাভ ইংরেজদের পক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে ভবিষ্যতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসকে জোরদার করে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কোম্পানির সার্বভৌমত্বের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় এই দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে। ক্রমে কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হল। এই দেওয়ানী লাভ প্রকৃতপক্ষে বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপনের তৃতীয় ও শেষ অধ্যায়। তাছাড়া ইংরেজ-আশ্রিত অযোধ্যা রাষ্ট্রে মারাঠাদের অগ্রসরের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান ইংরেজদের ওপর ভবিষ্যতে কোন আক্রমণের বন্ধকতা সৃষ্টির ব্যবস্থা হল।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (১৭৬৭-১৮৫৭)

British Imperial Expansion (1767-1857)

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার লাভের সঙ্গে তদানীন্তন ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওতপ্রোত যোগ আছে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল এবং অবশেষে বক্সারের যুদ্ধের বিপর্যয় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পরাজয়ের পরিপূর্ণ যবনিকাপাত ঘটায় এবং সেই সঙ্গে শুরু হয় ইংরেজদের অধীনে পরাধীন ভারতের লজ্জাকর অধ্যায়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার অনতিকালের মধ্যেই ইংরেজদের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। কার্যতঃ বাংলার নবাব ও তাঁর পুরোপুরি নিরাপত্তা ইংরেজদের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। বস্তুতঃ, ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিপূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার অসহায় অবস্থার সুযোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সুকৌশল নীতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ভূমিকা

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে গুরুত্বপূর্ণ শক্তিরূপে প্রতিপন্ন হয় বাংলার ওপর তাদের কর্তৃত্ব ও অধিকার সুদৃঢ় করার জন্যে নতুন বিজয় অভিযানের মাধ্যমে। স্বভাবতই ইংরেজদের ভারতীয় রাজন্যবর্গের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবিস্তার ও অর্থের লোলুপতা তাদের কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত করে।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ দাক্ষিণাত্যে সরকার লাভের জন্যে মহীশূরের হায়দার আলির বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদের নিজামকে সাহায্যদানের জন্যে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু হায়দার আলির শক্তির কাছে ইংরেজগণ কোনদিক দিয়েই সমকক্ষ ছিল না। ফলে হায়দার সহজেই ইংরেজদের বিতাড়িত করে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কাউন্সিল হায়দারের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়। সন্ধির শর্তানুসারে উভয় পক্ষই পরস্পর পরস্পরকে তাঁদের বিজিত স্থানগুলি ফিরিয়ে দেয় ও যুদ্ধ বন্দীদের প্রত্যার্পণ করে। স্থির হয় যে, কোনও তৃতীয় শক্তির দ্বারা উভয়ের কেউ আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে। দেখা যায় যে, ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে হায়দার আলিকে মারাঠারা আক্রমণ করলে ইংরেজগণ পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হায়দারকে সাহায্য করল না। এই ঘটনায় হায়দার আলি ইংরেজদের ওপর বিশ্বাস হারান এবং তাঁদের ওপর রুষ্ট হন।

মহীশূরের-এর সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক

মারাঠা

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এইসময় পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও এবং রঘুনাথ রাও-এর মধ্যে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মারাঠাদের এই শক্তিলাভের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে বোম্বাই সরকার সুরাটের সন্ধির মাধ্যমে রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ অবলম্বন করে। ইংরেজগণ মূলতঃ এই সুযোগে মাদ্রাজ ও বাংলার ইংরেজদের আর্থিক লাভ এবং সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে সচেষ্ট হয়। এর ফলে, ইংরেজগণ মারাঠাদের সঙ্গে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

ইঙ্গ মারাঠা সম্পর্ক

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সরকার রঘুনাথ রাও-কে সাহায্য করার সম্মতি বাতিল করে পুরন্দরের সন্ধির (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) মাধ্যমে রঘুনাথ রাও-এর বিরুদ্ধে পেশোয়া মাধব রাও-কে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিনিময়ে কোম্পানি মারাঠাদের কাছ থেকে সলসেট বন্দর লাভ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হলে ডাইরেক্টর সভার নির্দেশে ওয়ারেন হেস্টিংস রঘুনাথ রাওকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজবাহিনী তেলিগাঁও-এর যুদ্ধে মারাঠাদের কাছে পরাস্ত হয়।

ভারতে ব্রিটিশশক্তির কাছে এই সময় ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। সমস্ত মারাঠা প্রধান জানত যে, দক্ষ পেশোয়া নানা ফড়নবীশের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী গোষ্ঠী ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। কার্যতঃ দক্ষিণ-ভারতের দেশীয় শক্তিবর্গের মধ্যে এ-যাবৎ ইংরেজদের দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকে কেন্দ্র করে অসন্তোষের ধূম্রজাল তৈরি হয়। এই সুযোগে মহীশূরের হায়দার আলি ও হায়দ্রাবাদের নিজাম এই সময়কে সদ্ব্যবহার করে একত্রিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উপযুক্ত মুহূর্ত বলে মনে করলেন। স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজগণ একত্রিত শক্তিশালী মারাঠা, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদের শক্তির সম্মুখীন হয়। উপরন্তু বিদেশে ভারতের বাইরে এইসময় ইংরেজগণ আমেরিকায় উপনিবেশগুলিতে বিভিন্ন যুদ্ধে অকৃতকার্য হয় এবং ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐসব অঞ্চলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সঙ্গে তাদের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ফরাসীদের অভিসন্ধির বিরুদ্ধাচারণের ব্যাপারে তাদের সজাগ থাকতে হয়।

ভারতে এই সময় ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ন্যায় একজন বিচক্ষণ তেজস্বী ও দক্ষ শাসকের পরিচালনায় মুহ্যমান ব্রিটিশশক্তি মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। সুযোগ্য সেনাপতি গডার্ডের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী মধ্যভারতের কিছু অংশে সফল সামরিক অভিযান পরিচালনা করে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ দখল করে। ইংরেজগণের কাছে মারাঠাগণ অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সম্ভাবনাময় শক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন হল। মারাঠা নায়ক মাহাদাজী সিন্ধিয়ার মতো দৃঢ় ও শক্তিশালী নেতার বিরুদ্ধে ইংরেজগণ যুদ্ধ করতে ভয় পায়। কোন পক্ষই জয়লাভে সমর্থ হল না এবং যুদ্ধে এক অচলাবস্থা দেখা যায়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাহাদাজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সলবাই-এর সন্ধির ফলে প্রথম

সলবাই-এর সন্ধি

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। এর দ্বারা যুদ্ধ-পূর্ব স্থিতাবস্থা ফিরে আসে এবং ইংরেজগণ আপাতত সম্মিলিত ভারতীয় শক্তির বিরোধিতার হাত থেকে রক্ষা পায়।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ এবং সলবাই-এর সন্ধি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সলবাই-এর সন্ধির ফলে যদিও ইংরেজগণ সলসেট লাভ করল। কার্যতঃ হেস্টিংস-এর মারাঠা নীতি ফলপ্রসূ হল না। কারণ, এই যুদ্ধে ইংরেজদের অনেক আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়। এই আর্থিক দুরবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্যে হেস্টিংস অনেক অবৈধ এবং আপত্তিকর পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে হেস্টিংস পরবর্তীকালে অভিযুক্ত হন।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্য এই সন্ধিতে ইংরেজদের লাভ হয়। কারণ, দীর্ঘ বিশ বছর মারাঠাদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার ফলে তাঁদের দৃষ্টি উপযুক্তভাবে নিক্ষিপ্ত হয় টিপু সুলতান, ফরাসী, নিজাম ও অযোধ্যার নবাব প্রভৃতি শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং তাতে ইংরেজগণের সাফল্য সূচিত হয়। বাংলায় তাঁদের শক্তিকে সুদৃঢ় করার পক্ষে এই সময়ের প্রয়োজন ছিল এবং ইংরেজগণ এই সময়ের উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের দ্বারা পূর্ব-ভারতে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করে। অপরপক্ষে, মারাঠাগণ নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রবলতার ফলে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সলবাই-এর সন্ধির ফলে প্রত্যক্ষভাবে মহীশূরের উপর ইংরেজদের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং ইংরেজগণ তাঁদের হৃত স্থানসমূহ মহীশূরের কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে।

ব্রিটিশশক্তি পুনর্বার ভারতীয় শক্তিগুলির মধ্যে বিভেদের বীজ ছড়াতে সক্ষম হয়। পরোক্ষভাবে এই সন্ধি ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে সলবাই-এর সন্ধির পর ভারতে মারাঠা-শক্তির পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা নানা ফড়নবিশ পর্যন্ত বেশ গুরুত্বলাভ করে। দক্ষিণ-ভারতে মহীশূর সাম্রাজ্য প্রায় বিলীন হওয়ার উপক্রম হয় এবং মারাঠাগণের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁদের শক্তিকেও খানিকটা দমিয়ে দেয়। স্বভাবতই ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি কার্যকরী করার অনুকূলেই ছিল এবং তাঁদের কাছে তা লাভজনক বলেই প্রতিপন্ন হয়। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিকাশের পথ সগম হয়। ওয়েলেসলি রাজনৈতিক চিন্তাধারায় উগ্র সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় শক্তি যখন একে একে ব্রিটিশ প্রসারতার নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করল তখন মারাঠাগণই ছিল ব্রিটিশ আওতার বাইরে একমাত্র ভারতীয় প্রধান শক্তি। ওয়েলেসলি ভারতীয় রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ন্যক্কারজনক হস্তক্ষেপ শুরু করেন।

এই সময়ে পাঁচ মুখ্যপ্রধান মারাঠাগণকে যেমন পুনার পেশোয়া (প্রধান), বরোদার গাইকোয়াড়, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, নাগপুরের ভোঁসলেকে নিয়ে মারাঠা রাষ্ট্রসংঘ (Maratha Confederacy) নামেই মারাঠা সাম্রাজ্য অভিহিত হত।

এই মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের ঐক্যের জন্য মূলতঃ কৃতিত্ব ছিল মারাঠা-নেতা নানাফড়নবিশের। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানাফড়নবিশের মৃত্যু হলে মারাঠা রাষ্ট্র-সংঘের

ভাঙন দেখা দেয় এবং মারাঠা প্রধানগণ পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। এই সময় সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ছিল,. এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে যখন ভারতে এক বিদেশী শক্তি সাম্রাজ্যবিস্তারে উন্মুখ এবং এই বিপদের ঝুঁকি সত্বেও মারাঠাগণ নিজেদের সার্বিক স্বার্থকে উপেক্ষা করল।

ওয়েলেসলি মারাঠাগণের নানা পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্বের দুর্বল মুহূর্তে মারাঠা শক্তিবর্গকে পারস্পরিক আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হবার জন্যে অনুরোধ করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব নিয়ে প্রথম সংঘর্ষ বাধে। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ালীর দিন হোলকার ও সিন্ধিয়া পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওকে আক্রমণ করলে ভীত বাজিরাও ইংরেজদের শরণাপন্ন হন এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেসলির সঙ্গে তাঁর অনুসৃত 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র নীতির প্রচ্ছদপট বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষর করলেন। বস্তুতঃ ইংরেজদের আশা বাস্তবে পরিণত হল। প্রসঙ্গতঃ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর কর্তৃপক্ষকে লিখিত ওয়েলেসলির পত্রের সারমর্মে ব্যক্ত হয় যে, পরিস্থিতির জটিলতা বিচার করে ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ ও শক্তিকে পুরোদমে স্থিতিশীল করতে অনুকূল এই মুহূর্তে মারাঠা সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে হলে ব্রিটিশদের এখানে কোন পক্ষের সঙ্গে সংঘাতে না গিয়ে একটা সম্পর্ক গড়া সম্ভব।

বেসিনের সন্ধির প্রেক্ষাপট এবং এর ফল ওয়েলেসলির কূটনৈতিক বুদ্ধির সাফল্যের ইঙ্গিত বহন করে। ওয়েলেসলির কাছে এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে সমস্ত মুখ্য মারাঠাগণ ক্রমে ক্রমে তাঁর অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হবে। তবে এই জয়যাত্রা বাধাহীন হবে না–এটা অবশ্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এবং স্বভাবতই মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেননি, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে মারাঠাগণ তাঁদের ঐতিহ্যময় স্বাধীনতাকে যুদ্ধ ব্যতিরেকে কখনই বিসর্জন দেবে না।

বেসিনের সন্ধি বিশ্লেষণে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে আগামী দিনে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সম্ভাবনা অচিরেই দেখা দেবে। ক্রমান্বয়ে মারাঠা প্রধানগণ ওয়েলেসলির অনুসৃত 'অধীনতামূলক মিত্রতা' গ্রহণ করবে এবং প্রায় বিনা-যুদ্ধেই মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাঁর দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন হবে। ওয়েলেসলির এই ধারণা ঠিক না হলেও তার পরবর্তী আশঙ্কাই সত্য হয়ে উঠল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও-এর অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধতা অন্যান্য মারাঠা নায়কগণের কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হয়ে উঠল। কারণ, এভাবে তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মারাঠাগণের মধ্যে এই বিবেকের আহ্বান এবং শীঘ্রই পেশোয়ার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্তবোধ বিচ্ছিন্ন মারাঠা প্রধানগণের মধ্যে সম্ভবতঃ সেই অপমানকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা দেখা দিল।

বেসিনের সন্ধি

বেসিনের সন্ধি (১৮০২ খ্রীস্টাব্দ) ভারতে ইংরেজ সার্বভৌমত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমে ইংরেজদের সঙ্গে মারাঠা সংঘের প্রধান পেশোয়ার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন। ইংরেজ ভাষ্যকার আওয়নের মতে বেসিনের সন্ধি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতে কোম্পানির সার্বভৌমত্ব স্থাপিত হলেও বোর্ড

অফ কন্ট্রোলের সভাপতি ডান্‌ডাস অবশ্য মন্তব্য করেন যে অসন্তুষ্ট ও দুর্বল পেশোয়ার সাহচর্যে মারাঠা রাজ্যের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন খুব সহজসাধ্য ছিল না।

সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের ইংরেজ বিরোধিতার যুগ্ম প্রয়াসে পেশোয়া যোগ দিলে দ্বিতীয় ঈঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনা হয়। তিন মারাঠা একত্রিত হলেও কার্যতঃ হোলকার ও গাইকোয়াড় নিরপেক্ষ রইল। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ইংরেজদের হাতে সম্মিলিত মারাঠা বাহিনী পরাস্ত হয় এবং সবশেষে ভোঁসলে আরগাঁও (Argaon) যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে দেওগাঁও-এর (Deogaon) সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এইভাবে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হন। তাঁদের রাজ্যের কিছু অংশ ব্রিটিশ হস্তান্তর করে এবং তাঁর দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখতে স্বীকৃত হন। তাঁদের রাজ্যে ব্রিটিশের অনুমতি ভিন্ন কোনও ইউরোপীয়কে নিয়োগ করতে পারবে না এটাও মেনে নেওয়া হয়। এভাবে উড়িষ্যা-তীরবর্তী অঞ্চলে ইংরেজ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

অপরদিকে সিন্ধিয়ার বাহিনী আলিগড় ও দিল্লীর কাছে ইংরেজদের হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলে নিরুপায় সিন্ধিয়া ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে সুর্জী অঞ্জনগাঁও-এর (Surji Anjangaon) সন্ধির মাধ্যমে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হন। সিন্ধিয়ার ক্ষেত্রেও দরবারে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি রাখা ও কোন ইউরোপীয়কে ইংরেজ অনুমতি ভিন্ন নিয়োগ না করার শর্ত আরোপিত হয় এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল ও রাজপুতানার কিছু অংশ ইংরেজগণ লাভ করল। পরে ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে আর একটি সন্ধির দ্বারা সিন্ধিয়া তাঁর রাজ্যের সীমান্তে ইংরেজ বাহিনী মোতয়েনে সম্মত হয়।

ঐতিহাসিক গ্র্যাণ্ট ডাফের মতে মারাঠা দুই প্রধানের এই দ্রুত পরাজয় সমগ্র ভারতে ছিল বিস্ময়ের।

দুটি সন্ধি (দেওগাঁও ও সুর্জী অঞ্জনগাঁও) কয়েকটি রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে; যেমন (১) ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের সম্প্রসারণ (২) সমগ্র ভারতে ইংরেজদের রাজ্যবিস্তার (৩) কলকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন (৪) মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌-আলম ইংরেজদের রক্ষণাধীন (৫) মারাঠা শক্তির অভাবনীয় বিপর্যয় (৬) দিল্লীতে নিযুক্ত বালাজীর কর্মচারীগণের বিতাড়ন (৭) সবশেষে, দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ প্রভাব বৃদ্ধি।

এই সময়ে ইংরেজ রাজ্য বিস্তারের নীতির পরিবর্তন হয়। ওয়েলেসলি যখন তাঁর দৃষ্টি হোলকারের দিকে ফেরালেন সে সময় ব্রিটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশীদারগণ অনুভব করলেন যে তাঁদের যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তারের নীতি শুধু ব্যয়সাধ্য নয়, তার ফলে তাঁদের লাভের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। তাছাড়া তখন ইউরোপে নেপোলিয়ন ভীতির আশঙ্কা বিরাজ করছিল এবং এই মুহূর্তে ইংরেজ রাজকোষ নিঃশেষিত হওয়া ইংরেজ স্বার্থের পরিপন্থী।

১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে হোলকার ইংরেজ বাহিনীকে পরাস্ত করলে ভরতপুরের রাজা

উৎসাহিত বোধ করে অধীনতামূলক মিত্রতা বর্জন করে হোলকারের সঙ্গে যোগ দেন। পরে দীগের যুদ্ধে হোলকার পরাজিত হয়। হোলকারের রাজধানী ইন্দোর ইংরেজদের অধিকারে এল। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে হোলকারের সঙ্গে অস্থায়ী গভর্নর জর্জ বারলো রাজঘাটের সন্ধি স্থাপন করেন এবং হোলকার তাঁর হৃত স্থান ফেরত পান। ইতিপূর্বে ওয়েলেসলির বিস্তার নীতির বিরুদ্ধে যে ব্যাখ্যা ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ অবলম্বন করেছিল তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ওয়েলেসলিকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হয়।

লর্ড ওয়েলেসলির পর ভারতে ইংরেজগণ নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করার ফলে শক্তিসাম্য বজায় থাকে। এবং ইংরেজরা আর কোনপ্রকারে মারাঠাগণকে অসন্তুষ্ট করেনি। এমনকি মারাঠাদের সঙ্গে শান্তি রক্ষা করার নীতির সমর্থনে মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে পিণ্ডারী দস্যুদের বিরুদ্ধেও কোনপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি।

পেশোয়ার মন্ত্রী ত্রিম্বকজীর পরামর্শে নতুন করে মারাঠা সঙ্ঘ স্থাপনের প্রচেষ্টা সফল হলে গাইকোয়াড়ের সঙ্গে আহম্মদাবাদকে কেন্দ্র করে বিবাদ শুরু হয়। এ বিবাদের মীমাংসার জন্য গায়কোয়াড়ের দেওয়ান ইংরেজ সৈন্যের প্রহরাধীনে পুনায় গেলে ত্রিম্বকজীর ষড়যন্ত্রে দেওয়ান নিহত হয়। তখন ত্রিম্বকজীকে কেন্দ্র করে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও-এর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। এইসময় গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসৃত নিরপেক্ষ নীতি বর্জন করেন এবং ইংরেজ সার্বভৌমত্ব স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংস পেশোয়ার সঙ্গে পুনার সন্ধি স্বাক্ষর করলে পেশোয়া তাঁর রাজ্যের একাংশ ইংরেজদের সমর্পণ করতে বাধ্য হন। তাছাড়া তাঁর দরবারে নিযুক্ত ব্রিটিশ প্রতিনিধির অনুমতি ভিন্ন কোন ভারতীয় ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে না বলেও প্রতিশ্রুতিদানে তিনি বাধ্য হন। একই বছর গাইকোয়াড়ের সঙ্গে এক সন্ধির মাধ্যমে কিছু ইংরেজ সৈন্য ভরণপোষণের জন্যে তাঁর রাজ্যের কিছু অংশ ইংরেজরা লাভ করে।

ইতিমধ্যে মারাঠা প্রধান ভোঁসলের রাজ্য নাগপুরে উত্তরাধিকার প্রশ্নে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এবং ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে ইংরেজ রেসিডেণ্ট-এর প্রচেষ্টায় নাগপুর-সন্ধি দ্বারা ভোঁসলে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হয়।

এই উপরোক্ত দুই সন্ধির দ্বারা ইংরেজ প্রতিপত্তি বৃদ্ধির অব্যবহিত পরেই পেশোয়া মারাঠা নেতৃপদ থেকে চ্যুত হন। নাগপুর সন্ধির দ্বারা মারাঠা রাজ্যের (ভোঁসলের) স্বাধীনতা নষ্ট হয়।

পেশোয়া এই অপমান অসহ্য মনে করে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে আক্রমণ করেন। ফলে শুরু হয় তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে অশ্‌তি ও কোরাগাঁও-এর যুদ্ধে পেশোয়া পরাজিত হন ও আত্মসমর্পণ করেন। মারাঠাদের স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যকলাপ চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহীশূর

হায়দার আলির সঙ্গে ফরাসীদের মৈত্রী তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধে ফরাসীদিগকে হায়দারের সাহায্য দান, হায়দারের বিরুদ্ধে মহীশূরের হিন্দুরাজগণের সঙ্গে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, হায়দার আলির পরম শত্রু, কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলিকে ইংরেজের সাহায্য প্রদান এবং ইংরেজ-অধিকৃত মাদ্রাজ সরকারের ভ্রান্ত কূটনীতি, দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি কারণে ইঙ্গ-মহীশূর বিবাদ ও সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

অপরদিকে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মারাঠাগণ মহীশূর বা দক্ষিণ ভারতের ব্যাপারে প্রায় একেবারেই আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের ফলে মারাঠাগণ দক্ষিণ-ভারতের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এই সময় দক্ষিণ-ভারতে মহীশূর মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধাস্বরূপ হয়ে ওঠে। দক্ষিণে মারাঠাদের বিস্তার নীতি সেই সঙ্গে হায়দার আলির উত্থান এবং দক্ষিণ-ভারতে ইংরেজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে মহীশূরের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিকদের মতে হায়দার আলি কেবলমাত্র মারাঠাদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ছিলেন না; উপরন্তু ইংরেজ শক্তির কাছে তিনি আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠেন।

বস্তুতঃ হায়দার আলি ইংরেজদের প্রতি যতটা না বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন, তা অপেক্ষা তদানীন্তন দাক্ষিণাত্য এবং মহীশূরের অন্যান্য রাজনৈতিক পরিস্থিতিই ইঙ্গ-মহীশূর দ্বন্দ্বের পথ সুগম করে।

প্রকৃতপক্ষে হায়দার আলি ও ইংরেজ সম্পর্কের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধে, হায়দারের ফরাসী-প্রীতি ও বন্ধুত্বের কারণে। তাছাড়া মহীশূরের রাজার সঙ্গে ইংরেজদের গোপন আঁতাত প্রকাশ পেলে হায়দার ইংরেজদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে আর্কটের নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের যোগাযোগও হায়দারকে ইংরেজ-বিদ্বেষী করে তোলে। মাদ্রাজে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের ভুল কূটনৈতিক নীতিও হায়দার আর ইংরেজদের সংঘর্ষ অনিবার্য করে তোলে। হায়দার আলি এ সময় মাদ্রাজ সরকারের কাছে নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্যে একটি প্রস্তাব রাখেন। ইংরেজগণ তা প্রত্যাখ্যান করে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে প্রকৃতপক্ষে হায়দার-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছাও ইংরেজদের ছিল না। অন্যদিকে নিজামের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি স্থাপন ও হায়দার আলির বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্যে সাহায্য লাভের কারণে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হায়দার আলিকে ইংরেজদের ব্যাপারে সন্দিহান করে তোলে। পুনরায় ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হায়দার আলি বোম্বাই সরকারের কাছে আরেকটি শান্তি-প্রস্তাব উত্থাপন করেন। হায়দার আলি এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন শক্তির সঙ্গে সন্ধি না করায় স্বীকৃত হন। কিন্তু এবারও বোম্বাই সরকার হায়দার আলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এমতাবস্থায় হায়দার আলি ইংরেজ-অভিপ্রায় না বুঝে নিজের নিরাপত্তার জন্যে নিজামের সঙ্গে মৈত্রীতে

আবদ্ধ হন। নিজাম ইংরেজ পক্ষ ত্যাগ করলে হায়দার ও নিজামের সৈন্যবাহিনী কর্ণাটক আক্রমণ করে এবং ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়।

প্রথম ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের ঘটনাবলীর উদ্ভূত পরিস্থিতির দ্রুত পট পরিবর্তন হয়। ত্রিনোমালির যুদ্ধে হায়দার পরাজিত হলে ইংরেজগণ হায়দ্রাবাদ আক্রমণে উদ্যোগী

হায়দার আলি

টিপু সুলতান

হয় এবং নিজাম হায়দারকে ত্যাগ করে মাদ্রাজ সরকারের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে হায়দার হঠাৎ মাদ্রাজ আক্রমণ করলে ইংরেজগণ সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সন্ধির শর্তানুসারে পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ও যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণ সংঘটিত হয় এবং মহীশূর রাজ্য অন্য কোন শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে ইংরেজগণ হায়দারকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ ও মারাঠাদের দীর্ঘ সংঘর্ষের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে উত্তর-ভারতের মারাঠা ও ইংরেজ-বিদ্বেষী দাক্ষিণাত্যের নিজাম ও মহীশূরের সম্মিলিত শক্তির যৌথ অভিযানে ইংরেজগণ এক তীব্র বাধার সম্মুখীন হয় এবং তারই পরবর্তী অধ্যায়ে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত সলবাই-এর সন্ধি দ্বারা আবার ইংরেজগণ হায়দার আলির ওপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের স্থানগুলি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়।

যদিও পূর্বোক্ত ঘটনাবলী হায়দার আলির ওপর ইংরেজদের পরোক্ষভাবে কিছু সুবিধা হয়েছিল কিন্তু ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদিত ইংরেজ ও মহীশূরের সন্ধি—দুই শক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক নানা বিবর্তনের মধ্যে ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করে। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে সন্ধির প্রধান শর্ত হিসেবে মারাঠাগণ কর্তৃক মহীশূর আক্রান্ত হলে ইংরেজ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি; আবার ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে হায়দার-এর সঙ্গে বোম্বাই সরকারের মধ্যে সম্পাদিত

চুক্তিতে ইংরেজগণ প্রয়োজনে হায়দার আলিকে যুদ্ধোপকরণের সাহায্য প্রভৃতি ইংরেজদের দেয় প্রতিশ্রুতি কার্যতঃ মারাঠা কর্তৃক মহীশূর আক্রান্ত হলে হায়দার আলী পুরোপুরি বঞ্চিত হয়। এমতাবস্থায় হায়দার ফরাসীদের শরণাপন্ন হন এবং ফরাসীগণ সৈন্য ও সমরোপকরণ দ্বারা হায়দারকে সাহায্য করে। হায়দার-এর ফরাসী সাহায্যপুষ্ট অবস্থা এবং সেই সঙ্গে মহীশূরে ফরাসী প্রভাব বৃদ্ধি ইংরেজদের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে হয়। এই সময়ে আমেরিকায় ঔপনিবেশিক স্বার্থে ইংরেজ-ফরাসীদের যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইংরেজগণ ভারতে ফরাসী অধিকৃত মাহে আক্রমণ করলে হায়দার তার প্রতিবাদ করেন। ইংরেজগণ এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করলে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় হায়দার আলীর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র টিপু সুলতান এই যুদ্ধ চালান। অবশেষে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি প্রকৃতপক্ষে টিপু ও ইংরেজদের সম্পর্কের কোন উন্নতি হয়নি।—এটা কেবলমাত্র এই বিবাদকে স্থগিত রেখেছিল। কার্যতঃ এই সন্ধি টিপু সুলতানের ইংরেজ-বিরোধী নীতিকে জোরদার করে এবং দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ স্বার্থ বিপন্ন হয়ে ওঠে। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ার জন্যে যে বিচার বুদ্ধি এবং সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ইংরেজ আধিপত্য খর্ব করার জন্যে সংগঠিত প্রচেষ্টা সার্থক করার প্রয়োজনে হায়দার আলী কর্তৃক অনুসৃত নীতি যদি টিপু সুলতান উপযুক্তভাবে অনুসরণ করতেন তবে হয়তো ইংরেজদের ক্ষতি করা সম্ভব হত। কিন্তু টিপু সুলতান মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় পরোক্ষভাবে ইংরেজ শক্তি বৃদ্ধিকে সাহায্য করে। অপরপক্ষে ইংরেজগণ স্বাভাবিক কারণেই টিপুর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। কেননা দাক্ষিণাত্যসহ সমগ্র ভারতে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁরা টিপুকেই মুখ্য বাধা বলে মনে করতেন। টিপু ইংরেজদের সম্পর্কে প্রকৃত বিপদের কথা উপলব্ধি করেছিল এবং এদের জন্যেই তাঁর স্বাধীনতা বিপন্ন বুঝেই ইংরেজ বিতাড়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ফলে ইংরেজ শক্তিকে খর্ব করার জন্যে ফ্রান্স, কনস্টান্টিনোপল প্রভৃতি দেশ থেকে গোপনে সাহায্য চাওয়ার প্রচেষ্টা আবার ইঙ্গ-মহীশূর বিবাদ অনিবার্য করে তোলে।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়। এবং ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে টিপুর পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়। প্রকৃত বীরের মতো শৌর্যের পরিচয় দিয়ে টিপু গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির চতুর কুটনৈতিক চক্রান্তের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কর্নওয়ালিস তাঁর চাতুর্য এবং বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে সুকৌশলে মারাঠা, নিজাম এবং ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের শাসকদের জোট থেকে টিপুকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদিও কর্নওয়ালিস নিরপেক্ষ নীতির বাহক ছিলেন তথাপি টিপুর ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব ও তাঁর বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে গোপন যোগসূত্র কর্নওয়ালিসকে নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বাধ্য করে। ১৭৯২

খ্রীস্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলে টিপু তাঁর রাজ্যের অর্ধাংশ ছেড়ে দেয় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩৩০ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ দাক্ষিণাত্যে টিপুর প্রাধান্য নষ্ট করে এবং পরিবর্তে ব্রিটিশ আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পরে মহীশূর নামেমাত্র একটি রাজ্যে পরিণত হয়। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায় মহীশূরের টিপু প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা হলেও তিনি কখনই তা চূড়ান্ত বলে মনে করেন নি। এই জঘন্য ও শোচনীয় অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে টিপু পুনর্বার ফরাসী বিপ্লবী সংস্থা এবং আরব ও তুরস্কের সাহায্যের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠেন। এই সময় গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি তাঁর মারণাস্ত্র—অধীনতামূলক মিত্রতার মাধ্যমে টিপুকে ঘায়েল করার চেষ্টা করলে ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে টিপু তা প্রত্যাখ্যান করেন কারণ তাঁর হৃত-রাজ্যাংশের ক্ষতি কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না।

ওয়েলেসলি টিপুকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ভারতে ভবিষ্যতে ফরাসী অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠায় ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। স্বল্পকালীন যুদ্ধের পর ফরাসী সাহায্য আগমনের পূর্বে টিপুর সাহসিকতা সত্ত্বেও ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে টিপু নিহত হন। মহীশূর রাজ্য ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজ পরিবারকে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মহীশূর পরিপূর্ণভাবে একটি ইংরেজ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হল। ভারতে ফরাসী তৎপরতার ও আক্রমণের আশঙ্কা চিরতরে বিলুপ্ত হল।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি (১৭৯৮)
(Subsidiary Alliance (1798)

ভারতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে প্রবাহ অষ্টাদশ শতকের ষাট-এর দশক থেকে আরম্ভ হয়ে তার প্রকৃত শক্তি ও তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এই শতকের শেষের কয়েক বছরের মধ্যে। ছলে-বলে-কৌশলে যেকোন উপায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে প্রয়োজনে বিস্তৃত করা এবং নানাভাবে ব্রিটিশ-অধীনতার পাশে দেশীয় রাজন্যবর্গকে তাদের কুক্ষিগত করার পদ্ধতি নানাভাবে প্রয়োগ করা হয়। তাছাড়া ভারতীয় রাজন্যবর্গের বিদেশী সামরিক সাহায্য লাভের অকৃপণ ব্যাকুলতাকে সরাসরি ব্রিটিশের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেসলি 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই নীতি অবশ্যই আধুনিকতম তো বটেই, উপরন্তু ছিল এক অভাবনীয় নিপুণতার ছাপ। ভারতীয় নৃপতিদের অর্থের বিনিময়ে সামরিক সাহায্য দান মোটামুটিভাবে বেশ কিছুদিনের জন্যে স্বীকৃত ব্যবস্থা ছিল; ওয়েলেসলির প্রবর্তিত এই নীতির প্রয়োগে তা একটি নির্দিষ্ট আকার নেয়। এই অধীনতামূলক মিত্রতার রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ভূমিকার প্রধান অংশ হল এই মিত্রতায় আবদ্ধ রাজ্যকে স্থায়ীভাবে (১) ঐ রাজ্যে

একটি ব্রিটিশ সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখার সম্মতি এবং এর ব্যয় নির্বাহের জন্যে উপযুক্ত ভরতুকী প্রদানের স্বীকৃতিঃ এই ব্যবস্থার প্রকাশ্যে দেশীয় রাজন্যবর্গের নিরাপত্তার ওজর হিসেবে গৃহীত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ভারতীয় শাসকদের নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের একটা ফন্দি বিশেষ। কখনও শাসকগণ বাৎসরিক এই ব্যয়-নির্বাহের খরচের পরিবর্তে রাজ্যের কিছু অংশ ইংরেজগণকে দান করত। (২) এই অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ রাজ্যকে তার রাজ্যে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখার সম্মতি দান, ইংরেজদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ইউরোপীয়কে রাজকার্যে নিয়োগ এবং দেশীয় কোন রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার অনুমতি ছিল না। পরিবর্তে ঐ রাজ্যগুলির বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রায়শই তাঁরা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষণে ব্যর্থ হয়।

অধীনতা মূলক মিত্রতার নীতি

বস্তুতঃ এই অধীনতামূলক মিত্রতা ভারতীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণেরই সামিল ছিল। নিজের আত্মরক্ষার অধিকার, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের স্বাধীনতা, বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষমতা এবং প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বিবাদ মীমাংসার অধিকার প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যগুলির অধিকারের বাইরে চলে যায়। ভারতীয় রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয় এবং তাদের দৈনন্দিন রাজ্যনির্বাহ কার্যতঃ রাজ্যের ব্রিটিশ প্রতিনিধির হাতেই চলে গেল। ভারতীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যয় বহন করা তাঁদের আর্থিক ক্ষমতার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে তাঁদের অর্থনীতি ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে পড়ে। এই অধীনতামূলক মিত্রতায় ক্রমশঃ আশ্রিত রাজ্যগুলির নিজেদের সৈন্যবাহিনী প্রতিপালন করার অনীহা দেখা দেয়।

অধীনতামূলক মিত্রতা প্রয়োগের ফল

অধীনতামূলক মিত্রতার প্রসার ব্রিটিশের পক্ষে সরাসরি সুবিধাজনক এবং ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে খুবই উপযোগী বলে প্রতিপন্ন হয়। ভারতীয় রাজন্যবর্গের আর্থিক সহায়তায় তাঁরা বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়ার অধীনস্থ রাজ্যগুলির বৈদেশিক এবং প্রতিরক্ষার কর্তৃত্ব গ্রহণ করায় প্রত্যেক রাজ্যেই শক্তিশালী ইরেজবাহিনী রাখার ফলে প্রয়োজনবোধে সেই রাজ্যের শাসককে বিতাড়িত করা এবং অযোগ্য আখ্যাদানপূর্বক রাজ্যকে সরাসরি ইংরেজ অধিকারে আনার সুবিধা ইংরেজ গ্রহণ করে। একজন ব্রিটিশ লেখক এই অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এতে গৃহীত রাজ্যগুলিকে এমনভাবে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়েছিল যাতে প্রয়োজনবোধে পরিপূর্ণ গ্রাস করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এই অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রকৃত উদ্ভাবক ওয়েলেসলি ছিলেন না, তবে এর সরকারী স্বীকৃতি তাঁর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
অন্যান্য ব্রিটিশ অধিকারসমূহ
(Other Conquests)

বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অযোধ্যার নবাব অংশগ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে অযোধ্যা ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে হেস্টিংস সন্ধি করার ফলে রোহিলা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ অযোধ্যার নবাবকে রোহিলখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সেখানে পরোক্ষভাবে ইংরেজ কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে। তাই রোহিলখণ্ডের আফগান শাসক সর্দার রহমত খাঁ মারাঠা আক্রমণের বিরুদ্ধে অযোধ্যার নবাবের সাহায্য লাভের অজুহাতে আফগান সর্দারের কাছে আর্থিক দাবি পেশ করলেন। মারাঠাদের এই রোহিলখণ্ড আক্রমণ পরিত্যক্ত হলে আফগান সর্দার ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করলে অযোধ্যার নবাব ও ইংরেজ বাহিনী রোহিলখণ্ড আক্রমণ করে এবং যুদ্ধে রোহিলাগণ পরাজিত হয় এবং রোহিলখণ্ড অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে প্রকৃতপক্ষে রোহিলাগণ ইংরেজ-স্বার্থ বিরোধী না হলেও ভারতে ইংরেজ সৈন্যের আক্রমণে তারা পরাজিত হয়।

রোহিলখণ্ড অধিকার

অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ইঙ্গ-নেপাল সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। নেপালের সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্রিটিশ দৌত্য নিষ্ফল হলে ওয়েলেসলি নেপালের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেন। এই সময় ব্রিটিশ ও নেপাল রাজ্যের মধ্যে সীমানাগত বিরোধ দেখা দেয়। ব্রিটিশ নিরপেক্ষ নীতির সুযোগে গুর্খাগণ ব্রিটিশ সীমান্তের কিছু অংশ দখল করে। গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ নিরপেক্ষ-নীতিকে কখনই তাদের দুর্বলতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয় নি। অবশেষে ব্রিটিশ অপ্রতিহত শক্তির সাক্ষ্যরূপে গুর্খাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলো ফেরত দিতে গুর্খারা অস্বীকৃত হওয়ায় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এটি ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ নামে অভিহিত। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সগৌলীর সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে ইংরেজগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নেপালের পার্বত্য অঞ্চল এবং সিমলা-মুসৌরী ও আলমোড়া অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

ইঙ্গ-নেপাল সংঘর্ষ

১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে পিণ্ডারী দস্যু দমনে রাজপুত রাজন্যবর্গের সাহায্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করে লর্ড হেস্টিংস-এর উদয়পুর ও জয়পুরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের দ্বারা রাজপুত, রাজ্যগুলি ইংরেজ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিলে রাজপুতানায় ইংরেজ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজ অধিকার বিস্তার

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আসমুদ্রহিমাচলে ইংরেজের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অরক্ষিত থাকার ফলে ইংরেজদের ভারতীয় সাম্রাজ্যে নিরাপত্তা সুরক্ষিত ছিল না। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতে ইংরেজের

রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের পরও এই দুই সীমান্তের সমস্যা সম্পর্কে ইংরেজগণ কখনই উদাসীন থাকতে পারে না। স্বভাবতই অধিকৃত সাম্রাজ্যের উপযুক্ত নিরাপত্তার জন্যে এই দুই সীমান্তে অবস্থিত রাজ্যগুলির সঙ্গে ইংরেজগণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রথমতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রঞ্জিত সিং-এর 'অখিল শিখরাষ্ট্র' ও তাঁর দরবারে রুশ প্রভাব বিস্তার স্বভাবতই ইংরেজদের উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বর্মী রাজগণের আক্রমণাত্মক

সীমান্তে ব্রিটিশ অধিকার

হেস্টিংস

লর্ড ডালহৌসী

পরিকল্পনা এবং আসাম ও পূর্ব-ভারতে রাজ্য বিস্তারেব প্রচেষ্টায় ইংরেজরা আশঙ্কিত বোধ করে। উত্তর-পূর্ব ভারতে চীনের সীমান্ত উন্মুক্ত রাখাও ইংরেজগণ সমীচীন বোধ করেনি।

সঙ্গত কারণেই ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েকটি সীমান্ত যুদ্ধে ইংরেজদের লিপ্ত হতে হয়।

লর্ড আমহার্স্টের আমলে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এবং ১৮২৬ খ্রষ্টাব্দে ইয়ান্দাবুর সন্ধির স্বাক্ষর করতে ব্রহ্মরাজ বাধ্য হন। এই সন্ধির ফলে টেনাসেরিম ও আরাকান অঞ্চল ইংরেজদের হস্তগত হয়। আসাম, জয়ন্তিয়া পাহাড় ও মণিপুরের উপর ব্রহ্মরাজ সকল দাবি পরিত্যাগ করেন। ফলে, এগুলো ইংরেজ-আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। এ সময়ে কিছুকাল ইংরেজ- ব্যর্থতার সুযোগে ভরতপুর রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিলে ভরতপুর দুর্গ ইংরেজদের হস্তগত হয়।

ভরতপুর দখল

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ পরাজিত হন এবং সন্ধির মাধ্যমে পেগু ও সালউইন নদী পর্যন্ত ইংরেজ আধিপত্য স্বীকার করে নেন। এভাবে বঙ্গোপসাগরের সমগ্র উপকূলেই ইংরেজ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

ভারতের বৃহদাংশে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর এর বাহ্যিক নিরাপত্তার জন্যে ইংরেজগণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর অধিকার বিস্তারে আগ্রহী হয়। ক্রমশঃ

তারা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অধিকার স্থাপনের দৌলতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মালাক্কা ও সিংহল অধিকার করে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পর চীন ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্যে ভারত মহাসাগরে নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং পরে তারা সফলতা লাভ করে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গাপুর ইজারা এবং অবশেষে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি সিঙ্গাপুরের কর্তৃত্ব লাভ করে। এখানে ভারত মহাসাগরে গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটি স্থাপনে সক্ষম হয়। ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ইংরেজদের পূর্বে একমাত্র চোলগণই প্রথম ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হয়।

ইংরেজ আধিপত্য

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালীর পৌত্র জামান শাহ কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করলে প্রকৃতপক্ষে তখনই ইংরেজদের আফগান-ভীতি শুরু হয়। স্যার জন শোর ও ওয়েলেসলির শাসনকালে ইংরেজগণ আশঙ্কিত হয়। এই আশঙ্কার পেছনে মূলতঃ দুটি কারণ ছিল। প্রথমত মহীশূরের নবাব টিপুর সঙ্গে যোগাযোগ জামান শাহকে ভারত আক্রমণে উদ্যোগী করে এবং ঠিক সেই সময় অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে জামান শাহের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দ্বিতীয়তঃ আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে ফরাসী ও রুশ আক্রমণের সম্ভাবনাও ইংরেজদের দুশ্চিন্তায় ফেলে।

আফগানিস্তানে ইংরেজ অধিকার বিস্তার

পরবর্তীকালে আফগান সম্রাট দোস্ত মহম্মদ-এর সঙ্গে ইংরেজ সম্পর্কের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে অক্ষম হওয়ায় অবশেষে দোস্ত মহম্মদ রুশদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে উদ্যোগী হলে ইংরেজগণ রুশ আগ্রাসনের আশঙ্কা করে। ইংরেজগণ দোস্ত মহম্মদকে দলে টানবার জন্যে অত্যধিক উৎসাহী হলে দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের বিনিময়ে পেশোয়ার প্রত্যর্পণের দাবি করে। গভর্নর জেনারেল অকল্যাণ্ড শিখনেতা রঞ্জিত সিং-এর বিরাগভাজনের ভয়ে দোস্ত মহম্মদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্কের উন্নতির আশা প্রায় বিলুপ্ত হয়। দোস্ত মহম্মদ রুশদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ভেবে ইংরেজ সরকার আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং ব্রিটিশ বৃত্তিভোগী জামান শাহের ভ্রাতা শাহ সুজাকে আমীর পদে বসিয়ে রঞ্জিত সিং শাহ সুজাকে নিয়ে ত্রি-শক্তি মৈত্রী স্থাপন করে। গভর্নর জেনারেল অকল্যাণ্ডের দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ সমর্থন করার মূল কারণ ছিল আফগানিস্তানে স্বীয় মিত্রকে অধিষ্ঠিত করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপের অবসান ঘটান। প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে দোস্ত মহম্মদ পরাজিত হন এবং প্রকৃতপক্ষে শাহ সুজা ইংরেজদের ক্রীড়নক হিসেবে আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হন। ইংরেজ-আধিপত্য ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্যে কান্দাহার, জালালাবাদ ও কাবুলে ব্রিটিশ সেনানিবাস স্থাপন করা হয় এবং ইংরেজদের হাতে আফগানিস্তানের রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। অবশ্য ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে আফগানদের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব বিদ্রোহে পরিণত হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী কাবুল পরিত্যাগ করলেও ইংরেজগণ কান্দাহার ও

জালালাবাদ দখলে রাখতে সমর্থ হয়। ইংরেজদের আফগান-নীতি রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে তাদের বিপর্যয় ঘটায় এবং নৈতিকতার প্রশ্নে এটা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাই ইংরেজ ঐতিহাসিক ইন্‌স্ এই আফগান যুদ্ধ ইংরেজদের পক্ষে মারাত্মক ভুল বলে অভিহিত করেছেন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ সিন্ধুদেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব উপলব্ধি করলে এই অঞ্চলে শিখদের আকস্মিক শক্তিবিস্তারকে বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ প্রতিপত্তি স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড সিন্ধুর আমীরদের সঙ্গে এক চুক্তির মাধ্যমে সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা করলে সিন্ধুদেশে ইংরেজ প্রতিপত্তি আরও. বৃদ্ধি পায়। প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় অকল্যাণ্ড ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বেন্টিঙ্কের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে সিন্ধুর মধ্য দিয়ে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ চলাকালীন অকল্যাণ্ড সিন্ধুর আমীরদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন দ্বারা সিন্ধুদেশকে ইংরেজ রক্ষণাধীনে আনেন।

পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেল লর্ড অ্যালেনবরোর নীতি অনুসারে যেকোন ভাবে আমীরদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার অজুহাতে চার্লস নেপিয়ারকে সিন্ধুদেশে পাঠান এবং নেপিয়ার সিন্ধুর আমীরদের সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করে এবং অবশেষে ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে মিয়ানী ও দাবোর যুদ্ধে আমীর পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। সিন্ধুর আমীরগণকে বিতাড়িত করে সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

সফল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নীতির ফলে ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্য থেকে শুরু করে অচিরেই সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়। এক কথায়, পাঞ্জাব ভিন্ন সমগ্র ভারতই ইংরেজদের করায়ত্ত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই শিখ সুকরচুকিয়া মিছিলের পুরোধা রঞ্জিত সিং-এর 'অখিল শিখরাষ্ট্র' স্থাপনের প্রয়াস বিভিন্ন শিখ মিছিলের নেতৃবর্গ মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। রঞ্জিত সিং-এর আক্রমণাত্মক মনোভাব অন্যান্য শিখ নেতাদের ইংরেজ শরণাপন্ন করে তোলে। এই সময় গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টো রঞ্জিত সিং-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে প্রয়াসী হন। কারণ, রঞ্জিত সিং-এর অগ্রগতিতে বাধা দান এবং ভারতে ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার তাগিদ।

পাঞ্জাব অধিকার এই সময় ব্রিটিশ শক্তির অনুকূলে পরিস্থিতি যাওয়ায় ও ইংরেজদের দৃঢ়তার ফলে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষর করতে রঞ্জিত সিং বাধ্য হন এবং উভয় পক্ষ স্থায়ী মৈত্রী বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এই সন্ধির ফল স্বরূপ ইংরেজগণ দ্বিধাবিভক্ত শিখ জাতির একাংশের সমর্থন লাভ করল এবং যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তৃত হল। প্রকৃতপক্ষে, এই সন্ধির অপমানজনক শর্ত মেনে নেওয়ায় রঞ্জিত সিং-এর কূটনৈতিক ও সামরিক পরাজয় হয় এবং 'অখিল শিখ সাম্রাজ্য' স্থাপনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়। সেই সঙ্গে তিনি ইংরেজ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েন। আগামী দিনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শিখ শক্তির উত্থানের টানাপোড়েনের মধ্যে নানাভাবে বিব্রত বোধ করে এবং এই

কারণে ইংরেজ পাঞ্জাবে সামরিক অভিযান প্রসঙ্গে চিন্তা-ভাবনার সূত্রপাত হয়।

পাঞ্জাবী সামরিক বাহিনী ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে এবং ইংরেজদের সঙ্গে কিছু শিখগোষ্ঠীর নায়কদের চক্রান্তের ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শিখ-বিদ্বেষী বলে পরিচিত মেজর ব্রডফুটকে লুধিয়ানাতে ব্রিটিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলে তিনি বারবার শিখবিরোধী কার্যকলাপ শুরু করেন এবং শিখগণকে উত্তেজিত করে তোলেন। দুর্নীতিগ্রস্ত শিখ প্রধানগণ অনুভব করল যে অনতিবিলম্বে পাঞ্জাবী সামরিক বাহিনী তাঁদের অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে অপসারিত করবে এবং এই অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্যে পাঞ্জাবী সেনাবাহিনীকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে তারা সচেষ্ট। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শতদ্রু নদীর তীরবর্তী ফিরোজপুর অঞ্চলে যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর প্রচারিত হয়। অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের জন্যে পূর্ববর্তী অঞ্চলে ছাউনি প্রস্তুত এবং পাঞ্জাবের সীমান্ত অঞ্চলে অতিরিক্ত ইংরেজ বাহিনীর সমাবেশ আরম্ভ হয়। শিখ বাহিনী ইংরেজদের পাঞ্জাব অধিকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে এবং একে বাধাদান ও বানচাল করার ব্যবস্থা নিতে আরম্ভ করে। ডিসেম্বর মাসে ইংরেজবাহিনী ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে জেনে একে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ইংরেজ ও শিখ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। বিদেশী শক্তির আক্রমণে বিপদ উপলব্ধি করে, হিন্দু, মুসলমান ও শিখগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও কিছু নেতার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী রাজা লাল সিং এর সেনাধ্যক্ষ তেজ সিং-এর শত্রুপক্ষের সঙ্গে গোপন আঁতাতের ফলে শিখবাহিনী পরাজিত হয় এবং ৮ই মার্চ, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অপমানকর 'লাহোর চুক্তি' স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ শক্তি জলন্ধর, দোয়াব দখল করে এবং পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কাশ্মীর ও জম্মু অঞ্চল রাজা গুলাব সিং ডোগরাকে হস্তান্তর করে। পাঞ্জাবী বাহিনীর সংখ্যা ২০,০০০ পদাতিক আর ১২,০০০ অশ্বারোহী বাহিনীতে কমিয়ে আনা হয়। লাহোরে একটি শক্তিশালী ব্রিটিশ সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

পরবর্তী ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর আরেকটি চুক্তির মাধ্যমে লাহোরে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে রাজ্যের সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয় এবং রাজ্যের যেকোন স্থানে ব্রিটিশ সেনা রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়। এভাবে পাঞ্জাব কার্যতঃ ব্রিটিশ প্রতিনিধির কর্তৃত্বাধীনে চলে যায় এবং পাঞ্জাব স্বাধীনতা হারিয়ে ইংরেজদের অধীনে একটি সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়।

ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ উগ্র-সাম্রাজ্যবাদী কর্মকর্তাগণ পাঞ্জাবের এই অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে একে সরাসরি ব্রিটিশ-শাসিত রাজ্যে পরিণত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতাপ্রিয় পাঞ্জাবীগণ আবার বহু সংখ্যায় স্থানীয়ভাবে বিদ্রোহ করলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ এসে যায়। মুলরাজের নেতৃত্বে মুলতান এবং চত্তর সিং আতারিওয়ালার নেতৃত্বে দুই প্রধান বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে ইংরেজগণ সম্পূর্ণভাবে দমন করে পাঞ্জাবীদের চূড়ান্ত পরাজয় সূচিত করে। লর্ড ডালহৌসী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পাঞ্জাব

ইংরেজদের দখলে আনেন। এভাবে ভারতের শেষ স্বাধীন রাষ্ট্রটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পিছনে যে-সকল ব্রিটিশ শাসকগণকে প্রথম সারিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় লর্ড ডালহৌসী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ব্রিটিশ স্বার্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনাই ছিল ডালহৌসির অন্যতম উদ্দেশ্য। ওয়েলেসলির সাম্রাজ্য বিস্তারের নেপথ্যে মূলত ছিল ফরাসী-ভীতি। অপরপক্ষে, ডালহৌসি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে ঘোর সাম্রাজ্যবাদী।

ডালহৌসির সাম্রাজ্য

ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তারের নির্ঘণ্ট ছিল যথাক্রমে (১) স্বত্ববিলোপ-নীতি, (২) প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে এবং (৩) কুশাসনের অজুহাতে পররাজ্য অধিকার। তাঁর প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ-নীতিই ছিল তাঁর রাজ্য বিস্তারের মুখ্য অস্ত্র।

এই নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ অনুগ্রহে বা প্রশ্রয়ে সৃষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলির রাজবংশের যদি স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাকে, সেক্ষেত্রে দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকারে প্রচলিত ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি দেবে না এবং সেক্ষেত্রে সেই রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনকি এ-যাবৎ দত্তক পুত্র গ্রহণের যে বিশেষ অনুমতি দানের ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকারের ছিল ডালহৌসী তাও বাতিল করে দেন। এই স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা ডালহৌসী সাঁতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, উড়িষ্যার সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর ও কেরৌলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগে তিনি কর্ণাটক, তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব রাজন্যবর্গের ভাতা ও উপাধি বাতিল করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে ভাতা বা বৃত্তি পাওয়ার অধিকার এবং উত্তরাধিকার সূত্রে উপাধি গ্রহণের প্রচলিত ব্যবস্থা স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগে বাতিল্ করেন।

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও-এর দত্তক পুত্র ধুন্দুপন্থকে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা ডালহৌসী ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাতিল করে বলেন যে, এই বৃত্তি বা ভাতা পেশোয়াকে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হয়েছিল; উত্তরাধিকার সূত্রে নয়।

প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে ডালহৌসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ ও দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে লিপ্ত হন। এর মাধ্যমে ডালহৌসী পাঞ্জাব দখল করেন এবং ব্রহ্মদেশের এক বিরাট অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন।

অযোধ্যাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ডালহৌসী এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করেন। অযোধ্যা রাজ্য বক্সারের যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজদের অত্যন্ত অনুগত ছিল। তাছাড়া অযোধ্যার নবাবের স্বীকৃত উত্তরাধিকারীর সংখ্যাও ছিল অনেক। স্বভাবতই স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ এক্ষেত্রে সম্ভব নয় উপলব্ধি করে ডালহৌসী অন্য কোন অজুহাতের অপেক্ষায় ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অযোধ্যাবাসীদের দুর্গতি লাঘবে সচেষ্ট হন। জনগণের দুর্দশার জন্যে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ-এর বিরুদ্ধে অপশাসনের অপবাদ দানপূর্বক কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যাকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সরাসরি ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

অধীনতামূলক মিত্রতার সুবাদে হায়দ্রাবাদে ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করা ছিল। কিন্তু নিজাম এই সেনাবাহিনীর ব্যয় হিসেবে নিয়মিত অর্থ প্রদানে অসমর্থ হওয়ার পরিবর্তে বেরার রাজ্য ডালহৌসী ইংরেজ অধিকারে আনেন।

স্যার রিচার্ড টেম্পল ডালহৌসীকে ভারতে ইংরেজ শক্তিকে একমাত্র শক্তি হিসেবে কায়েম করার নায়ক বলে আখ্যা দেন।

তবে ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য ও বিস্তার নীতির কবলে দেশীয় রাজন্যবর্গের সহায়হীন অবস্থা ক্রমশ জনগণকে ইংরেজ-বিদ্বেষী করে তোলে এবং এর বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের মাধ্যমে।

প্রশাসনিক কাঠামো
(Administrative Foundations)
[illegible]

প্রথম পরিচ্ছেদ
ভারতে ব্রিটিশ শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্রমবিকাশ
(১৭৬৫ সাল পর্যন্ত)
(Nature of the growth of British Political Power till 1765)

১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় ইংরেজদের অসামান্য সাফল্য এবং ইংরেজ প্রভাব বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাইভ-এর হাতে বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দানের প্রস্তাব করেন দিল্লীর দরবার। প্রথম দিকে এই দায়িত্ব গ্রহণে ক্লাইভ গররাজি ছিলেন। তবে বক্সারের যুদ্ধে দেশীয় নবাবদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়লে এবং বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক আধিপত্য নিশ্চিত হলে দেওয়ানী লাভের ব্যাপারে ইংরেজগণ তৎপরতা দেখান এবং তদনুসারে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের দ্বারা ইংরেজগণ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী ও তাঁর দেওয়ানী লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই দেওয়ানী লাভই ঐ মৈত্রীর রাজনৈতিক থেকে ইংরেজদের প্রকৃত লাভ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রা[illegible] রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নে এই দেওয়ানী লাভ অবশ্যই ইংরেজদের পক্ষে বাংলায় সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণ না করেও প্রকৃত কর্তৃত্ব স্থাপনের অধিকার প্রমাণ করে। মহম্মদ রেজা খাঁর নায়েব-দেওয়ান পদে নিয়োগ বাংলার শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিস্তারে ইংরেজদের কাছে প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে নবাব পদ বাহ্যিক ভাবে বজায় থাকলেও প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা বলতে নবাবের আর কিছুই রইল না। প্রকারান্তরে ইংরেজগণ এটাই চেয়েছিলেন। কারণ, ইংরেজগণ নবাবী খারিজ করে সরাসরি শাসনক্ষমতা লাভ করলে অন্য ইউরোপীয় শক্তিগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে ইংরেজ–অধিকার অস্বীকার করার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া দেশীয় নৃপতিদের মনেও ইংরেজ-ভীতি উদ্ভাবিত হত। তাছাড়া রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভে ইংরেজদের আর্থিক অবস্থার অনেকটা সুরাহা হয় এবং এই আর্থিক সচ্ছলতা আগামী দিনে কোম্পানির রাজ্য বিস্তারের পক্ষে খুবই সহায়ক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। বস্তুতঃ কোম্পানি দায়িত্ব পালন না করেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হল।

দেওয়ানী লাভের ফলে বাংলার নবাব বৃত্তিভোগীতে পরিণত হয় এবং ক্লাইভ বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন। এই দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা

ইংরেজদের হাতে ন্যস্ত হয় এবং কাগজ কলমে নবাবকে যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয় নবাবের পক্ষে তা পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দ্বৈতশাসন প্রকারান্তরে অপশাসনে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে জনগণের কল্যাণে , ইংরেজ বা নবাব কারো বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। দ্বৈতশাসনের ফলে উদ্ভূত অবস্থায় ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে উভয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠল। ইংরেজ ঐতিহাসিক র‍্যাম্‌সে-মুর এই দ্বৈতশাসনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে অভিহিত করেন। দ্বৈতশাসনের কুফল এবং সেই সঙ্গে বাংলার সম্পদ বাইরে চলে যাওয়ায় বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে এক দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক কে (Kaye)-এর মতে দ্বৈতশাসনে বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পায় এবং দুর্নীতি আরও বিস্তৃত হয়।

দ্বৈত শাসন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কেন্দ্রীয়করণ

(Centralisation)

ভারতে কোম্পানির ক্ষমতায় অধিকৃত সাম্রাজ্য প্রকারান্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়। বিগত অর্ধ-শতাব্দী অবধি ভারতে বিভিন্ন অংশে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তৃত হলেও সমগ্র ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বা নির্দেশ দান এ যাবৎ হয় নি। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অগ্রগতির প্রতি বিলেতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এবং এর ফলেই সমগ্র ভারতে ইংরেজ শক্তিকে প্রকৃতভাবে কায়েম করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এখানে ব্রিটিশ প্রতিনিধিভিত্তিক শাসনকে উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত করার জন্যে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করে। এটিই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত সম্পর্কে আইন প্রণয়নের প্রথম নজির। ফলে এর মাধ্যমে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয়করণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইংরেজ কোম্পানি—ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রমশঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে শুরু করল। ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও কোম্পানীর ইংল্যাণ্ডস্থিত শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ও ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও ভারতস্থিত কোম্পানীর শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেন। এই চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের সাহায্যে শাসন পরিচালনার জন্যে মূলত রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করা হয়।

শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়করণের বিভিন্ন ব্যবস্থা

রেগুলেটিং অ্যাক্ট শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণের ক্ষেত্রে একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ। এর দ্বারা কোম্পানির গঠনতন্ত্রে নিয়মানুবর্তিতা, চালু করা হয় এবং পরোক্ষভাবে কোম্পানীর রাজস্বসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ বাধ্যতামূলকভাবে ব্রিটিশ ট্রেজারির কাছে, সামরিক ও বেসামরিক বিষয়ক তথ্যাদি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে পেশ করার কথা লেখা ছিল।

অপরপক্ষে কোম্পানির ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পিত হল গভর্নর জেনারেল এবং চারজন সদস্যবিশিষ্ট এক কাউন্সিলের উপর। এদের

নিয়োগও রাজকীয় কর্তৃত্বের উপর ন্যস্ত ছিল। তাছাড়া কলকাতার গভর্নর ও কাউন্সিল অতঃপর গভর্নর জেনারেল ও সুপ্রীম কাউন্সিল বলে অভিহিত হল। গভর্নর জেনারেল ও সুপ্রীম কাউন্সিলের মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাজের নির্দেশ ও তদারকী করার ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতাস্থিত ব্রিটিশ শাসকগণই কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামোর কার্যভার গ্রহণ করল। এই আইন অনুসারে ভারতের কোম্পানির উপর ব্রিটিশ সরকারের এক সক্রিয় ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এছাড়া বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়করণের জন্য সুপ্রীমকোর্ট স্থাপন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যাই হোক রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর মধ্যে নানা ধরনের ত্রুটি এবং অসামঞ্জস্য, ভারতে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অক্ষমতার জন্য কর্তৃত্ব স্থাপনে অসুবিধা দেখা দেয়। যদিও এই আইনের বলে কোম্পানির কাছ থেকে পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সূচনা মনে করা হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্টের ব্যবহারিক ত্রুটিগুলিকে দূর করার জন্যে পরে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংশোধনী আইন পাশ করা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে সুসংহত করে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে সর্বোচ্চ করার জন্যে শাসনক্ষেত্রে নানা সংস্কার বিধান করতে উদ্যত হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর ত্রুটিগুলি দূরীকরণ এবং ব্রিটিশ রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গুরুত্বপূর্ণ 'পিট্‌স ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' পাশ করা হয়। এই আইন প্রণয়নে অবশ্যই ভারতে কোম্পানি-সংক্রান্ত বিষয়ে এবং শাসনক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারকে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দান করা হয়। এর ফলে ভারত-সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ছ'জন কমিশনার বিশিষ্ট বোর্ড-অফ-কন্ট্রোল স্থাপন এবং এ বিষয়ে দুজন ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই বোর্ড-অফ-কন্ট্রোল কোর্ট অফ ডাইরেক্টরেট ও ভারত শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশদান এবং কর্তৃত্ব লাভ করে। সাধারণভাবে ভারতের শাসনতন্ত্র এই পিট্‌স-ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। ক্রমান্বয়ে কোম্পানির ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা এর দ্বারা খর্ব করা হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ স্বার্থের ক্ষেত্রে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত হয় গভর্নর জেনারেলের উপর। ফলে কোম্পানির ভারতীয় সাম্রাজ্যের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিচার বিভাগ ও পুলিশী ব্যবস্থা
(Judicial and Police System)

ভারতে ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো তিনটি প্রধান স্তম্ভকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এগুলো হল, (১) সিভিল সার্ভিস, (২) সামরিক বাহিনী এবং (৩) পুলিশী ব্যবস্থা।

প্রথমোক্ত সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করে। কার্যতঃ এই সিভিল সার্ভিস

ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারাই ভারতে একটি 'ইস্পাত-কঠিন' ভিত্তি স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষ পরিচালনা ও শাসন কায়েমের পথ সহজ করে তোলে। দ্বিতীয়তঃ সামরিক বাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ব্যবস্থা ছিল এমনই পরিকল্পনাপ্রসূত যে ভারতীয় সৈনিকগণ এই ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত সুযোগাদি ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছ থেকে কখনই আশা করতে পারেনি।

সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনী

পুলিশী ব্যবস্থায় সুচারু ও নিপুণ সংস্কার ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে বহু ক্ষেত্রে সুসংহত করতে সাহায্য করে। এই সংস্কারের প্রবর্তক ছিলেন কর্নওয়ালিস। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা জমিদারগণ কর্তৃক পুলিশী ব্যবস্থার পরিচালনা বন্ধ করা হল। পরিবর্তে একটি স্থায়ী পুলিশ বাহিনীর সৃষ্টি হয় এবং তাদের হাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে পুরনো ভারতীয় 'থানা' সংক্রান্ত কাঠামো বদল করে নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হল কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত পুলিশী ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এতই উন্নত হল যে ব্রিটেনে চালু পুলিশী ব্যবস্থার তখন ততখানি অগ্রগতি ছিল না। কর্নওয়ালিস থানা বা সার্কেল প্রথা প্রবর্তন করে একজন করে ভারতীয় দারোগার অধীনস্থ করেন। পরবর্তীকালে জেলা পুলিশের প্রধান হিসেবে জেলা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের পদের সৃষ্টি হয়। এবং এক্ষেত্রেও এই পদগুলি ভারতীয়দের আওতার বাইরে রাখা হয়। গ্রামবাসীদের দ্বারা প্রচলিত গ্রামীণ প্রহরী-ব্যবস্থা গ্রামগুলিতে পূর্বের মতোই প্রচলিত ছিল। পুলিশ বাহিনী ক্রমশঃ অপরাধের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয় এবং ঠগী দমনের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অনেক সময় বৈদেশিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগঠিত চক্রান্তকে পুলিশ বাহিনী দমন করতে সক্ষম হয় এবং কালক্রমে যখন জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় তখন এই পুলিশ বাহিনীকে এই আন্দোলন দমন করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের ব্যবহার ছিল সহানুভূতিহীন।

ভারতে বিচারকার্য পরিচালনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিচার বিভাগীয় সংস্কারের মাধ্যমে একটি নতুন ভিত্তি স্থাপন করা হয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কাঠামোর মাধ্যমেই এই বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হত। ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক প্রবর্তিত বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাদিকে সুসংহতভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্নওয়ালিস কর্তৃক সম্পাদিত হয়। প্রতি জেলায় একটি করে দেওয়ানী আদালত স্থাপন করে তার দায়িত্ব দেওয়া হয় সিভিল-সার্ভিস থেকে নিযুক্ত একজন জেলা জজের উপর। এভাবে কর্নওয়ালিস জেলা দেওয়ানী জজের পদ এবং কালেক্টরের পদ দুটিকে পৃথক করেন। জেলা কোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল প্রথমে চারটি প্রাদেশিক দেওয়ানী আদালতে পেশ করা যাবে এবং সব শেষে তা সদর দেওয়ানী আদালতে রুজু করার ব্যবস্থা করা হয়। জেলা কোর্টের নীচে রেজিস্ট্রার কোর্ট ইউরোপীয় বিচারকের অধীনে এবং বহু সংখ্যক নিম্ন-আদালত ভারতীয় বিচারকদের দায়িত্বে স্থাপিত হয়। এই ভারতীয় বিচারকগণ 'মুনসেফ' এবং 'আমিন' নামে অভিহিত হত। ফৌজদারী

বিচার ব্যবস্থা

বিচার সম্পাদনার জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সিকে চারটি বিভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি বিভাগে একটি সার্কিট কোর্ট স্থাপন করেন। এগুলিকে সিভিল-সার্ভিসের লোকদের অধীনে রাখা হল। এগুলোর অধীনে আবার বহু সংখ্যক আদালত স্থাপন করা হয় এবং ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের ছোট ছোট মামলা বিচারের অধিকার দেওয়া হয়। সার্কিট কোর্ট থেকে আপীল শুধু সদর দেওয়ানী আদালতে রুজু করা যেত। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা মুসলিম ফৌজদারী বিধি অনুযায়ী সম্পন্ন হলেও তা পূর্বের ন্যায় কঠোর ছিল না। দেওয়ানী বিচার সংঘটিত হত প্রচলিত আঞ্চলিক বিধি অনুযায়ী। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে বহু সংস্কারের মাধ্যমে প্রাদেশিক বিচারালয় এবং সার্কিট কোর্টের বিলুপ্তি ঘটান। এবং ভারতীয় বিচারকদের পদ ও মর্যাদাকে উন্নত করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সদর নিজামত ও দেওয়ানী কোর্টের পরিবর্তে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়।

ব্রিটিশ বিচার বিভাগীয় সংস্কারের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নানা সময়ে আইন প্রণয়ন ও পুরাতন প্রচলিত আইনের সংহতির দ্বারা আধুনিকীকরণ করা হয়। ভারতে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা ছিল মূলতঃ প্রাচীন ঐতিহ্য ও পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে আবার ঐ আইনবিধি শাস্ত্রের বিধান, শরিয়ত বা রাজকীয় বিধির উপর নির্ভরশীল ছিল। ব্রিটিশ-প্রবর্তিত ব্যবস্থা সাধারণভাবে ঐ প্রচলিত বিধির উপরই পরিচালিত হলেও ক্রমশঃ ব্রিটিশগণ নতুন আইন বিধি প্রণয়ন করে। এই নতুন বিধিব্যবস্থা নানা সময়ে নিয়ন্ত্রিত বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে প্রণয়ন করা হত। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সনদ আইনের দ্বারা আইন প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতা গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হয়। এভাবে ভারতীয়গণ ক্রমশঃ যুক্তির মাধ্যমে প্রণীত আইনের আওতায় চলে আসে। তারা তাদের বিগত দিনের 'স্বর্গীয় বিধি'কে অন্ধের ন্যায় গ্রহণ করার প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়।

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড মেকলের নেতৃত্বে ল-কমিশন গঠন করে ভারতীয় আইনবিধিকে সুসংহত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই কমিশনের সার্থক প্রয়াসের ফলেই ভারতীয় দণ্ডবিধি ও পাশ্চাত্য বিধি থেকে আহরিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনবিধি ও পদ্ধতি প্রচলন সম্ভব হয়। ফলে সমস্ত ভারতে একই আইনবিধি চালু হয় এবং বিচার বিভাগীয় সংস্কারের দ্বারা সর্বভারতে এক অভিন্ন ব্যবস্থা চালু হয়।

ব্রিটিশদের অধীনে বিচার বিভাগীয় সংস্কারের দ্বারা এমন একটি আইনবিধি প্রচলিত হল যার মাধ্যমে আইনের চক্ষে সবাই সমান বলে প্রতিপন্ন হল। কার্যক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের বিচারের বিধি ও আদালত ভিন্ন ধরনের ছিল। তুলনামূলক বিচারে ভারতে ছিল প্রাক্-ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

(Land Revenue System)

ইংরেজগণ প্রায় সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে তাদের প্রভুত্ব স্থাপন করার ফলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও আর্থিক দিক থেকে নিজেদের আত্মবিশ্বাস তৈরি

করার জন্যে প্রয়োজন ছিল নির্দিষ্ট পরিমাণের আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই মূলতঃ কৃষিপ্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির একটিমাত্র পথই সহজ ছিল, কৃষি থেকে আয় বৃদ্ধি।

কালক্রমে ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের ব্যবসার প্রসারের জন্যে শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে এবং ভারতে ব্রিটিশ শক্তির আধিপত্য বিস্তারের জন্য সংঘটিত যুদ্ধগুলি পরিচালিত করেছিল ভারতীয় কৃষিজীবীদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত করের মাধ্যমেই।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভ কার্যতঃ তাদের রাজস্বের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দান করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজগণ রাজস্ব আদায়ের পুরাতন ব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষপাতী হলেও ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সরাসরি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওয়ারেন হেস্টিংস নিলামের দ্বারা সর্বোচ্চ রাজস্বদাতাকে জমি বিলির ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তা কোম্পানির বহু আকাঙ্ক্ষিত রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে সার্থক করতে পারেনি। এই ব্যবস্থা, দ্বারা ভূমি-রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হেস্টিংস বহুগুণে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তথাপি প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট হারে আদায় না হওয়ায় সরকারী আশা পূরণ হয়নি। ইংরেজ কোম্পানির আর্থিক অনটনের মধ্যে রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার অক্ষমতার জন্যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে নানা বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয়।

অবশেষে বহু আলোচনার পর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্নওয়ালিস বাংলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রতি বছর নির্দিষ্ট ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে কোম্পানির আয়ের অঙ্ক নির্দিষ্ট থাকার ফলে তাদের পক্ষে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয়ে উঠল।

চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে কোম্পানি প্রধানত কয়েকটি জরুরী রাজনৈতিক, আর্থিক ও শাসনতান্ত্রিক কার্যসিদ্ধির সমাধান করতে বদ্ধপরিকর হয়। এর মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্য হল আর্থিক নিরাপত্তা সৃষ্টি করা। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোম্পানির আয়ের মূলে ছিল ভূমিরাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ। অথচ এ ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণে স্থিতিশীলতা না থাকায় নানাভাবে কোম্পানি অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে ভূমিরাজস্ব থেকে কোম্পানির আয়ের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং এই আয় মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল ছিল।

দক্ষিণ-ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে ঐ অঞ্চলে ভূমিব্যবস্থার ব্যাপারে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। সরকারী প্রবক্তাগণ এই অঞ্চলে জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ জমিদারী ব্যবস্থা প্রচলিত অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে তুলবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। মনরো এবং রিড প্রমুখ ইংরেজ অফিসারগণ এই অঞ্চলে সরাসরি কৃষকের সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্যে সুপারিশ করেন। উপরন্তু তাঁরা বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানি

রায়তারী বন্দোবস্ত

আর্থিক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। কেননা কোনমতেই কোম্পানির জমি থেকে অতিরিক্ত আয় আদায় করার অধিকার এই ব্যবস্থায় ছিল না। তাদের সুপারিশ করা এই নতুন বন্দোবস্ত 'রায়তারী বন্দোবস্ত' নামে প্রচলন করা হয়। এই ব্যবস্থা বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনেক অংশে চালু করা হয়। এই বন্দোবস্ত যেহেতু চিরস্থায়ী নয় সেক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ বছরের ব্যবধানে নতুন রাজস্ব নির্ধারিত করে পূর্ণ বন্দোবস্ত করার সুযোগ থাকায় কোম্পানির আয় বৃদ্ধির সুযোগ থাকে। উপরন্তু সরকারী ইচ্ছানুযায়ী ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে রায়তগণ উচ্চহারে ভূমিরাজস্ব দিতে অসমর্থ হত। ফলে অনেককে তাদের জমি পরিত্যাগ করতে হত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্য নষ্ট হলেও নির্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব দিতে তারা বাধ্য ছিল। রায়তারী বন্দোবস্তে কৃষকদের মালিকানা স্বত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। বহু সংখ্যক জমিদারের পরিবর্তে রাষ্ট্র এক বৃহৎ জমিদারের ভূমিকা নিয়েছিল। সে কারণে সরকার এই ভূমিরাজস্বকে কর হিসেবে দাবি না করে খাজনা হিসেবেই দাবি করেছে।

গাঙ্গেয় উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে, মধ্য-ভারতের কিছু অংশ ও পাঞ্জাবে জমিদারী ব্যবস্থারই রূপান্তর মহল্লাবী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গ্রামভিত্তিক বা মহল্লাভিত্তিক পদ্ধতিতে করার ফলে একাধিক জমিদারের যৌথ অধীনে জমিগুলি আনা হয়। পাঞ্জাবে অবশ্য কিছুটা পরিবর্তিত মহল্লাবী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। মহল্লাবী বন্দোবস্ত-কৃত অঞ্চলেও সময়ভিত্তিক ভূমিরাজস্ব পরিবর্তনের ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল। সারা দেশে জমি বিক্রয় ব্যবস্থা, মালিকানা হস্তান্তরের সুবিধা এবং জমি বন্ধকদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এভাবে নতুন ব্যক্তিগত জমির মালিকানা প্রথার সূচনা হলে এর দ্বারা কৃষকের কোন লাভ হয়নি। এই নতুন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র সরকারি রাজস্বের আদায় সুরক্ষিত হল। যদি জমি হস্তান্তর প্রথা চালু না হত তবে সরকারের পক্ষে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হত। কৃষক যদি জমি বন্ধক না দিতে পারে তবে তার পক্ষে রাজস্ব মেটানো সম্ভব হত না। প্রকৃতপক্ষে তার সঞ্চিত সম্পদ বলে কিছুই থাকত না।

মহল্লাবী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজদের অনুগত একশ্রেণীর জমিদার তৈরি হয় যারা ভারতে ইংরেজ স্বার্থ কায়েম করার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে এই শ্রেণীর নয়া জমিদারগণ ইংরেজ-পক্ষ নেয়।

প্রকৃতপক্ষে এই নতুন ব্যবস্থায় জমিদারগণ উপলব্ধি করল যে তারা নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে পারলে তাদের জমি বে-হাত হবে না। তাছাড়া জমি উন্নয়ন এবং কৃষি ব্যবস্থার যথোপযুক্ত উন্নতির কোন চেষ্টাই তারা করেনি এবং কৃষকদের উপর জোরজুলুম করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করত। অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই জমিদারগণ গ্রাম ছেড়ে শহরাভিমুখী হয় এবং জমিদারগণের পাইক-বরকন্দাজগণ স্থানীয় কৃষকদের উপর অত্যাচার চালায়। কার্যতঃ এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নতুন জমিদারদের

আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পায় আর অন্যদিকে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়।

মধ্যভারতে ও অযোধ্যায় ব্রিটিশ সরকার অস্থায়ী জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং জমিদারগণ ভূমিরাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে নতুন ধার্য ভূমিরাজস্ব হার অনুযায়ী খাজনা দিতে বাধ্য হত। এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে নতুন এক শ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি হতে শুরু করল—যারা ছিল সরকারের তাবেদার ও তাবেদারির পুরস্কার স্বরূপ তারা জমির ইজারা লাভ করত।

ভারতে প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে ইংরেজগণ ভারতীয় গ্রামীণ কাঠামোয় পুরোপুরি অস্থিতিকর অবস্থা সৃষ্টি করে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে।

ভারতীয় কাঁচামালকে ইংরেজদের উৎপাদনের কাজে লাগানোর জন্যে ভারতীয়গণকে জমিতে অর্থ লগ্নী করাতে উৎসাহী করে তুলতে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে ভারতীয় অর্থনীতিকে কৃষিভিত্তিক করে তোলা হয়। সমসাময়িক ইওরোপের শিল্পবিপ্লবের ঢেউ তাই কোনভাবেই ভারতীয় অর্থনীতিকে স্পর্শ করতে পারেনি।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও কিছু ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস।
(Expansion of India's foreign trade and decline of some Indian industries.)
২২শ অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশ-সমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের মানচিত্রে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী যাবৎ অগ্রণী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম বলে চিহ্নিত হয়ে এসেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারে ভারতবর্ষের একটি ব্যস্ততার অধ্যায়। এই সময় বিভিন্ন ইওরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করলে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে এবং বাংলার সামগ্রিক বাণিজ্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হত প্রধানতঃ পারস্য, আবিসিনিয়া, আরব, তুরস্ক ও আর্মেনিয়া দেশের সঙ্গে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বৈদেশিক বণিকগণ কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করত। বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল মণিমুক্তা, পশম, খেজুর, শুকনো ফল এবং গোলাপনির্যাস, চীনামাটির দ্রব্যাদি, গন্ধদ্রব্য, হাতির দাঁতের জিনিসপত্র, তামা, লোহা ও সীসা। ভারত থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সূতীবস্ত্র। এই সূতীবস্ত্রের উৎকর্ষের দরুণ বিদেশে খুবই কদর ছিল এবং চাহিদাও ছিল প্রচুর। তাছাড়া ভারত সিল্ক ও বয়নজাত দ্রব্যাদি, লৌহ দ্বারা নির্মিত দ্রব্যাদি, স্টীল, সোরা, আফিম, চাল, গম, চিনি, গোলমরিচ ও অন্যান্য মসলা-এবং মূল্যবান পাথর বিদেশে রপ্তানি করত।

ভারতবর্ষ মোটামুটি হস্তশিল্পজ দ্রব্যাদি ও কৃষিজাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ায় এই সকল দ্রব্য বিদেশ থেকে প্রায় আমদানি হতই না। অপরপক্ষে অনেক শিল্পজাত দ্রব্য ও কৃষিজাত সামগ্রীর বিদেশী বাজার ভারতের পক্ষে অনুকূল ছিল। ফলে রপ্তানি স্থিতিশীল ছিল। স্বভাবতই আমদানি অপেক্ষা রপ্তানিই বেশি ছিল। ফলে সোনা এবং রূপা আমদানি করে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা হত। বিদেশীগণ ভারতকে মূল্যবান ধাতুর খনি বলে মনে করত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্রমান্বয় যুদ্ধ-পরিস্থিতি এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বাধার সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার মুখ্য মাধ্যম যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিল অরক্ষিত। ফলে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার কিছুটা থমকে যায়। তাছাড়া আঞ্চলিক

ভিত্তিতে স্ব স্ব প্রধান শাসকগণ কর্তৃক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশগুলিতে অগণিত শুল্ক আদায়কেন্দ্র সৃষ্ট হয়। বিদেশী ব্যবসায়ীদের নানাভাবে বেশি পরিমাণে শুল্ক দিতে বাধ্য করার ফলে পরিস্থিতি বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ভারতে বিদেশী পণ্যের ব্যবহারকারীগণ মুখ্যতঃ অভিজাত শ্রেণীভুক্ত মানুষের সামগ্রিক সঙ্গতির অভাবজনিত কারণে বিদেশী জিনিসের চাহিদা কমে যায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শ্লথ হয়ে পড়ে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় ইংরেজদের অভাবনীয় রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাঁদের একাধিপত্য স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ ইংরেজগণই তখন থেকে একচেটিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা শুরু করে। এবং ভারতীয়রা বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান শরিক হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে, ভারতে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিযোগিতা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কার্যকলাপে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। ইউরোপীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির মূল কারণ ছিল, মোগল শাসকদের কাছ থেকে অধিক অনুগ্রহ ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভ।

যাই হোক, বিদেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদার মূল কারণ, ভারতীয় কারিগরদের উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের নৈপুণ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতবর্ষ বিশ্বে শিল্প ও বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রসঙ্গতঃ রাশিয়ায় পিটার-দি-গ্রেট বলেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববাণিজ্য বলতে ভারতীয় বাণিজ্যকেই বোঝায় এবং যার পক্ষে এই বাণিজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন সম্ভব হবে সেই-ই ইউরোপের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারবে।

শুধুমাত্র ব্যবসায়িক কার্যকলাপের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অভূতপূর্বভাবে বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি (ভারতীয় সূতাবস্ত্র ও সিল্ক-এর পরিমাণ ব্যতিরেকে) পায়। এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় তের লক্ষ স্টারলিং।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতে ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতিদের ক্রমাগত চাপের ফলে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের অবসান ঘটে এবং ভারতে অবাধ বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই ইউরোপীয় বণিক ভারতে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতীয় উপমহাদেশে পুরো উদ্যমে শুরু হয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিধি বহুগুণে বিস্তৃত হয়।

কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লুপ্ত হলেও অবাধ বাণিজ্যনীতি গৃহীত হওয়ার ফলস্বরূপ ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ক্রমশ ভারতীয় বাজারে ব্রিটিশজাত পণ্য সামগ্রীর আমদানির পরিমাণ বহু পরিমাণে বেড়ে যায় এবং স্বল্প আমদানি শুল্ক ব্রিটিশ সামগ্রীর সঙ্গে উচ্চ শুল্ক চাপানো

ভারতীয় সামগ্রী, বিশেষ করে সূতী বস্ত্রশিল্পের প্রভূত ক্ষতি হয়। অত্যধিক শুল্ক হারের ফলে ভারতীয় পণ্যসামগ্রী রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পায়। ভারতীয় শিল্পগুলি ধ্বংস হয় এবং জনবহুল শিল্পকেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত হয়। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণগত ফারাক বেড়ে যাওয়ায় ভারতীয় অর্থনীতির নাভিশ্বাস শুরু হয়। সামগ্রিক বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা পর্যালোচনায় এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে প্রাথমিক পর্বে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাফল্য খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। ঠিক এ-সময়ে ইংল্যাণ্ডের শিল্পগুলি অনুন্নত থাকার ফলে শিল্পজাত পণ্য ভারতে রপ্তানি করে বাজার অধিকার করা ইংরেজদের পক্ষে খুব সুবিধাজনক হয়নি। অর্থাৎ প্রথমদিকে ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত ইংরেজ কোম্পানি ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করত বটে তবে তার বিনিময়ে ভারতে তাঁরা স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানি করত।

পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের পর এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। শীঘ্রই ইংরেজগণের ভারতীয় পণ্যসামগ্রী কম মূল্যে ক্রয় করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে ভারতীয় তাঁতী ও কৃষকগণ অত্যাচারিত হতে থাকে। সুতী ও রেশমজাত শিল্প সামগ্রী সর্বাধিক পরিমাণে রপ্তানি করা হত। কারণ এই দুই ভারতীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ফলে শুরু হয় এই ভারতীয় কারিগরদের উপর অত্যাচার। ইংরেজ কোম্পানি নিয়মিত সূতীবস্ত্রের যোগানের জন্য তাঁরা ভারতীয় তাঁতীদের সঙ্গে আগাম চুক্তি সম্পাদন করত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উৎপাদন মূল্যের অনেক কমে তাঁতীদের চুক্তি করতে বাধ্য করত। এক কথায় ভারতীয় কারিগরগণ ইংরেজ কোম্পানির অধীনস্থ ক্রীতদাসে পরিণত হয়। এই অবস্থার ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্পের শিল্পজাত উৎপাদন সামগ্রীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় দ্রব্য ইংরেজ কোম্পানির কর্তৃত্বাধীনে চলে যায় এবং ভারতীয় তাঁতীগণের ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়। ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্যের ফলে এদেশে কাঁচামাল কম দামে ক্রয় করে পরিবর্তে বিলাতী মাল চড়া দামে ভারতের বাজারে বিক্রয় হতে শুরু করল। বিলাতের এই যান্ত্রিক উৎপাদিত বস্ত্র শুধু সস্তা নয় এর বৃহৎ উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে ভারতীয় উৎপাদিত পণ্য কোনমতেই প্রয়োজনীয় মান ও পরিমাণে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্যলাভ করতে পারল না। লর্ড লিটনের আমলে ইংরেজদের দ্বারা আমদানিকৃত তুলা ও সূতী বস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করলে বিলেতী সস্তা কাপড় ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলে। ভারতীয়রা সূতীবস্ত্র ও তুলা অল্প দামে বিক্রি করে আর বেশি দামে বিলেতী মাল ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

এভাবে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যকে প্রায় নিঃশেষ করে ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করা হয়। ব্রিটিশ-ভারতে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে এবং পরিবর্তিত এই আর্থনীতিক কাঠামোর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় ব্রিটিশ অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। এক্ষেত্রে অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে ইংরেজ কোম্পানির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্বোক্ত শক্তিগণ ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েও ভারতের প্রচলিত অর্থনীতিতে কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় নি। কিন্তু ইংরেজগণ প্রচলিত

ভারতীয় অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ আঘাত করে ভারতীয় সম্পদকে নিজেদের প্রয়োজন ব্যবহার করতে উদ্যত হয়।

এই স্বার্থের তাগিদে ইংরেজগণ ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে এ-দেশকে তাদের আর্থিক লালসা মেটানোর উর্বরভূমি বলে মনে করত।

মধ্যযুগীয় শিল্প উৎপাদনের কাঠামো এবং সেই সঙ্গে উৎপাদন ও উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বাজারীকরণের অসুবিধা আর ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসাকে দুর্বল করার পক্ষে সস্তায় যন্ত্রে উৎপাদিত ব্রিটিশ সামগ্রী কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একমুখী ব্রিটিশ রপ্তানি ব্যবস্থার দ্বারা ব্রিটিশ উৎপাদকগণের ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করার প্রয়াসে প্রথমেই আঘাত করল ভারতীয় সূতী বস্ত্রের শিল্পকে। ব্রিটেনের যন্ত্রে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণে সূতীবস্ত্রের সঙ্গে কোনপ্রকার পুরাতন উৎপাদন-পদ্ধতিতে প্রস্তুত ভারতীয় সূতীবস্ত্র কোনভাবেই প্রতিযোগিতায় নামতে পারল না।

ভারতীয় গ্রাম্য শিল্পী ও গ্রামীণ শিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীন হয়ে উঠল। ব্রিটিশ-প্রবর্তিত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার অঙ্গহিসেবে রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিলেতে উৎপাদিত সামগ্রী সহজেই পৌছতে শুরু করল। ভারতের চিরাচরিত সুদূর গ্রামাঞ্চলের শিল্পগুলি তার ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। আমেরিকান লেখক ডি এইচ বুকানন্ এ প্রসঙ্গে বলেন যে এই রেল যোগাযোগের ফলে বিক্ষিপ্ত স্বাবলম্বী ভারতীয় গ্রামগুলির ক্রমশঃ রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

সূতীবস্ত্র বয়নশিল্প এই ব্রিটিশ প্রয়াসের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক্রমশঃ কাঁচা সিল্ক এবং সিল্ক ও পশম বয়নশিল্পেও আঘাত করেছিল।

সাধারণভাবে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে জাতীয় হস্তশিল্প কোম্পানির রপ্তানিসংক্রান্ত নীতিতে লাভবান হওয়ার পরিবর্তে ইংরেজদের এইসকল শিল্পের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ঐ গ্রামীণ হস্তশিল্পকে বিধ্বস্ত করে ফেলে।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্কস্থাপন সহ অন্যান্য নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে ব্রিটেনে আধুনিক শিল্প উৎপাদনের পদ্ধতি ভারতীয় সামগ্রীর ইউরোপীয় বাজারে প্রবেশ প্রায় বন্ধ করে ফেলেছিল। তাছাড়া ভারতীয় নৃপতিগণ যাঁরা ভারতীয় শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ক্রমশঃ তাঁদের তিরোধান ভারতীয় উৎপাদিত শিল্পের পক্ষে খুবই দুঃসময়ের সূচনা করে। উপরন্তু ভারতকে কাঁচামাল উচ্চমূল্যে রপ্তানি করার ব্রিটিশ নীতিও ভারতীয় হস্তশিল্পে ও গ্রামীণ শিল্পের বিশেষ ক্ষতি করে। ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদনের বর্ধিত ব্যয় বিদেশী সামগ্রীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অক্ষম হয়।

এক্ষেত্রে ভারতের চিরাচরিত শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থা ব্রিটেন এবং পশ্চিম ইউরোপের উন্নত যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পর্যায়ে পৌছতে পারলে এই পাশ্চাত্য শিল্পনীতিকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হত। অন্যদিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই গ্রামীণ

শিল্পে নিযুক্ত কারিগরগণ বিকল্প কোন জীবিকার সন্ধান না করতে পেরে কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়। ব্রিটিশ অর্থনীতির ফলে বিধ্বস্ত গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে গিয়ে স্বাবলম্বী ভারতীয় গ্রামগুলিতে কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছিল তা পরিপূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে, কিছু লোক যারা এতদিন তাদের আয়কে আংশিক সময়ের জন্য বিশিষ্ট কাজের দ্বারা ভরতুকী করত তারা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল এবং তাদের একমাত্র জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল। স্বভাবতই জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। এবং ব্রিটিশ-ভারতে সেজন্যে হয় জনসাধারণের চূড়ান্ত দারিদ্র্য।

ভারত শিল্পোৎপাদক ব্রিটেনের কৃষিভিত্তিক উপনিবেশে পরিণত হল এবং ব্রিটিশ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগানদারের ভূমিকা গ্রহণ করল। এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছিল ভারতীয় সূতীবস্ত্র শিল্পে। কয়েক শতাব্দী অবধি যে-ভারতবর্ষ বিশ্বে সর্বাধিক সূতীবস্ত্রের রপ্তানিকারক ছিল সে ব্রিটেনে কাঁচা তুলোর রপ্তানিকারক ও ব্রিটিশ উৎপাদিত সূতীবস্ত্রের আমদানিকারক দেশ-হিসেবে চিহ্নিত হল।

ভারতে ব্রিটিশ-নিয়োজিত সরকারী শাসকগণ ও সেনানায়কগণ অবশ্যই তাঁদের দেশে প্রস্তুত উৎপাদন সামগ্রীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অথচ এদের পূর্বসূরী ভারতীয় শাসকগণ যাদের স্থানে ইংরেজগণ নিযুক্ত হয়েছিল ভারতীয় শিল্পজাত বস্তুর পৃষ্ঠপোষকতার বিলুপ্তির ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় ভারতীয় শিল্পজাত বস্তুও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র
(The Cultural Scene)
অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচ্য শিক্ষার প্রসারতা বা কি ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা এই শিক্ষা প্রবহমান কাল যাবৎ ভারতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায় যে অষ্টাদশ শতক ছিল অন্ধকার যুগ। নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ভারতের জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছিল একটা অবসাদ। আগামী প্রজন্মের কাছে অবশ্যই এটা ছিল অন্তঃসারশূন্য। সুদীর্ঘ মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে ভারতের তদানীন্তন সাংস্কৃতিক জীবনে শিক্ষার ব্যাপকতার অভাবে শিক্ষাকে কখনই সার্বজনীন করা যায়নি। তাছাড়া শিক্ষার মাধ্যম বা শিক্ষাকে গতিমুখী করার জন্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ব্যাপ্তাকারে প্রয়োজন সেটা কখনই উপলব্ধি করা যায়নি। শিক্ষার গণ্ডিও ছিল ক্ষুদ্র এবং সত্যিকারের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনভিত্তিক ও সময়ভিত্তিক করার তাগিদ শাসকশ্রেণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নি। এই পুরাতন নিষ্প্রাণ শিক্ষা ব্যবস্থা স্থানীয় আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে কার্যকরী হওয়ার ফলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে জড়তার সৃষ্টি হয়। মূলতঃ শাসকশ্রেণীর ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার গণ্ডি সীমায়িত ছিল। চেতনাহীন ভারতীয়গণ শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোকে বদলানো বা আধুনিকিরণের তাগিদ বোধ করে নি। তাছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষার যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল—ভারতীয়দের উপযুক্ত জ্ঞান আহরণের চেষ্টার অভাব অথবা নির্দিষ্ট এবং উপযুক্ত শিক্ষার সার্বিকতার অভাব, বৈদেশিক ঘটনাবলী থেকে তাদের জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে প্রথম দিকে শাসকগণ এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। মনে হয় ইংরেজ বংশের ধারণা হয়েছিল যে ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার বেড়ে গেলে ধনী বিলাসে আঘাত লাগবে। তাছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয়গণ আমেরিকাবাসীগণের ন্যায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। উপরন্তু ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থা করা নিরর্থক বলে তারা মনে করতেন। ইংরেজ শাসকগণের

এই বদ্ধমূল ধারণার ফলে প্রায় একশ বছর তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করার কোনও সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। সরকারী দায়দায়িত্বে শিক্ষা বিস্তারের কর্তৃত্ব সে যুগে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। এমন কি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা-আইন প্রবর্তিত হলে ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা প্রসারে সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে দেশে ব্রিটিশ সরকার এ যাবৎ শিক্ষা সংক্রান্ত উদার নীতি নিজেদের দেশেই গ্রহণ করেনি, তারা তা উপনিবেশে গ্রহণ করবে এটা কখনই ভাবা যায় না। স্বভাবতই ভারতে পুরানো শিক্ষাব্যবস্থাই চালু ছিল। টোলে সংস্কৃত শিক্ষা ও মাদ্রাসায় আরবি ও ফার্সি শিক্ষার পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়নি। হিন্দুদের পাঠশালা এবং মুসলমানদের মক্তবে বাংলা, গণিত ও ফার্সি শিক্ষায় প্রাচীন শিক্ষাধারাই অনুসৃত হল। প্রচলিত এই পদ্ধতিতে মৌলিক চিন্তা বা গবেষণা প্রায় অজানাই ছিল। আধুনিক শিক্ষার হাতিয়ার ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাবিস্তারের কোন প্রয়োজনই এই পুরাতন ব্যবস্থা অনুভব করতে পারেনি। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর প্রতিবেদনে তৎকালীন দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে পঠনপাঠন এবং আনুষঙ্গিক উপাদানগুলির এক পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে ঐ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো উল্লেখ করেন। প্রধানতঃ এই শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি ধনী হিন্দু-মুসলমান জমিদার-তালুকদার-বণিকদের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় চলত।

কালক্রমে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি এবং এই উপমহাদেশের জনগণের মধ্যে হতাশা, কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার ও যুক্তিবাদী শিক্ষার অভাবে যখন সমাজের গতি প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, সে মুহূর্তে উদারনৈতিক চিন্তা এবং আধুনিক দর্শনের প্রচারিত কিছু মহান ব্যক্তির নিরলস চেষ্টায় অবশেষে দেশ সেই অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোর পথে অগ্রসর হতে আরম্ভ করল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে ভারতীয়গণের ধর্মান্তরকরণের প্রয়াস। বিলেতে এই উদারপন্থী ধর্মযাজকদের কেন্দ্রস্থল লণ্ডনে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের তৎপরতা শুরু হয় এবং তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে ভারতে কোম্পানির শিক্ষানীতি পরিবর্তনের উল্লেখ করেন।

এ সময় সরকারী পরিচালনাধীন শিক্ষানীতির কোনপ্রকার উল্লেখ না থাকলেও দু-একটি সামান্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজদের অনেকেই এদেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে আগ্রহ দেখান। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরে বারাণসীতে ইংরেজ প্রতিনিধি জোনাথন ডানকান সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে ইংরেজ ব্যবসাবাণিজ্যে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোম্পানির কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্যে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। ভারতীয় পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার হতশ্রী অবস্থা স্বভাবতই বাংলার উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উপযুক্তভাবে এই শিক্ষা বিস্তারের জন্যে হিন্দু কলেজের মাধ্যমে উদ্যম শুরু হয়। তবে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্যে এ-সময় সরকারী উদ্যোগে গঠিত কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ও কলকাতা স্কুল সোসাইটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এ দুই সংস্থার উদ্যোগে দেশীয় ভাষা শিক্ষার যে ব্যবস্থা হয় প্রচলিত দেশীয় বিদ্যালয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই ব্যবস্থা ছিল যুগোপযোগী ভাবাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোজনের মাধ্যমে পরিকল্পিত।

শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি সরকারী উদ্যোগে পরিচালনার প্রথম প্রয়াস শুরু হয় ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে জনশিক্ষা সংক্রান্ত সাধারণ কমিটি (General Committee of Public Instruction) প্রতিষ্ঠা দ্বারা। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হয় না বা রক্ষণশীলতার মনোভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তাই অনুসন্ধানী মনোভাব তৈরি না করতে পারলে কিছুতেই এ শ্বাসরুদ্ধকারী পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত অবস্থার মূল্যায়ন হলেই সফল হবে পরিবর্তনের প্রবাহ, অর্থাৎ পুরাতন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সরে এসে নতুন গতিশীল সমাজ গড়ে তোলাই হবে এই ঈপ্সিত আন্দোলনের কর্মসূচী। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে বাঙালি তথা ভারতবাসী আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং আধুনিক জ্ঞান অর্জনের জন্য উদগ্রীব হয়। তাই শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে উপযুক্তভাবে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে সুবিন্যস্ত করতে পারলেই সমাজ ও সংস্কৃতিতে দেখা দেবে সজীবতা। উনিবিংশ শতকে ভারতীয় শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থায় যে অভিনবত্ব দেখা দেয় তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ইংরেজী শিক্ষার অনুপ্রেরণা থেকেই। ভারতীয়গণ সম্যক উপলব্ধি করেছিল যে এই নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন আগামী দিনে ভারতীয় জনগণকে এক ঐতিহাসিক লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দেবে। ফলে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ভাঙন দেখা দেয় এবং ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী হয়ে উনবিংশ শতাব্দির শেষদিকে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের পর ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মূল কারণগুলোর অন্যতম ছিল সমৃদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু গরিষ্ঠ মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব—যাদের মধ্যে ছিল পাশ্চাত্য ভাষা, পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা। এদেশে ইংরেজদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপনের সঙ্গে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচারসংক্রান্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণের তাগিদে। তাছাড়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কিছু অংশ পাশ্চাত্য ভাষাশিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ভাবধারাকে উপলব্ধি করার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে কলকাতায় ইংরেজী ভাষাশিক্ষার জন্য স্থাপিত হয় কয়েকটি বিদ্যালয়। এ ব্যাপারে মুখ্য উদ্যোগী ছিলেন ইউরোপীয়গণ। শের বোর্ন

নামে এক ইউরোপীয় জোড়াসাঁকোতে একটি ইংরেজ বিদ্যালয় স্থাপন করেন—যেখানে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখের ইংরেজী অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। মতিলাল শীল নামক বাংলার এক মানবতাবাদীও এই ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এ সকল বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচী ছিল না তবে এর ব্যতিক্রম ঘটে ড্রুমেণ্ড স্থাপিত ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে।

ক্রমে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার শুরু হয়। পরবর্তীকালে বাংলায় ইংরেজী শিক্ষার নায়ক ডেভিড হেয়ার একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন (বর্তমানে হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত)। তার পর রামমোহন রায় ও রেভারেণ্ড ডাফ ইংরেজী শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন এবং স্কটিশ চার্চ কলেজে স্থাপন করেন। ইংরেজী শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজ পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পরিচিত হয়।

ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম সনদে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এই টাকা কিভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে ব্যয় করা হবে তা নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা চলে এবং কার্যতঃ এই ধোঁয়াটে অবস্থা প্রকৃত ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে নানারকম জটিলতা সৃষ্টি করে। অবশেষে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে সমস্ত জটিলতার অবসান ঘটে যখন ভারত সরকার প্রাপ্ত সীমাবদ্ধ সম্পদকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্যে ব্যায় করা হবে বলে স্থির হয়। এই প্রসঙ্গে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের আইন বিষয়ক সদস্য লর্ড মেকলের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় উত্থাপিত উক্তিটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মন্তব্য করেন যে ভারতীয় ভাষা সকল প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে উপযুক্তভাবে উন্নত নয় এবং প্রাচ্যশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। যদিও লর্ড মেকলের এই উক্তির দ্বারা অতীতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনে ভারতীয় কৃতিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে তথাপি এর সারবস্তু বিশ্লেষণে এটা প্রতিপন্ন হয় যে ইউরোপীয় শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বিশেষতঃ ভৌতবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় শিক্ষা অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। অবশ্য প্রসঙ্গতঃ মেকলে ভারতীয় শিক্ষার একদা উন্নত অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, দীর্ঘকাল বদ্ধতার ফলে তা পরিপূর্ণরূপে বাস্তববহির্ভূত হয়ে গেছে। তাই এই সময়ে প্রগতিশীল ভারতীয়গণ রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য নেতৃত্বে পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণের জন্যে যুক্তিপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে বিজ্ঞান ও গণতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হতে হলে এই মহান উদ্যোগই ছিল একমাত্র চাবিকাঠি। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত কুসংস্কার, ভীতি ও কর্তৃত্ববাদ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে সেই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে উত্তরোত্তর অগ্রসরের। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর এই পরিবেশে কোন বিশিষ্ট ভারতীয়ই এই চিন্তাধারার বাইরে যেতে পারেনি। ফলে ভারতীয়দের পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণের ব্যাকুলতা স্বাভাবতই আধুনিক চিন্তাধারায় অলঙ্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্যে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি শুরু হয়। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে এই পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের নিরলস

প্রয়াসের প্রাথমিক সার্থকতা আসে কলকাতার মেডিকেল কলেজ ও বোম্বাইয়ের এলফিসস্টোন ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে কাউন্সিল-অফ-এডুকেশন নাম একটি সংস্থা স্থাপিত হয়।

এইভাবে দেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার বিকাশের আবহাওয়া অনুকূল হলে এই নতুন সৃষ্ট উচ্চ শ্রেণীর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারের কাঠামো তৈরি হয়। তবে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচীর মধ্যে জনশিক্ষা প্রসারের উপযুক্ত পরিকল্পনা না থাকলে সামাজিক ভারসাম্যেরী মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সরকারী উদ্যোগে জনশিক্ষার প্রসারের তৎপরতার অভাব এই সময়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সরকারী ঔদাসীন্যের মূলে ছিল শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় অর্থের অপ্রতুলতা।

উপেরাক্ত শিক্ষাবিস্তারের স্তরবিন্যাস প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করলে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ভারত সচিবের শিক্ষাসংক্রান্ত সুপারিশ গ্রহণ করে ইংল্যাণ্ডে বোর্ড-অফ-কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্যে একটি পরিকল্পনা সুপারিশ করেন। মূলতঃ এই 'উড ডেসপ্যাচ' ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। শিক্ষাবিস্তারের জন্যে স্বতন্ত্র বিভাগ প্রেসিডেন্সি শহরগুলোতে (কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সরকারী শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নারী শিক্ষার প্রবর্তন অবশ্যই শিক্ষার ক্ষেত্রে নব উদ্যম দেখা দেয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম দুই ভারতীয় স্নাতকের অন্যতম ছিলেন।

এককথায় উড ডেসপ্যাচ ও খ্রীস্টান মিশনারীর স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আলেকজাণ্ডার ডাফের পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রসারের অক্লান্ত প্রয়াসে ভারতীয়গণ পাশ্চাত্যের প্রগতিমূলক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে ডাফের ন্যায় প্রতিভাশীল ব্যক্তিত্বের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ এই সময়কে 'ডাফের যুগ' বলা হয়।

ন্যায়সঙ্গত কারণে সরকারী সমর্থনের অভাব এবং সেইসঙ্গে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্দেশনামায় সরকারী চাকুরিতে দরখাস্তকারীগণকে ইংরেজীর জ্ঞান আবশ্যিক বলে অভিহিত করলে প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশঃ লুপ্ত হতে থাকে। এই

ইংরেজী শিক্ষা

নির্দেশনামার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলির প্রতি জনগণের উৎসাহের ফলে বহু সংখ্যক ছাত্র প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নতুন কর্মসূচী সত্ত্বেও নয়া প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় মূল ত্রুটিগুলো কালক্রমে দেখা দিল যেমন—জনশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য ভারতে জনসাক্ষরতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তনই হয়নি। ভারতীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষদানের ব্যাপারে অত্যধিক মনোনিবেশ জনশিক্ষা প্রসারে বন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এইভাবে শিক্ষিত সমাজ ও জনগণের মধ্যে একটা বিরাট ফারাক দেখা দেয়। উপরন্তু উচ্চশিক্ষা বহু ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় তাহা মূলতঃ ধনী শ্রেণীকেন্দ্রিক ও শহরভিত্তিক হয়ে ওঠে।

নারীশিক্ষা

নারীশিক্ষা প্রবর্তনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের অনুদান না থাকায় এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সঠিক সাফল্য সূচিত হয়নি। এর কারণ হিসেবে সরকারী বক্তব্যের সমর্থনে বলা হয় যে নারীশিক্ষা প্রসার করে শাসকশ্রেণী গোঁড়া ভারতীয়দের অনুভূতিকে আঘাত করতে চায়নি এবং নারীশিক্ষার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা ছিল না। (কারণ সরকারী ক্ষেত্রে মহিলা নিয়োগ বে-আইনি ছিল)। নারীশিক্ষার অগ্রগতির খতিয়ান এই সময় ছিল শতকরা দুইজন।

উপরন্তু সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অবহেলা দেখা যায়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র তিনটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং রুড়কিতে একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—যা কেবলমাত্র ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ানদের জন্যে উন্মুক্ত ছিল।

উপসংহারে এটা স্বীকার করতেই হবে যে সরকারী শিক্ষানীতির বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সীমাবদ্ধ আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ফলে ভারতে নতুন ভাবনাচিন্তার বিস্তৃতি ঘটে এবং আধুনিকীকরণের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনঃ বাংলা ও মহারাষ্ট্রের স্থান

(History of Social and Cultural Movement with special reference to Bengal and Maharashtra)

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতে এক নবজাগরণের সূচনা হয়। পাশ্চাত্য শক্তির সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভারতীয় সমাজের দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটল। চিন্তাশীল ভারতীয়গণ সামাজিক ত্রুটি নির্ণয়ের মাধ্যমে সেগুলি কিভাবে উচ্ছেদ করা যায়, চিন্তাভাবনা আরম্ভ করেন। এক্ষেত্রে ভারতীয়দের একটা বৃহৎ অংশ পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে কোনরূপ বোঝাপড়ায় আসতে অনীহা প্রকাশ করে এবং প্রচলিত ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংগঠনের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে রইল। অন্যান্যরা অবশ্য ক্রমশ উপলব্ধি করল যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারাই একমাত্র ভারতীয় সমাজের পূর্ণজীবন লাভ করার পক্ষে সহায়ক ও চাবিকাঠি। তারা সমসাময়িক আধুনিক বিকাশ, মানবতা ও চুক্তির ব্যাখ্যায় অভিভূত হয়ে ওঠে। উপরন্তু নয়া সামাজিক গোষ্ঠী যেমন পুঁজিপতি, শ্রমজীবী সম্প্রদায় এবং আধুনিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব স্বার্থের তাগিদে আধুনিককালের দাবি উত্থাপন করতে আরম্ভ করল।

এই জাগরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন আধুনিক ভারতের নেতা রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায় নিজের দেশের জনগণের সামাজিক, ধর্মীয়, মানসিক এবং রাজনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হলেন। তৎকালীন সমাজের গতিহীন ও দুর্নীতি-পরায়ণ অবস্থার জন্যে দায়ী বর্ণবৈষম্য প্রচলিত কুসংস্কারসমূহ যে সম্পূর্ণ দায়ী রামমোহন তা উপলব্ধি করেন। যদিও রামমোহন ঐতিহ্যশালী প্রাচ্যদর্শনে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি মনে করতেন একমাত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজকে পূর্ণ জীবন দান করতে পারে। সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও মর্যাদার উপলব্ধি এবং সে সঙ্গে আধুনিক ধনতন্ত্র ও শিল্পব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলেই এই আধুনিকতার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হবে বলে রামমোহনের বিশ্বাস ছিল।

রামমোহন ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার প্রকৃত সংযোজক। রামমোহন চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সত্যিকারের উৎকর্ষ বস্তুর আহরণ এবং এর প্রকৃত বিন্যাসই নব্য ভারত গঠনের কার্যকরী পথ।

এই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লব পাশ্চাত্য চিন্তাশীলতা ও যুক্তির দ্বারা সৃষ্ট পথে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজকে সুগঠিত করতে পারে বলে তদানীন্তন চিন্তাশীল নায়কগণ মনে করতেন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে কখনই বলপূর্বক চাপানোর ব্যবস্থায় এদের সায় ছিল না।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত সংস্থার মাধ্যমে হিন্দুধর্মকে কলুষমুক্ত করে প্রকৃত আস্তিকতার চিন্তা প্রচার করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ মানুষের মর্যাদাকে স্বীকৃতিদানপূর্বক পৌত্তলিকতাবাদের বিরোধিতা করেছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাবধারার সার বস্তুকে নিয়ে উন্মুক্ত ও প্রসারিত চিন্তা-ধারার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজকে ঢেলে সাজানোর জন্যে রামমোহন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। তার উদাহরণ স্বরূপ সতীদাহ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার প্রতিবাদ।

রাজা রামমোহন রায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি স্তরে যে আলোড়নের সূচনা হয় তাকেই আগামী দিনে ভারতীয় জাতীয় জীবনে নবদিগন্তের পথিকৃৎ বলে গণ্য করা হয়। নারীজাতির সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে তাদের সমানাধিকারের দাবি উত্থাপিত হয় এবং রাজা রামমোহন রায় এই দাবির সমর্থনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। উনবিংশ শতকের চল্লিশের দশকে রামমোহনের নারীশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টার প্রথম সুযোগ হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বেথুন স্কুলের স্থাপনার দ্বারা।

আধুনিক শিক্ষা প্রসারের দ্বারাই নতুন ভাবনাচিন্তার ক্রমবিকাশ সম্ভব, এই সত্য উপলব্ধি করা এবং সেই সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাকে জীবনমুখী করে তোলার জন্যে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি, এ সময় নব উদ্যমে প্রতিভাত হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ারের ভারতে আগমন এবং রামমোহনের সক্রিয় সহযোগিতায় আধুনিক শিক্ষা প্রসারের জন্যে ভারতে সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত হিন্দু কলেজ। এই সঙ্গে নয়া কারিগরী

শিক্ষা ও দার্শনিক ভল্‌টেয়ারের চিন্তাধারাকে প্রচার করে সুসংহত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বেদান্ত কলেজ স্থাপন করে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও পাশ্চাত্য সামাজিক শিক্ষা ও ভৌতবিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের যুগ্ম প্রয়াস চালানো হয়।

এই সময় বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ঘটিয়ে বাস্তবমুখী সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে শুরু হয় এক বুদ্ধিদীপ্ত আন্দোলন। জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ার প্রয়োজনীয় হাতিয়ার সৃষ্টির দ্বারা স্বাধীন ও পুনর্জীবিত ভারত গঠনের মন্ত্র এই সময়ে ভারতবাসীকে নতুন প্রেরণা যোগায়।

নবজাগৃতি ও রামমোহন

রামমোহন ভারতীয় ধর্মের ও সমাজের কুসংস্কার সমূহকে উৎপাটিত করে বহুধাবিভক্ত ভারতীয় সমাজের মধ্যে এক ঐক্যের চেতনা গড়ে তোলেন। জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তিনি ভারতীয় সমাজে অনৈক্যের উপাদানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দীপ্ত আহ্বান জানান। আর তিনি ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে উৎকর্ষতা আনার চেষ্টা করেন।

ভারতীয় মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্রের জনক রামমোহন বিভিন্ন আধুনিক সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রতি জনগণকে আকর্ষণ করে তাদের দাবিগুলি সরকারের কাছে প্রতিফলিত করার সোপান রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সাংবাদিকতার অবদান রেখে গেছেন হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ছটি ইংরেজী সংবাদপত্র যেমন, ইণ্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, হরকরা প্রভৃতি। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল হরকরা, সমসাময়িকভাবে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত মাদ্রাজ কুরিয়ার আর ইণ্ডিয়া হেরাল্ড, বোম্বাই থেকে প্রকাশিত বোম্বাই হেরাল্ড প্রভৃতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়া রিফরমার' এবং হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত পার্থেনন ও হিন্দু পাইওনিয়ার প্রভৃতি পত্রিকাগুলো নব্য বাংলার প্রগতিপন্থীদের মুখপত্র হিসাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানা প্রগতিশীল মতামত প্রচারিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বাংলার নবজাগ্রত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরে।

জাতীয়তাবাদী আদর্শকে উপযুক্ত প্রচার মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছে দেবার ফলে দেশব্যাপী নতুন আলোড়ন দেশীয় সমাজব্যবস্থা ও ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে নতুন আলোর সন্ধান লাভ করে। প্রাচ্যের মহান আদর্শ প্রতিফলিত হওয়ায় এবং সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীন মতামত জ্ঞাপনের প্রয়াসের ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। বিদেশী শাসক তা কিছুতেই বরদাস্ত করতে না পেরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্র-বিধি জারী করে। তার বিরুদ্ধে রামমোহন প্রমুখ কলকাতার পাঁচজন মনীষী আদালতে স্মারকপত্র দেন। ফলে শুরু হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক যুগান্তকারী অধ্যায়। ঐতিহাসিক মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক অধিকার লাভের এক মহান আন্দোলন বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে নয়া-সৃষ্ট জমিদারগণের কৃষকদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রামমোহন সোচ্চার হন এবং কৃষকদের স্বার্থকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করার দাবি জানান। ভূমি ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতীয় সমাজের মেরুদণ্ড কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে উপযুক্ত মর্যাদাদানের জন্যে রামমোহন নিরলস প্রচেষ্টা চালান। তাঁকে ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বলে অভিহিত করা হয়।

উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয়করণের শাসনতান্ত্রিক ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারের মাধ্যমে ভারতীয়গণের সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি করার উদ্যোগকে কার্যকরী করে সমাজব্যবস্থাকে আধুনিক ভাবধারায় গড়ে তোলার এক মহান যজ্ঞ রামমোহন আরম্ভ করেন।

ইতিমধ্যে ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার মধ্যে নতুন এক প্রেরণার ঢেউ আনেন হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত ইয়ং-বেঙ্গল আন্দোলন প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রয়াসে অবতীর্ণ হয়ে সমাজসংস্কারের তাগিদ সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে ডিরোজিও ও তাঁর সহকর্মীগণের আদর্শ ছিল রামমোহন রায়ের ভাবধারারই উত্তরসূরী।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সামাজিক সংস্কারের বৈপ্লবিক চেতনায় নতুন উন্মেষণার সৃষ্টি করে এবং ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে দেখা দেয় কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে জেহাদ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উনবিংশ শতকের ভারতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদ—বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মুক্ত সহযোগিতার আদর্শ। তাই এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রামমোহন ছিলেন এই আদর্শের পুরোহিত

এবং আধুনিক যুগের গুরু। তিনি ছিলেন এই পথের মূল প্রবক্তা। এই সময়ে ভারতের মনীষীগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানবসভ্যতার মৌলিক আদর্শ সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের চিন্তা ও কর্মের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর মুখ্যতঃ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এই চিন্তাধারার মূল নায়ক রামমোহন আন্তর্জাতিক ঘঁটনাবলীর প্রতি পরিপূর্ণ সজাগ থেকে বিশ্বে জাতীয়তাবোধ, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শকে সমর্থন করেন। তাই ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর পিপলস্-এর বিদ্রোহের ব্যর্থতা যেমন তাঁর মনে আঘাত হেনেছিল তেমনি তিনি স্পেনীয় আমেরিকার বিপ্লবের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেন। আইরিশ জনগণের উপর জমিদার শ্রেণীর অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। রামমোহনকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতীয় নভমণ্ডলে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় রামমোহনের চিন্তা ও আদর্শকে গতিশীল করার জন্যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যে এই সভা বাংলার তথা ভারতীয় বুদ্ধি-জীবিদের মধ্যে যুক্তিবাদের প্রবণতা সৃষ্টি করে এবং সামাজিক সংস্কার যেমন বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহু বিবাহ প্রথা রদ, নারীশিক্ষার প্রসারণ এবং কৃষক ও কৃষিশ্রমিকের সার্বিক অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সক্রিয় সমর্থনে এগিয়ে আসে।

পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতিক্রিয়া বাংলার পূর্বেই পশ্চিম-ভারতকে স্পর্শ করেছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কার্যকরী রূপে পশ্চিম-ভারত ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে পরমহংসমণ্ডলী স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতাগণ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল না। এরা বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধের স্মারক হিসেবে সভাসমিতিতে বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা রাঁধা খাবার পরিবেশিত করতেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন শিক্ষিত যুবকের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ছাত্রদের সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সমিতি (Students Literary and Scientific Society)। সমিতি গুজরাটী ও মারাঠী ধ্যান প্রসারকমণ্ডলী নামক দুটো অংশে বিভক্ত ছিল। এই সমিতি জনবিজ্ঞান ও সামাজিক প্রশ্নাবলী সংক্রান্ত আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করত। তাছাড়া সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে জোতিবা ফুলে এবং তাঁর স্ত্রীর পরিচালনাধীনে পুনা ও সন্নিহিত অঞ্চলে ছাত্রীদের জন্যে কয়েকটি বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে জগন্নাথশঙ্কর শেঠ ও ভৌদাজি অন্যতম। উপরন্তু জোতিবা ফুলে মহারাষ্ট্রে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিত বিধবা পুনর্বিবাহ সঙ্ঘ (Widow Remarriage Association) গঠন করেন। এই আন্দোলনের আর এক নায়ক কারসন-দাস মূলজী ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটী ভাষায় প্রকাশিত 'সত্য প্রকাশ' পত্রিকার মাধ্যমে বিধবা বিবাহের সমর্থনে লেখনী ধারণ একটি প্রকাশিত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়।

পশ্চিম ভারতে জাগরণ

ভারতে মহারাষ্ট্রে নতুন শিক্ষাপ্রসার এবং সমাজসংস্কারের ইতিহাসে অন্য একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম গোপালহরি দেশমুখ। তিনি লোকহিতবাদী নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি যুক্তিবাদী, আদর্শ, আধুনিক মানবতার মন্ত্রে ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবধারায় নতুন ভাবে ভারতবর্ষকে সংগঠিত করার প্রবর্তক ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সমাজ সংস্কারকগণ অব্রাহ্মণ এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের অস্পৃশ্যতার কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সামাজিক ভারসাম্য আনয়নে সচেষ্ট ছিলেন।

বোম্বাইয়ের আরেক বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক দাদাভাই নওরোজী জরথিস্ট্র ধর্ম ও পারসিক আইনের সংস্কার সমাধানের দ্বারা সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

তাছাড়া আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ হিন্দী বলয়ের সমাজ সংস্কারগণ গণমুখী সাহিত্য রচনা করে ও সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করেন।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

কৃষক বিদ্রোহ—ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন

Peasant Rebellions—Wahabi and Ferazi Movement

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অসন্তোষ যেমন প্রবল ছিল মুসলমানদের মধ্যেও ইংরেজদের আচরণে চরম প্রতিকূলতার প্রভাবে মুসলমান সমাজেও সমপরিমাণ অসন্তোষ দেখা দেয়। বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া দুভাবে প্রকাশ পায়। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে একশ্রেণীর মুসলমান নেতৃত্ব শুদ্ধ ও কলুষতা থেকে মুক্ত ইসলামের প্রকৃত আদর্শের ভিত্তিতে মুসলমান সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা চিন্তা করেন এবং তাঁরা ইংরেজদের বল প্রয়োগের দ্বারা ভারত থেকে হটাবার পক্ষপাতী ছিলেন। এই আন্দোলনই মুখ্যতঃ 'ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ওয়াহাবি আন্দোলন ইসলামের শুদ্ধির জন্যে শুরু হয়। এই আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা দিল্লীর বিখ্যাত মুসলমান সন্ত শাহ-ওয়ালিউল্লাহ। তাঁর মূল লক্ষ্যই ছিল অনাচারে পরিবেষ্টিত ভারতীয় মুসলমান সমাজকে মুক্ত করে ইসলামকে পরিশুদ্ধ করা। তিনি ও তাঁর পুত্র আজিজ ইসলাম ধর্মের অনাচার দূর করার জন্যে পবিত্র কোরানের উর্দু অনুবাদ করেন। এই আদর্শের অনুসরণে এগিয়ে আসেন উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলীর অধিবাসী সৈয়দ আহমদ। সৈয়দ আহমদ যুদ্ধ যাত্রায় মক্কায় গেলে সেখানে তিনি আবদুল ওয়াহাবির প্রবর্তিত আরবীয় ওয়াহাবি আন্দোলনের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ভারতের মাটিতে সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টায় আরবদেশের ওয়াহাবি আন্দোলনের অনুরূপ ইসলাম শুদ্ধি আন্দোলন গঠন করেন। এই আন্দোলন ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত।

ওয়াহাবি আন্দোলন

সৈয়দ আহমদকেই ভারতীয় ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত জনক বলে আখ্যা দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্তরে আন্দোলনের লক্ষ্য কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মের সংস্কারের জন্যে হলেও পরবর্তীকালে সৈয়দ আহমদ ও তাঁর অনুগামীদের প্রচেষ্টায় তা রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। ধর্মীয় সংস্কারের বাণী মুসলমানদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং বহুসংখ্যক মানুষ এই সংস্কার-আন্দোলনে সামিল হন। ক্রমশঃ ওয়াহাবি মতবাদের জনপ্রিয়তা দারুণভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজনবোধে সৈয়দ আহমদ চারজন খলিফা নিযুক্ত করে সংগঠনকে বৃহত্তর পরিধিতে পরিচালিত করার কাজ আরম্ভ করেন।

সৈয়দ আহমদ

ওয়াহাবি তথা সৈয়দ আহমদ প্রবর্তিত এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে একটি ইসলামের পবিত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং ইসলাম-বিরোধী

ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়ন করা। এই মতবাদে বিধর্মী ইংরেজ শাসনকে ইসলামের বড় শত্রু বলে আখ্যা দিয়ে ইংরেজদের কবলে ইসলামকে বিপন্ন বলে প্রচার করা হয়। এই ইংরেজী শাসনকে ধ্বংস করে ভারতকে রক্ষা করার জন্যে মুসলমান সমাজের প্রতি তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান। বণিক ইংরেজ-শক্তির লুণ্ঠননীতির ফলে সমস্ত দেশ পঙ্গু হতে চলেছে, তাই ইংরেজদের তাড়াতে না পারলে ভারতের রক্ষা নেই বলে সৈয়দ আহমদ তাঁর অনুগামীদের বোঝাতে আরম্ভ করেন।

সৈয়দ আহমদের ভাবধারা

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ওয়াহাবি কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবলতা বৃদ্ধি পায়। সৈয়দ আহমদ ওয়াহাবি আন্দোলনের পেছনে জনসমর্থন আদায়ের জন্যে মারাঠা ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতি আহ্বান জানান। মুসলমান যুবকদের ওয়াহাবি সেনাদলে যোগদানের ডাক দিয়ে তিনি ইউরোপীয় কায়দায় যুদ্ধকৌশল শেখানোর ব্যবস্থা করেন। সর্বস্তরের মানুষকে তিনি ওয়াহাবি তহবিলে অর্থদানের জন্যে আবেদন করেন। ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলকে সৈয়দ আহমদ শত্রুর দেশ বলে মনে করতেন এবং মুসলমান জনগণকে অ-মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণার জন্যে উত্তেজিত করেন।

ওয়াহাবি সাংগঠনিক কাঠামো

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবি সেনাবাহিনী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের ওয়াহাবি সামরিক ঘাঁটিকে শক্তিশালী করে তুলে প্রতিবেশী শিখ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শিখশক্তির বিরুদ্ধে এই লড়াই ওয়াহাবির ধর্মযুদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ নিহত হন ও ওয়াহাবিরা পরাজিত হয়।

শিখদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবিদের যুদ্ধ

সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামী খলিফা বিলায়েত ও এনায়েত আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে ওয়াহাবি আন্দোলন পরিচালিত হয়। পাঞ্জাব রাজ্যে ইংরেজদের শাসন কায়েম হলে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব থেকে ইংরেজ বাহিনীর সুপরিকল্পিত আক্রমণে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ওয়াহাবি কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয় এবং ওয়াহাবি আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

ইংরেজ ওয়াহাবি সংঘর্ষ

সৈয়দ আহমদের আদর্শে বিশ্বাসী তিতুমীর বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিতুমীর প্রথমেই সরাসরি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ না হলেও জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামে সন্ত্রস্ত ইংরেজগণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়ে হস্তক্ষেপ করে। হিন্দু মুসলমান কৃষকদের তিনি জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে অস্ত্রধারণে উদ্বুদ্ধ করেন। তিতুমীর চব্বিশ পরগণার নারকেলবেড়িয়াতে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে সর্বপ্রথম পুঁড়াগ্রামের অত্যাচারী জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। স্থানীয় সাধারণ ইংরেজগণ জমিদারের পক্ষে অংশ নেওয়ায় ক্রমেই তিতুমীর ইংরেজ-বিরোধী হয়ে ওঠেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পুঁড়াগ্রাম অভিযানে সার্থকতা লাভ করেন। ক্রমশঃ এই ওয়াহাবি আদর্শে অনুপ্রাণিত আন্দোলন রাজমহল, রাজসাহী, মালদহ, নদীয়া, বারাসাত ও

বাংলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবি আন্দোলন

সুদূর ঢাকা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হয়। বাংলায় ওয়াহাবিদের সঙ্গে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। অবশেষে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে শেষ লড়াইয়ে তিতুমীর নিহত হন।

ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ওয়াহাবি আন্দোলন ক্রমশঃ রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। কয়েকটি অঞ্চলে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শ্রেণীসংঘাত দেখা দেয়। দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্যে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক স্মিথ এই আন্দোলনকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শ্রেণীসংগ্রামের আন্দোলন বলে অভিহিত করেন। বাস্তবক্ষেত্রে ওয়াহাবি আন্দোলন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ওয়াহাবিগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে ধর্মসংস্কারগুলির পেছনে জনসমর্থন আদায়ের জন্যে অবশ্যই তাঁদের গ্রাম-কেন্দ্রিক ভারতবর্ষের গ্রাম্য অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এই আন্দোলন মূলতঃ ইসলাম-শুদ্ধিকরণ হলেও অন্যধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়নি। বিপথগামী ও ভণ্ড মুসলমানদের বিরুদ্ধেও সৈয়দ আহমদকে যুদ্ধ করতে হয়। ঐতিহাসিক তোয়ামউদ্দিন আহমদ ওয়াহাবি আন্দোলনকে ইংরেজবিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃতি

ওয়াহাবি আন্দোলনকে হাণ্টার প্রমুখ সমলোচকগণ সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করলেও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই ওয়াহাবি আন্দোলনের পেছনে বহু হিন্দুর সহানুভূতি ছিল বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বোম্বাই-এ ওয়াহাবিদের বৈঠকে বহু হিন্দু যোগদান করে। দৌলতরাও সিন্ধিয়ার আত্মীয়ও ওয়াহাবি আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এই ওয়াহাবি আন্দোলনের ভারত-ব্যাপী সংগঠন থাকা সত্ত্বেও একে জাতীয় আন্দোলন বলে অভিহিত করেননি। তিনি বলেন যে ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইসলামী শাসন প্রবর্তন। হিন্দু-মুসলমানের সম-অধিকারের আদর্শে এই আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ঐতিহাসিক ডঃ কুয়েমউদ্দিন এই মতবাদের বিরোধিতা করেছেন। তবে ওয়াহাবি আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ্য যাই হোক না কেন, এর দ্বারা ভারতে মুসলমানগণের মধ্যে একটা স্বতন্ত্রতা বা বিচ্ছিন্নতার প্রভাব দেখা দেয়। ভারতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের সূচনা হয়। ভারতে ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক প্রভাব বেড়ে যায়। মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বেশিটাই চলে আসে মোল্লাদের হাতে। এর কিছু প্রতিফলন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের মধ্যে দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমান আচার-আচরণ ও মতাদর্শের যে-সংমিশ্রণ বহুদিন ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে চলে আসছিল তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয় এই ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাবে। প্রকৃতপক্ষে ওয়াহাবী আন্দোলনের সামরিক পরিচালন পদ্ধতিতে ত্রুটি ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল। তবে ব্যর্থতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল সাধারণভাবে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের এই আন্দোলনের প্রতি বিরোধী মনোভাব।

প্রায় একশতবর্ষ ব্যাপী (১৮১৮ খ্রীঃ—১৯০৬ খ্রীঃ) বাংলায় মৌলভী হাজি শরিয়ত উল্লাহ-র নেতৃত্বে যে গণআন্দোলন পরিচালিত হয় তা ফরাজি আন্দোলন নামে পরিচিত। 'ফরাজি' শব্দটির অর্থ হল ইসলামের পবিত্র আদর্শে বিশ্বাস। শরিয়ত উল্লাহ কোরানের আদর্শানুযায়ী ইসলামের শুদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেন। পরবর্তীকালে তিনি ওয়াহাবি আদর্শে প্রভাবিত হন। তিনি একটি অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচার করেন এবং তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইংরেজ সমর্থনপুষ্ট জমিদারগণের দরিদ্র কৃষকদের রক্ত শোষণের উল্লেখ করেন। বাংলার অধিকাংশ চাষীই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় হাজি শরিয়ত উল্লাহের ব্যাখ্যায় প্রভাবিত হয় এবং তিনি বেকার তাঁতি ও কারিগরগণের নেতৃত্বও দেন। হিন্দু কৃষকগণও শরিয়ত উল্লাহের ডাকে প্রভাবিত হয়।

শরিয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পর দুধু মিঞা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়কে জমিদার ও নীলকগণের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। তিনি পূর্ববাংলাকে কয়েকটি হল্কা বা অঞ্চলে ভাগ করেন। প্রত্যেক অঞ্চলে একজন খলিফা নিযুক্ত করে দুধু মিঞার আদর্শ প্রচার ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। দুধু মিঞার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন পূর্ববাংলার ফরিদপুর ও তার সন্নিহিত কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। দুধু মিঞা জমিদার ও বিচারকগণের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন জোরদার করেন এবং কাছারিতলা লুঠ করেন। ইংরেজরা জমিদার ও নীলকরগণের চাপে দুধু মিঞাকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তার করেন এবং মুক্তিলাভের পর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

দুধু মিঞার মৃত্যুর পর পুত্র নোয়া মিঞার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন কিছুকাল চলেছিল। পরে নোয়া মিঞা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী বাদ দিয়ে ধর্ম সংস্কারের পথ গ্রহণ করে। ফলে কৃষক আন্দোলন-কেন্দ্রিক ফরাজি আন্দোলনের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিক হাণ্টারের মতে, ফরাজি আন্দোলন একটি শ্রেণীসংগ্রাম। তিনি একে "লাল প্রজাতন্ত্রী" (Red Republican) বা সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রী আন্দোলন বলে অভিহিত করেন। ডঃ শশীভূষণ চৌধুরী এই আন্দোলনের শেষ পর্বকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ লেখকগণ একে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনরূপে আখ্যা দেন এবং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতার অভিযোগ আনেন।

এই আন্দোলন একেবারে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত ছিল এটা বলা যায় না। কারণ, এই আন্দোলনের শুরু হয়েছিল সাম্প্রদায়িক ঘটনার দ্বারাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আদিবাসী বিদ্রোহ
(Tribal Movements)

ইংরেজ শাসনের জনবিরোধী প্রশাসনিক নীতি ও সেই স্বার্থে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে ভারতের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ অসন্তোষের দানা বেঁধে ওঠে। ভারতের স্বাধীনতাকামী মানুষ শোষণমূলক ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধে অবিরাম বিদ্রোহ করে এবং তারা ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহগুলো ক্রমশঃ বিপ্লবের আকার ধারণ করে। এই চরম পরিণতি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ। এই জাগরণকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ বলে গণ্য করা হয়। মূলতঃ এই আন্দোলনকে

কোল বিদ্রোহ

কেন্দ্র করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে। বর্তমান বিহারের সিংভূম অঞ্চলে প্রাচীন আদিবাসী কোলেরা অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণের ন্যায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে কোলবিদ্রোহ তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষারই প্রাণপণ চেষ্টার বহিঃপ্রকাশ। সিংভূমের কোল আদিবাসী রাজা তাঁর রাজ্যে ইংরেজ অনুপ্রবেশকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেন। তাছাড়া খাজনা আদায়ের জন্যে ইংরেজগণ বহিরাগত কর্মচারী নিয়োগ করলে কোলরা অসন্তোষে জ্বলে ওঠে। এই আন্দোলন রাঁচী-হাজারিবাগ অঞ্চলে প্রায় চার হাজার বর্গমাইল অঞ্চলে ব্যাপ্ত হলে বিদ্রোহের দাবানল দমনের জন্যে ইংরেজগণ বিরাট সেনাবাহিনী নিয়োগ করে। বিদ্রোহীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। অকথ্য অত্যাচারের মাধ্যমে সাময়িকভাবে বিদ্রোহ দমন করল। সিংভূমের রাজাও ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। ফলে বহুদিন যাবৎ এই অঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন ছিল। এই বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই ভূমিজগণ বিদ্রোহ করে এবং সরকারী কাছারিবাড়ি ও পুলিশঘাঁটি জ্বালিয়ে দেয়।

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভুম, মানভূম, ছোটনাগপুর ও পালামৌ অঞ্চল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদারগণ অধিকৃত-জমির ওপর কর চাপানোর ফলে সাঁওতালগণই প্রথম শ্রেণীর আবাদী জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং তাঁরা রাজমহল-মুর্শিদাবাদ এলাকার জঙ্গল কেটে বস্তি গড়ে তোলে। এবং

সাঁওতাল বিদ্রোহ

এই জমিতে কৃষিকাজ শুরু করে। এই অঞ্চলকে সাঁওতালগণ দামান-ই-কোহ বা মুক্ত অঞ্চল নাম দেয়। কিন্তু জমিতে নিজ পরিশ্রমে সর্বপ্রথম ফসল উৎপাদনকারীরাই জমির অধিকারী—সাঁওতালদের এই ন্যায় নীতিকে ইংরেজগণ তোয়াক্কা না করে ব্রিটিশ কালেক্টর ও জঙ্গল বিভাগের কর্তাদের নির্দেশে সাঁওতালদের সৃষ্ট এই জমিগুলিকে ইংরেজ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আওতায় আনে এবং এগুলোর ওপর বাড়তি কর চাপায়। জমিদারগণ ইংরেজদের এই শোষণ নীতির সমর্থনে এগিয়ে আসে।

মহাজন শ্রেণীর লোকজন সাঁওতালদের জমি গ্রাস করতে আরম্ভ করে। অর্থাভাবে সাঁওতালগণ মহাজনের কাছে ঋণ নেয়। কথিত আছে এই ঋণের ওপর সুদের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত। ঋণ পরিশোধে সাঁওতালগণ অসমর্থ হলে জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ময়রা বা মিষ্টান্ন বিক্রেতা,

ছাপরা ও সাহাবাদ থেকে আগত ভোজপুরী ও ভাটিয়া সম্প্রদায় ও বাঙ্গালি জমিদারগণ সাঁওতালদের গ্রামে এসে ক্রমান্বয়ে শোষণ চালায়। এই সময় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণও সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস চালায়। অনেক ক্ষেত্রে সাঁওতাল নারীদের ওপর অসম্মান দেখানো হত। ফলে সাঁওতালবিদ্রোহ মহাজন, জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

সিধু

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিধু ও কানহু নামক দুই সাঁওতাল ভাইয়ের অধীনে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল একত্রিত হয়ে ঐ অঞ্চল দখল করে নিজেদের সরকার গঠনের প্রস্তাব ঘোষণা করে। এইভাবে সাঁওতালবিদ্রোহ দেখা দেয় এবং অবাধ লুঠতরাজ শুরু হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে সমবেত সাঁওতালগণ ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যে ডাক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সমগ্র অঞ্চল সাঁওতালদের দখলে চলে যায়। এই সময় সাঁওতালগণ নিজেদের সুবা বা রাজত্বের কথা ঘোষণা করে।

সাঁওতালবিদ্রোহ কার্যতঃ সশস্ত্র বিপ্লবের আকার ধারণ করে ব্রিটিশ শাসনকে বিপন্ন করে তোলে। ডঃ নটরাজনের মতে এটাই এদেশে প্রথম কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম। কথিত আছে প্রায় ত্রিশ হাজার সাঁওতাল হত্যা করে ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালবিদ্রোহ দমন করে। এই সাঁওতালবিদ্রোহের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বীর সিং, কালো প্রামাণিক ও ডোমন মাঝি। শেষের দিকে অ-সাঁওতালগণও এই বিদ্রোহে যোগ দেয়।

সাঁওতালবিদ্রোহকে ইংরেজগণ খুব হাল্কা ভাবে নেয়নি। সাঁওতালদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র সাঁওতাল পরগণা জেলা গঠিত হয়। সাঁওতাল-অধ্যুষিত গ্রামগুলোকে অন্য জেলার সঙ্গে যুক্ত করার নীতিও সরকারকে ত্যাগ করতে হয়।

পরোক্ষ ফল

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতালবিদ্রোহ প্রমাণ করে যে নিরস্ত্র কৃষকসম্প্রদায় প্রয়োজনে সরকারী শোষণ নীতিকে প্রতিরোধ করতে পারে। তাছাড়া ইংরেজগণ এই অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সাঁওতালবিদ্রোহের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরবর্তীকালে নীলচাষীদের বিদ্রোহ ও পুনায় মারাঠা কৃষকদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সাঁওতাল বিদ্রোহ চলেছিল। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাস এই সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৭

(Revolt of 1857)

দশম অধ্যায়

বিদ্রোহের কারণসমূহ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ঐতিহাসিক গণবিদ্রোহ উত্তর ও মধ্যভারতে প্রবলাকারে দেখা দেয় এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রায় উচ্ছেদের মুখে এসে দাঁড়ায়। প্রাথমিক স্তরে এই বিদ্রোহ ভারতীয় সিপাহী বা সৈন্যদের মধ্যে দেখা দিলেও অনতিকালেই তা বিস্তৃত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অগণিত কৃষক, শ্রমিক এবং সৈন্যগণ সাহস ও ত্যাগের মাধ্যমে বীরত্বের সঙ্গে এক বছরেরও বেশি সময় লড়াই করে ভারতীয় জনগণের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের অবতারণা করে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের পেছনে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ অপেক্ষাও নানাবিধ কারণের সমন্বয় হয়েছিল। বাস্তবে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের স্তূপীকৃত অভিযোগ এবং বিদেশী শাসনের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সংমিশ্রণে এই বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে তিলে তিলে ভারতের ওপর ব্রিটিশ জয়যাত্রা ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মনে বিদেশী শাসন সম্পর্কে অসন্তোষ ও বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। স্বভাবতই কালক্রমে এই সর্বাঙ্গীণ অসন্তোষ প্রচণ্ড বিপ্লবের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

সম্ভবতঃ এই গণ-অসন্তোষের প্রধান কারণ ছিল দেশব্যাপী ব্রিটিশদের অবিরাম অর্থনৈতিক শোষণের নীতি এবং ভারতের প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোর ব্যাপক ধ্বংস। কৃষক, শ্রমজীবী, হস্তশিল্পী ও বহু সংখ্যক জমিদার ও প্রধানদের ক্রমশঃ দরিদ্র থেকে দরিদ্র করে তুলেছিল। অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ, সাধারণভাবে ভূমি ও ভূমিরাজস্ব নীতি ও আইন এবং শাসন-ব্যবস্থার কুফল নানা সময়ে ভারতীয় জনগণের মধ্যে তীব্র আকারের অসন্তোষ এই বিদ্রোহের দাবানলকে প্রজ্বলিত করে। বিরাট সংখ্যক কৃষকগণ তাদের জমির মালিকানাস্বত্ব অর্থলগ্নীকারকদের হাতে দেনার দায়ে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। সাধারণ মানুষ শাসনযন্ত্রের সর্বস্তরে দুর্নীতির ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে উইলিয়ম এডওয়ার্ড নামক এক ব্রিটিশ সরকারী মুখপাত্র ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এক রিপোর্টে এই বিপ্লবের কারণ উল্লেখপর্বে বলেন, জনগণের উপর অকথ্য অত্যাচার এবং বলপূর্বক চাপানো ব্যবস্থাদি পুলিসবাহিনীর চাবুক কশার মতো অবস্থার সৃষ্টি করে। সরকারের প্রতি অসন্তোষের বহ্নি ছড়ানো হয়। বিচারবিভাগীয় নীতিগুলোও ধনীদের প্রকৃতপক্ষে গরিবদের ওপর অত্যাচারের অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। দারিদ্র্যের কোপে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগণ নৈরাশ্যের কবলে মরিয়া হয়ে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে তাঁদের অবস্থার পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।

অর্থনৈতিক কারণ

কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থা

ভারতীয় উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তগণ বিশেষ করে উত্তর-ভারতে দেশীয় শাসকদের শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছল বেতনভোগীগণ বিতাড়িত হয় এবং ক্রমশঃ ভারতীয় রাজ্যগুলির বিলুপ্তি ঘটে। বেসরকারী অভিজাতদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায় ও উল্লিখিত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন রাজ্যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত পদ থেকে চ্যুত হওয়ায় তাদের জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই অবস্থা সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের ইন্ধন বেড়ে যায়।

ভারতীয়গণের জীবিকা-নির্বাহে বাধা

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমিক অধঃপতন, অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন ভারতীয় নৃপতিগণের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা বহু শ্রেণীর মানুষের রুজি-রোজগার ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। স্বভাবতই এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকদের অন্তর্ধান এবং এই শ্রেণীভুক্ত মানুষের সাহায্যহীনতায় সাধারণ মানুষের মধ্যে দারিদ্রের ছাপ প্রকট হয়ে ওঠে। এছাড়া ধর্মগুরু, পণ্ডিত ও মৌলবীগণ তাঁদের ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক মনে করে বিদেশী শাসনের প্রতি বিদ্বেষের বীজ ছড়াতে আরম্ভ করে।

ভারতীয়দের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি জনগণের ঘৃণা ও বিদ্বেষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এই শাসনে মূলতঃ বিদেশী মনোভাবাপন্ন ভাবধারার প্রকটতা। ব্রিটিশগণকে ভারতীয়গণ চিরদিনই বিদেশী বলেই গণ্য করেছে। ফলে ভারতীয়দের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কখনই তাঁদের সামাজিক যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নি। পূর্বসূরী বিদেশী বিজয়ীগণের মতো কোনদিনই ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁদের সামাজিক সংযোগ স্থাপিত হয়নি—এমনকি উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়দের সঙ্গেও নয়। পরিবর্তে তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠে জাতিগত উৎকর্ষতার গর্ব এবং ভারতীয়দের প্রতি এক ঘৃণ্য ও ঔদ্ধত্য দেখানোর মনোবৃত্তি। বেশির ভাগ ব্রিটিশগণ এদেশে বসবাসের অপেক্ষা সম্পদ আহরণেই আগ্রহী ছিলেন এবং কার্যসিদ্ধির পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতেন। ফলে ভারতীয়গণ কখনই তাঁদের হিতকারীরূপে দেখেনি, বরঞ্চ ব্রিটিশদের সন্দেহের চোখেই দেখত। ভারতীয়গণের মধ্যে বহুদিন যাবৎ ঐ সকল কারণের জন্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছিল যা এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। দিল্লীর মুন্সী মোহনলাল নামক এক ব্যক্তি যিনি এই বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশদের অনুগত ছিলেন পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন যে যারা ব্রিটিশ আনুকূল্যে ধনী হয়েছিল তাঁরাও তলে তলে ব্রিটিশ বিপর্যয়ে আনন্দিত হয়েছিল। আরেকজন ব্রিটিশ অনুগত মুইনউদ্দিন হাসান খাঁ বলেছেন যে জনগণ ব্রিটিশদিগকে আইন-অমান্যকারী বিদেশী হিসেবে দেখত।

জনগণের এই ধূমায়িত অসন্তোষ সমসাময়িককালের কিছু ঘটনাবলী ব্রিটিশ বাহিনী ও অস্ত্রের দুর্ধর্ষতা সম্পর্কে জনগণের সাধারণ বিশ্বাস নষ্ট করে দেয় এবং ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের দিন ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে বলে বিশ্বাসে ভারতীয়গণ উদ্বুদ্ধ হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে প্রথম আফগান যুদ্ধে (১৮৩৮-৪২), পাঞ্জাবের যুদ্ধসমূহ (১৮৪৫-৪৯), ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫০-৫৬) ব্রিটিশবাহিনীর বিপর্যয়ে ভারতীয়দের মনে পূর্বোক্ত ধারণা আরও দৃঢ় হতে থাকে। তাছাড়া ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারে সাঁওতাল গণের বিদ্রোহ এবং ব্রিটিশদের সাময়িকভাবে

এই গণ-অভ্যুত্থানের ফলে সাঁওতালদের এলাকা থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত জনগণের মধ্যে গণ-অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যদিও শেষপর্যন্ত ব্রিটিশগণ সাঁওতালবিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয় তথাপি ব্রিটিশবাহিনীর অজেয় আখ্যা তাদের প্রাথমিক বিপর্যয়ের জন্যে অনেকখানি ম্লান হয়। ভারতীয়গণ উপলব্ধি করল যে এশীয় বাহিনীর দৃঢ়তার কাছে ব্রিটিশ বাহিনী মোকাবিলায় অবশ্যই ব্যর্থ হল।

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের স্বল্পকালীন ও প্রাথমিক বিপর্যয়ের ফলে ব্রিটিশ শক্তি সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যায়নে ভারতীয়দের রাজনৈতিক বিচারে ব্যর্থতার জন্য ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের প্রচুর মূল্য দিতে হয়। এই উপরোক্ত যুক্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র শাসকশ্রেণীকে বিচ্যুত করার জন্যেই জনগণ বিদ্রোহ করে না, সেই সঙ্গে প্রয়োজন সার্থকতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর আত্মবিশ্বাস।

ইংরেজ শক্তি সম্পর্কে ভারতীয়দের ভুল মূল্যায়ন

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক অযোধ্যা অধিকার, অযোধ্যা ছাড়াও সাধারণভাবে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এই নীতিতে অযোধ্যায় সামগ্রিকভাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে আর তা কোম্পানির সেনাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বভারতীয় স্বার্থ সম্পর্কে এই সিপাহীগণের মধ্যে প্রেরণার অভাব থাকায় তারাই আবার ভারতের অন্যান্য স্থানে ব্রিটিশদের বিজয়যাত্রাকে সাহায্য করেছিল। উপরন্তু অযোধ্যায় ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁদের আর্থিক অবস্থায় প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়। কারণ তাঁদের অযোধ্যার পারিবারিক ভূমির উপর অধিক কর দিতে হয়েছিল।

ডালহৌসির অযোধ্যা দখলের অজুহাত ছিল নবাব ও তালুকদারদের অত্যাচার থেকে জনগণকে রক্ষা করা। কিন্তু কার্যতঃ জনগণের এতে কোন সুরাহাই হয়নি। জনগণকে নতুন শাসকদের সর্বক্ষেত্রে অধিক রাজস্ব প্রদান করতে হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানেও প্রাচীন জমিদার ও কৃষকদের জমিজমা নতুন সৃষ্ট জমিদারদের কাছে হস্তান্তরিত হতে শুরু করে।

অযোধ্যায় ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের কুফল

নবাবের শাসনের অবসান এবং সেনাবাহিনী লোপ—স্থানীয় অভিজাত, সরকারী কর্মচারীগণ ও সৈন্যগণ তাঁদের চাকুরি হারায় এবং বহুসংখ্যক বেকারের সৃষ্টি হয়। অযোধ্যার নবাবের দরবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও হস্তশিল্পের শ্রমিকগণের জীবিকার্জনের পথগুলি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশগণ এই সকল পেশাচ্যুত ব্যক্তিদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করে তালুকদার ও জমিদারদের জমি-জমাগুলি বাজেয়াপ্ত করে। এই বাস্তুচ্যুত তালুকদারগণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়।

অধীনতামূলক মিত্রতা ও কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যাসহ অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলিকে একের পর এক ব্রিটিশ শাসনভুক্ত করায় ডালহৌসির প্রচেষ্টায় ভারতীয় নৃপতিগণের মনে ভীতি সঞ্চারিত হতে থাকে। এরা উপলব্ধি করল যে ব্রিটিশদের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য সত্ত্বেও তারা দেশীয় রাজ্য আক্রমণের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে পারেনি। ব্রিটিশদের এই আচরণে তাঁদের রাজনৈতিক মর্যাদার হানি হয়। ভারতীয় রাজন্যবর্গকে মৌখিক ও লিখিত প্রতিশ্রুতি ক্রমান্বয়ে ভঙ্গ করে আশ্রিত- ও বহু রাজ্যগুলিকে কুক্ষিগত

ব্রিটিশদের বিভিন্ন অছিলায় রাজ্য জয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

করার প্রয়াস ভারতীয়গণের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বেলে দেয়।

এইরূপ ব্রিটিশ মনোভাব কার্যতঃ মারাঠাপ্রধান নানাসাহেব, ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ ও মোগলসম্রাট বাহাদুর শাহকে শত্রুতে পরিণত করে।

ধর্মনৈতিক কারণ

ধর্মীয় ভারতে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাসের ওপর আক্রমণ বলে ভারতীয়গণ মনে করতেন। এই সময় ভারতের মাটিতে খ্রীষ্টান যাজকগণের অপ্রতিহত প্রভাব এবং নানা অজুহাতে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা ভারতীয়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সরকারী সাহায্যপুষ্ট এই মিশনারী কার্যকলাপ ভারতের বিভিন্ন ধর্মকে ভীষণভাবে আঘাত করল এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আইন প্রণয়ন করে সিপাহীদের ভারতের বাইরে চাকুরিতে পাঠানোর প্রস্তাব হিন্দুধর্মের ওপর আক্রমণ হিসাবে গণ্য হল। সমুদ্রপাড়ি জাতিগত মর্যাদার পক্ষে হানিকর এবং সেইজন্যে ইংরেজ প্রবর্তিত আচরণবিধি ভারতীয়গণের জাত ও বর্ণকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস বলে ভারতীয়দের মনে করল। অপর দিকে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে অনুরূপ আতঙ্ক এবং ধর্মসংস্কারের ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করল। ব্রিটিশের ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কার ও বিধির উপর অবিরাম আক্রমণ ভারতীয়দের ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী করে তোলে। এই প্রসঙ্গে পবিত্র গঙ্গা নদীতে জলসেচ ব্যবস্থা ও মন্দির ও মসজিদের খাজনা ধার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া ভারতীয় সিপাহীগণের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দেওয়ার কারণ, খাস ইংরেজ সিপাহী অপেক্ষা ভারতীয় সিপাহীদের বেতনের ব্যাপারে তারতম্য এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ভারতীয় সিপাহীদের পথ উন্মুক্ত না থাকা।

ভারতীয় সিপাহীগণের মধ্যে অসন্তোষের আগুন বহুদিন যাবৎ ধূমায়িত হচ্ছিল। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায়, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারাকপুর প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় সিপাহীদের মধ্যে মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ দেখা দিত। অবশেষে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অসন্তোষের দাবানল বিরাট আকৃতি ধারণ করে এবং মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়।

বিদ্রোহের ব্যাপ্তি

আদিম জাতিগুলির মধ্যেও ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লবণ আন্দোলনের সঙ্গে মেদিনীপুরের মালঙ্গী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে, ধলভূম ও বীরভূমে চুয়ার আদিবাসীগণের বিদ্রোহ, ১৭৬০-১৮০০ পর্যন্ত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১৮১৮ ও ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমঘাট ও খান্দেশের আদিবাসী ভলগণের বিক্ষোভ, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের কোলাপুর ও উড়িষ্যার গঞ্জামে গাদকারী বিদ্রোহ, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পূর্ব ভারতে গারো ও জয়ন্তিয়ার পাহাড় অঞ্চলে খাসিয়া আদিবাসীদের অভ্যুত্থান, ছোটনাগপুরের কোল বিদ্রোহ, বাংলার কৃষকদের নীলবিদ্রোহ এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল বিপ্লব প্রভৃতি ছোটবড় বিক্ষোভ ও অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসন, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও নানা উৎপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে যে জনরোষের সৃষ্টি হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহ সেই সংগঠনে ইন্ধন জোগায়।

লর্ড ক্যানিং -এর শাসনকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের পূর্বে যখন নানা স্থানে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে উদ্বেলিত সেইসময় কেবলমাত্র একটি প্রত্যক্ষ কারণ বিদ্রোহের দাবানল জ্বালিয়ে দিল। এ সময় এন্‌ফিল্ড রাইফেল্‌ গরু ও শুয়োরের চর্বি-মিশ্রিত কার্তুজের প্রবর্তন করা হলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাকে ধর্মনাশের ষড়যন্ত্র বলে ধরে নিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বর্তমান উত্তর-চব্বিশ পরগনায় সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে মহাবিদ্রোহের উত্তাল ঢেউ ব্যারাকপুর শিবিরে এবং প্রায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্রোহের গতি-প্রকৃতির প্রচণ্ডতা সিপাহীদের সমর্থনে উত্তর-ভারতে ও মধ্য-ভারতে অসামরিক জনগণের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেয়। বহু ক্ষেত্রে সিপাহীদের বিক্ষোভের পূর্বে স্থানীয় জনগণ বিদ্রোহের সূচনা করে। বহু যুদ্ধে সাধারণ মানুষ সংখ্যায় সিপাহীদের ছাপিয়ে যায়। এই চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে পড়ে যখন দেখা যায় এক অযোধ্যাতেই নিহত দেড় লক্ষের মধ্যে এক লক্ষের উপর ছিল বেসামরিক লোকজন।

যে-সকল স্থানে জনগণ সরাসরি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি সেখানে বিদ্রোহীদের পরিপূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন জনগণ।

বিদ্রোহের প্রতি জনসমর্থন প্রসঙ্গে দেখা যায় যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাবিদ্রোহকে দমন করার জন্যে ইংরেজদের সিপাহী ছাড়াও জনগণের এক বৃহদাংশের বিরুদ্ধে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়। যদিও তারা পরাজয় বরণ করে নেয় তবুও তাঁদের উদ্দীপনার ঘাটতি ছিল না। লণ্ডন টাইমস-এর ব্রিটিশ উদ্ধৃতি অনুসারে এই বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ তৎপরতাকে 'পুনর্বার ভারত জয়ের সমতুল্য' বলে মনে করা হয়েছে।

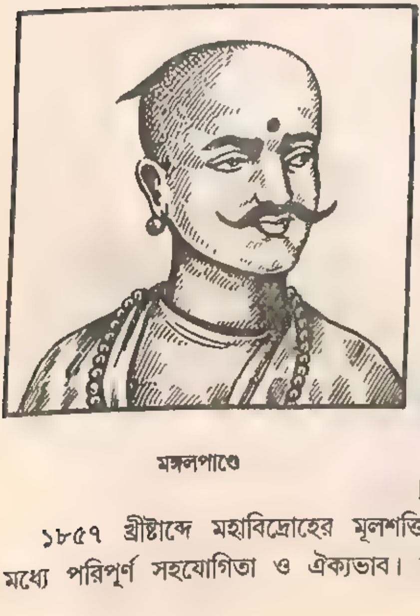

মঙ্গলপাণ্ডে

তাঁতিয়া তোপে

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের মূলশক্তি ছিল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও ঐক্যভাব। হিন্দু ও মুসলমান বিদ্রোহীগণ পরস্পর

পরস্পরের অনুভূতির উপযুক্ত মর্যাদা দিতেন। এই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভূমিকা পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এচিসন্ নামে এক ইংরেজ সরকারী কর্মকর্তার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। তিনি বলেছিলেন যে "বিদ্রোহ দমনে আমরা মুসলমানদের-হিন্দুদের বিরুদ্ধে চালনা করতে সক্ষম হইনি।" প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অমূল্য হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে ভারতের জনগণ ও রাজনীতি মধ্যযুগে এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয়নি। লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীদের পরিচালনা করেন অযোধ্যার বেগম।

দিল্লীর বিদ্রোহ আপাতদৃষ্টিতে সম্রাট বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে সংঘটিত হলেও প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রিত হয় জেনারেল বক্ত খানের নেতৃত্বে। বক্ত খান ছিলেন দিল্লীর সেনাছাউনির অত্যন্ত জনপ্রিয় সাধারণ মানুষ। সম্রাট বাহাদুর শাহের সম্মান বিদ্রোহীদের নিকট খুবই নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হয়, কারণ তাঁর বেগম ও পুত্রদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র এবং ব্যায়াধিক্য ও সর্বোপরি দুর্বল নেতৃত্ব বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলে বিদ্রোহীদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। কানপুরের বিদ্রোহ পরিচালনা করেন চিরস্মরণীয় দেশাত্মবোধের নায়ক তাঁতিয়া তোপে।

বিদ্রোহের নেতৃত্ব

ভারতীয় ইতিহাসের বীরত্বের গাঁথার নায়িকা ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ এই মহাবিদ্রোহের প্রধান নেতৃত্বের অন্যতম। জমিদারী থেকে চ্যুত জগদীশপুরের কানোয়ার সিংহ বিহারে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। আশি বছর বয়সের এই নেতা সম্ভবত যে বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করেছিলেন তা পৃথিবীতে খুবই বিরল।

ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ

উত্তর-প্রদেশে ফয়েজাবাদে বিদ্রোহীদের সুযোগ্য নেতৃত্ব দেন মৌলভী আহম্মদ উল্লা।

এই বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সিপাহীদের অসীম বীরত্ব ও নিঃস্বার্থ প্রাণদান এবং মানসিক দৃঢ়তা ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে লুপ্ত করার প্রয়াসে অনেকটা সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল। যে কার্তুজকে তাঁরা ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত বলে প্রথমে অভিহিত করেছিল পরবর্তীকালে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নিজেরাই তা ব্যবহার করেছিল। অর্থাৎ বিদ্রোহ শুরুতে তা মুখ্য ও প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। বিদ্রোহীগণের অবিচল ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব তাকে শুধু গৌণই করেনি উপরন্তু ধর্মীয় সংস্কারও তাদের এই পণ পালনে আর বাধার সৃষ্টি করল না।

বিদ্রোহের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ যদিও বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার পেছনে বিরাট জনসমর্থনও ছিল; কার্যতঃ দেশের সমস্ত গোষ্ঠী এবং ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এই মহান বিদ্রোহে সামিল করা যায়নি। ভারতীয় রাজন্যবর্গের ও বড় বড় জমিদারগণের আত্মস্বার্থ এবং ব্রিটিশভীতির ফলে তারা অনেকেই এই বিদ্রোহে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। উপরন্তু গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, হায়দ্রাবাদের নিজাম, যোধপুর ও অন্যান্য রাজপুত শাসকগণ, ভূপালের নবাব, পাতিয়ালার শাসকগণ, নেপালের রানা প্রমুখ অনেকেই এই বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিল। শতকরা মাত্র এক ভাগ ভারতীয় রাজপ্রধানগণ এই বিদ্রোহে সামিল হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, পশ্চিম-পাঞ্জাব মূলতঃ এই বিদ্রোহের বেড়াজালের বাইরে ছিল। ভারতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই বিদ্রোহ সম্পর্কে ছিল সন্দিহান। বহু জোতদার বিদ্রোহ সম্পর্কে অনীহা প্রকাশ করেছে অথবা বিদ্রোহীদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। এমনকি অযোধ্যায় সম্পত্তিচ্যুত তালুকদারগণ যাঁরা বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়, পরবর্তীকালে ইংরেজগণ যখন তাদের হৃত-সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দান করে, সেই মুহূর্তেই তাঁরা বিদ্রোহীদের পক্ষ ত্যাগ করেন।

অর্থলগ্নিকারীগণের আক্রমণের মূল লক্ষ্যই ছিল গ্রামবাসীরা। তারা বিদ্রোহের বিপক্ষে ছিল। বাংলার জমিদার শ্রেণী ছিল ব্রিটিশদের অনুগত, কারণ এঁরা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজদের দ্বারা সৃষ্ট। তাছাড়া বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজের বড় বড় ব্যবসায়ীগণ, যাদের লভ্যাংশের বড় অংশ বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আসত, ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগাযোগ থাকার ফলে তাঁরা ব্রিটিশদেরই সমর্থক ছিল।

ভারতের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদ্রোহকে সমর্থন করে নি। বিদ্রোহীদের সংস্কারপন্থী মনোভাব এবং প্রগতিশীল সামাজিক সংস্কারের বিরোধিতা এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাঁদের ধারণা হল যে বিদ্রোহীদের সাফল্য অবশ্যই দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাবে। অপর পক্ষে, ব্রিটিশ সাফল্যে তাদের ঈপ্সিত আধুনিকীকরণের কাজ ত্বরান্বিত হবে। হয়তো শিক্ষিত ভারতীয়দের এই কারণে জাতীয়তাবিরোধী বলা যায় না বা বিদেশী শাসনের প্রতি অনুগত ধরে

নেওয়া যায় না। বিদ্রোহোত্তর ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে অনতিকালেই ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও আধুনিক জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বদান করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাই।

এই মহাবিদ্রোহ আপাত সফলতা অর্জন না করতে পারলেও ভারতে সেই মুহূর্তে অনৈক্যের মনোভাব বিস্তারের সম্ভাবনা, আধুনিক জাতীয়তা আন্দোলন সম্পর্কে অজ্ঞতা, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্বার্থ এবং আত্মবোধের মাধ্যমে ভারতীয়দের একত্রীভূত করার প্রচেষ্টা তদবধি অজানা ছিল। স্বভাবতই এই অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহ ভারতীয়দের একাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে সমস্ত ভারতীয়দের একসূত্রে গ্রথিত করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ব্রিটিশগণ ভারতের শেষ মোগল সম্রাটকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করলে ভারতবর্ষ থেকে মোগল অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বীরত্বপূর্ণ ও স্বাদেশিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিদ্রোহ জনমানসে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং আগামী দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয়গণকে প্রেরণা জোগায়।

আদর্শ প্রশ্নমালা

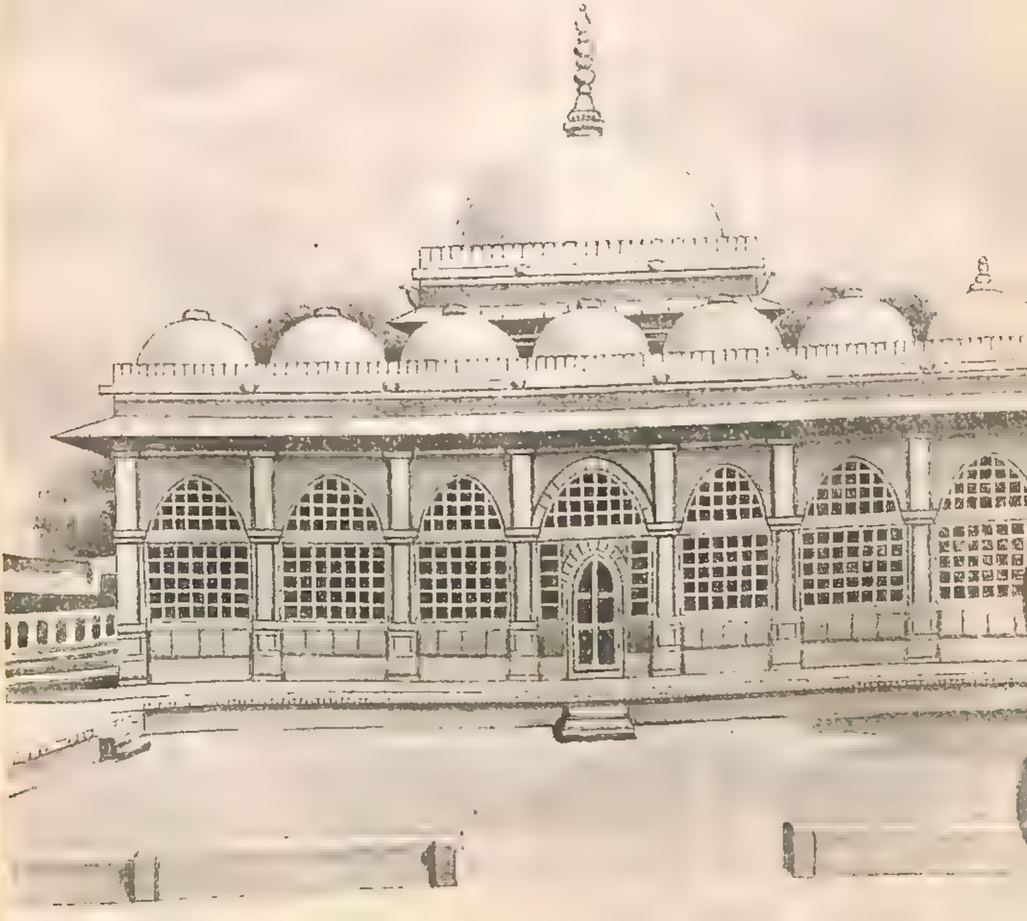

অনুশীলনী

প্রশ্নাবলী

(প্রাচীন যুগ)

নবম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর লেখঃ—

(ক) "ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। একটি আর একটির পরিপূরক।"—এ কথাগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (খ) ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে তার ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তা আলোচনা কর। (গ) "বৈচিত্র্যে ভরা এই ভারতে এক মূলগত ঐক্য বিদ্যমান।"—কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (ঘ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান সম্বন্ধে যা জান লেখ। (ঙ) বিদেশী পর্যটকদের ভারত ভ্রমণের বৃত্তান্ত থেকে আমরা কি জানতে পারি?—বিস্তারিত আলোচনা কর।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) ভূ-প্রকৃতি অনুসারে ভারত উপমহাদেশকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কি কি? (খ) জাতিতত্ত্বের বিশারদগণ ভারতের অধিবাসীদের যে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন তার নাম কি কি? (গ) সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র—এই তিনটি নদী উত্তর-ভারতের কি উপকার করেছে? (ঘ) ভারতের তিন দিকে যে তিনটি সমুদ্র আছে তাদের নাম কি কি? (ঙ) হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থগুলির নাম লেখ। (চ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি?

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) ভারতের উত্তর সীমান্তে কোন্ পর্বতমালা অবস্থিত? (খ) ভারতের আয়তন কত বর্গ কিলোমিটার?

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) প্রাচীন-প্রস্তর যুগ এবং মধ্য-প্রস্তর যুগ সম্বন্ধে যা জান লেখ। (খ) নব্য-প্রস্তর যুগের কৃষি, পশুপালন, যানবাহন প্রভৃতি উল্লেখ করে বিস্তারিত বর্ণনা দাও। (গ) হরপ্পা সভ্যতা এবং তাম্র-প্রস্তর যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (ঘ) "হরপ্পা সংস্কৃতি ছিল মূলতঃ নগরকেন্দ্রিক"— ব্যাখ্যা কর। (ঙ) হরপ্পা বাসীদের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে যা জান লেখ। (চ) হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে অন্য সভ্যতার সম্পর্ক কি ছিল?

২। সংক্ষেপে উত্তর লেখঃ—

(ক) ভারতের মাটিতে মানুষের বসবাসের সূচনা কখন আরম্ভ হয়েছিল? (খ) প্রস্তর যুগকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি? (গ) হরপ্পা সংস্কৃতির বিস্তৃতি কতদূর পর্যন্ত ছিল? (ঘ) মহেঞ্জোদরোয় আবিষ্কৃত স্নানাগারটির বর্ণনা দাও।

৩। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতা কত খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। (খ) মহেঞ্জোদরোয় কোন্ চার শ্রেণীর জাতির মানুষ বাস করত? (গ) হরপ্পা বাসীদের প্রধান উপজীবিকা কি ছিল?

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাও ঃ—

(ক) 'আর্য' বলতে আমরা কি বুঝি? আর্যদের বাসস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতামত আলোচনা কর। (খ) আর্যদের বৈদিক সাহিত্য কি কি? বৈদিক সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনা কর। (গ) ঋক্‌বেদে বর্ণিত আর্যদের সামাজিক অবস্থার কি বিবরণ পাওয়া যায়? (ঘ) আর্যদের রাজনৈতিক প্রশাসনিক কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—

(ক) "ঋক্ বেদ আর্যদের সব থেকে প্রাচীন সাহিত্য।"—আলোচনা কর। (খ) ঋক্‌বেদে বর্ণিত আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে কি জান? (গ) আর্যদের ধর্ম-জীবন কিরূপ ছিল? (ঘ) পরবর্তী বৈদিক যুগ কোন্ সময়কে বলে?

৩। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) বৈদিক আর্যরা মূলতঃ কোন্ তিনটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? (খ) 'কুলুপ' কাকে বলা হত? (গ) 'চতুরাশ্রম' কি? (ঘ) বেদাঙ্গের ছয়টি দর্শন কি কি?

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাও ঃ—

(ক) বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। (খ) জৈনধর্ম প্রচারের কারণ কি? এ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কর। (গ) বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (ঘ) বুদ্ধদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে যা জান লেখ। (ঙ) মহাবীরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—

(ক) 'তীর্থংকর' কাদের বলা হয়? (খ) পার্শ্বনাথ মানবসমাজকে চারটি কি কি নতুন পথ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন? (গ) জৈনধর্মের তিনটি রত্ন কি? (ঘ) 'ত্রিপিটক' কি? (ঙ) বৌদ্ধ সাহিত্যে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলতে কি বোঝায়? (চ) প্রতিটি বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের একটি বিশিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করতে হত। মন্ত্রটি কি?

৩। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) ২৩তম তীর্থংকরের নাম কি? (খ) জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে? (গ) পার্শ্বনাথ কত বৎসর বয়সে গৃহত্যাগী হন? (ঘ) জৈনধর্মের মূলনীতি কি? (ঙ) বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা কে? (চ) বুদ্ধদেবের জন্ম কোথায় হয়? (ছ) মহাবীরের মা-এর নাম কি ছিল?

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) ষোড়শমহাজনপদ বলতে কি বোঝ? (খ) টীকা লেখঃ—কাশী, অঙ্গ, মগধ, অবন্তী, কম্বোজ, কোশল, মল্ল, চেদি। (গ) বিম্বিসার কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান? (ঘ) অজাতশত্রু সম্বন্ধে যা জান লেখ। (ঙ) নন্দবংশের ঐতিহাসিক বিবরণ দাও। (চ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ। (ছ) চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও। (জ) অশোকের কলিঙ্গ বিজয় ও রাজ্য বিস্তারের বিবরণ লেখ। (ঝ) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও। (ঞ) কুষাণরাজ কনিষ্কের রাজত্বকালের বিবরণ লেখ। (ট) সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের বর্ণনা দাও। (ঠ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) 'বৎস' রাষ্ট্র সম্বন্ধে কি জান? (খ) 'পাঞ্চাল' রাষ্ট্রের বর্ণনা দাও। (গ) 'অশ্বক' রাজ্যটির ভৌগোলিক অবস্থান বল। (ঘ) মগধ সাম্রাজ্য কিভাবে রূপান্তরিত হয়? (ঙ) চন্দ্রগুপ্তের সেনাবিভাগের বিবরণ দাও। (চ) মহামতি অশোক কি ভাবে সিংহাসন লাভ করেন? (ছ) অশোক কিভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন? (জ) বিশ্ব ইতিহাসে অশোকের স্থান কোথায়? (ঞ) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল কি? (ট) টীকা লেখঃ—শক জাতি, পল্লব, সাতবাহন সাম্রাজ্য, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত।

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) মৎস্য রাষ্ট্র কোথায় ছিল? (খ) সুরসেনের রাজধানী কোথায় ছিল? (গ) মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঘ) অজাতশত্রুর পিতার নাম কি? (ঙ) নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (চ) মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ছ) অশোক কত খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ) রাজতরঙ্গিণী কে রচনা করেন? (ঝ) আলেকজাণ্ডার কত খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? (ঞ) কনিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল?

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালের বর্ণনা দাও। (খ) হর্ষবর্ধন সম্বন্ধে যা জান লেখ। (গ) টীকা লেখঃ—ধর্মপাল, বিজয়সেন, লক্ষ্মণসেন, রামপাল। (ঘ) টীকা লেখঃ—দ্বিতীয় পুলকেশী, কল্যাণের চালুক্যরাজ, ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য। (ঙ) রাজেন্দ্র চোল কে ছিলেন? তার সম্বন্ধে কি জান?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) যশোধর্মন কে ছিলেন? তার সম্বন্ধে কি জান? (খ) ইতিহাসে "মাৎস্যন্যায়" বলতে কি বোঝ? (গ) মহীপাল-এর রাজত্বকালের বিবরণ দাও। (ঘ) কাঞ্চির পল্লবগণের বিবরণ দাও।

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) শিলাদিত্য কে? (খ) পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে?

সপ্তম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) পাল ও সেন যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও।

(খ) সে যুগে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কেমন ছিল বর্ণনা দাও।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) পাল ও সেন যুগে সাংস্কৃতিক জীবন কিরূপ ছিল? (খ) দক্ষিণ-ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি কিরূপ ছিল? (গ) দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন কে করেন? (খ) 'তামিল কুরাল' কোন্ যুগে রচিত হয়?

মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায়—পঞ্চম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) মুসলিম যুগকে মধ্যযুগ বলা হয় কেন? (খ) ভারতে ইসলামের আবির্ভাব কি ভাবে ঘটে? (গ) ভারতে আরব আক্রমণের ফলাফল কি? (ঘ) ভারতে মুসলমান শাসনের সূচনা কি ভাবে হয়েছিল? (ঙ) আলবেরুনীর জন্ম কোন্ সালে হয়? আলবেরুনীর চোখে তখনকার দিনের ভারতের বর্ণনা দাও। (চ) মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের বর্ণনা দাও। (ছ) কুতুবুদ্দিন আইবকের স্বল্পকালীন রাজত্বের বিবরণ দাও। (জ) "ইলতুতমিসের সিংহাসন আরোহণ মোটেই সুখকর ছিল না।"—ব্যাখ্যা কর।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের ফলাফল কি? (খ) প্রথম তরাইনের যুদ্ধের বিবরণ দাও। (গ) দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে ফলাফল কি হয়েছিল? (ঘ) ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খালজী কে? তার সম্বন্ধে কি জান?

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) কত খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের মৃত্যু হয়? (খ) মহম্মদ ঘোরী কত সালে কার হাতে নিহত হয়? (গ) তরাইনের যুদ্ধ কার কার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল? (ঘ) কুতুবমিনার কোথায় অবস্থিত? কার সময়ে এটি নির্মিত হয়েছিল?

ষষ্ঠ অধ্যায়—অষ্টম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) খালজী বংশের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়? (খ) আলাউদ্দিন খালজীর সিংহাসন লাভের ইতিহাস কি? আলাউদ্দিনের শাসন কার্যের বর্ণনা দাও। (গ) মহম্মদ বিন্ তুঘলক কিভাবে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন? "মহম্মদ বিন্ তুঘলকের শাসনকাল সেযুগের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা।"—ব্যাখ্যা কর। (ঘ) মহম্মদ বিন্

তুঘলকের কতকগুলি বিতর্কিত কর্মসূচীর আলোচনা কর। (ঙ) সুলতান ফিরোজ শাহ কে ছিলেন? সিংহাসন লাভ করার পর ফিরোজ শাহ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে গুণগত পরিবর্তন আনেন তার বর্ণনা দাও। (চ) তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের ইতিহাস বর্ণনা কর। ঐ আক্রমণের ফল কি হয়েছিল? (ছ) সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জান? (জ) টীকা লেখঃ মোবারক শাহ, মহম্মদ শাহ, আলাউদ্দিন আলম শাহ, বাহলুল লোদী, সিকান্দার লোদী। (ঝ) ইলিয়াস শাহী শাসনে বাংলা দেশের ঐতিহাসিক চিত্র লেখ। (ঞ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকালের বর্ণনা দাও।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) ফিরোজ শাহের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (খ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কোন্ সালে কার কার সঙ্গে হয়েছিল? এর ফলাফল কি? (গ) হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়? (ঘ) মোগল শাসনের সূচনা কিভাবে হয়?

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা কোন্ সালে হয়? (খ) তৈমুরলঙ্গ কত সালে দিল্লী দখল করেন? (গ) ইব্রাহিম লোদীর পিতার নাম কি? ইব্রাহিম লোদী কোন্ সালে সিংহাসনে বসেন? (ঘ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত সালে সংগঠিত হয়? (ঙ) এ যুদ্ধ কার কার সঙ্গে হয়েছিল?

নবম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) ইলিয়াস শাহী বংশের সূচনা কিভাবে হয়? ইলিয়াস শাহের রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও। (খ) ইলিয়াস শাহী শাসনে বাংলার সাহিত্য ও শিক্ষার যে উন্নতি হয়েছিল তার বিবরণ দাও। (গ) বাহমনী রাজ্যের বিবরণ দাও। (ঘ) বিজয়নগর রাজ্য সম্বন্ধে যা জান লেখ। (ঙ) বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ দাও। (চ) "বাংলার আকবর" কে ছিলেন? তার সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) হুসেন শাহী বংশের কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়? (খ) টীকা লেখঃ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ। (গ) কি ভাবে বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়? (ঘ) বাহমনী বংশের নাম কিভাবে হয়? (ঙ) দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি রাজ্য কি কি? ঐ রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (চ) ভক্তি আন্দোলন বলতে কি বোঝ? (ছ) টীকা লেখঃ—কবীর, গুরুনানক, শ্রীচৈতন্যদেব। (জ) সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।

৩। এক কথার উত্তর দাওঃ—

(ক) হাজীপুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা কে? (খ) হুসেন শাহী শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? (গ) কুতলুগ খাঁ কে ছিলেন? (ঘ) কোন সালে বাহমনী রাজ্যের পতন ঘটে? (ঙ) বাহমনী রাজ্য ভেঙে কি কি পাঁচটি রাজ্যের উদ্ভব হয়? (চ) কার আমলে 'মহাভারত' বাংলায় অনূদিত হয়েছিল?

দশম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) সুলতানী যুগে ভারতে ইসলামের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (খ) ভক্তি আন্দোলন বলতে কি বোঝ? (গ) টীকা লেখঃ—কবীর, গুরুনানক, চৈতন্যদেব।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) সুফীবাদ কি? (খ) উর্দু ভাষার উৎপত্তি কি ভাবে হয়।

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) রামানন্দ কে? (খ) পার্থসারথি মিশ্র কে ছিলেন?

মোগল যুগ (১৫২৬-১৭০৭)

প্রথম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) মোগল যুগের ঐতিহাসিক উপাদান-এর উৎস বিষয়ে আলোচনা কর। (খ) ভারতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির বিবরণ দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? তার সম্বন্ধে কি জান? (খ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধের বর্ণনা দাও। (গ) খানুয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান? (ঘ) হুমায়ুনের রাজত্বকালের বর্ণনা দাও। (ঙ) শেরশাহের রাজ্য শাসনের বিবরণ দাও। (চ) আকবরের মেবারজয় ও গুজরাট অভিযানের বিষয় আলোচনা কর। (ছ) উড়িষ্যার মোগল আধিপত্য কি ভাবে স্থাপিত হয়? (জ) সম্রাট আকবরের সাংস্কৃতিক মনোভাবের পরিচয় দাও। (ঝ) আকবর গ্রন্থাগারের উন্নতি এবং মুদ্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি করেছিলেন? (ঞ) সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কন কর। (ট) শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ কর। (ঠ) ঔরঙ্গজেব কি ভাবে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন? (ড) ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি বর্ণনা কর। (ঢ) মারাঠা নায়ক শিবাজীর সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সংঘর্ষের বিবরণ দাও।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের বর্ণনা দাও। (খ) আকবরের কাবুল বিজয় সম্বন্ধে কি জান? (গ) আকবরের 'দীন-ইলাহি' সম্বন্ধে যা জান লেখ। (ঘ) ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য বিস্তার বর্ণনা কর। (ঙ) ঔরঙ্গজেবের প্রশাসনিক ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ব্যাখ্যা কর। (চ) পুরন্দরের সন্ধি বলতে কি বোঝ?

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কোন্ সালে হয়েছিল? (খ) জিজিয়া কর কে প্রত্যাহার করেন? (গ) তাজমহল কে সৃষ্টি করেন? (ঘ) ঔরঙ্গজেবের শাসন-ব্যবস্থার মৌলিক তিনটি কাঠামো কি কি ছিল? (ঙ) ময়ূর সিংহাসন কে নির্মাণ করেন?

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) ভারতে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপনে মুসলমান শাসকদের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ কর। (খ) মোগল আমলে জায়গিরদারী প্রথা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তা আলোচনা কর। (গ) মোগল আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবরণ দাও।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতকে দেখেছেন—আলোচনা কর। (খ) মোগল যুগের স্থাপত্য শিল্প ও চিত্রকলার বিবরণ দাও। (গ) বীরবল, টোডরমল, আবদুল রহিম-খান-ই-খানান কে ছিলেন?

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) আবুল ফজল কোন্ গ্রন্থের রচয়িতা? (খ) তুলসীদাসের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কি? (গ) বৈষ্ণব পদাবলী কোন্ যুগে রচিত হয়?

ভারতের ইতিহাস
(আধুনিক যুগ)

প্রথম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর লেখঃ—

(ক) মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মূলে কি কি অবস্থা মূলতঃ দায়ী ছিল? (খ) মোগল অভিজাত সম্প্রদায়ের অধঃপতন কিভাবে মোগল দরবারে আঘাত করেছিল? (গ) মোগল সাম্রাজ্যের পতনে ঔরঙ্গজেবের দায়িত্ব বিশ্লেষণপূর্বক পরবর্তী মোগল শাসকদের অক্ষমতা কতখানি পতন ত্বরান্বিত করেছিল? (ঘ) মোগল-সম্পদের অবক্ষয় কিভাবে হয়েছিল? জায়গির প্রথা ও অন্যান্য কি কি ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার ফলে প্রকট হয়ে ওঠে?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) মোগল সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের ইতিহাসকে কোন্ দু'টি অংশে ভাগ করা যায়? (খ) নাদির শাহের ভারত আক্রমণের পরিণাম কি হয়েছিল? (গ) কোন্ কোন্ অঞ্চল মোগলদের হস্তচ্যুত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম থেকে বৈদেশিক আক্রমণের পথ প্রশস্ত হয়।

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) কোন্ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়? (খ) মুর্শিদকুলি খাঁ-কে কোন্ সালে বাংলার শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়? (গ) নাদির শাহ কোন্ দেশের সম্রাট ছিলেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) বাংলা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরের শাসকদের অনুসৃত নীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। (খ) স্বাধীন ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে টিপুর কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল? (গ) কিভাবে শিখ জাতি নব উদ্যমে একটি সুসংহত বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল—আলোচনা কর। (ঘ) মারাঠা রাজশক্তির বদলে পেশোয়াতন্ত্র কিভাবে

প্রতিষ্ঠিত হল? (ঙ) উত্তর-ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে মারাঠাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বর্ণনা কর। (চ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কি সত্যিই মারাঠাদের চিরতরে দুর্বল করে দেয়? এই যুদ্ধে মারাঠা বিপর্যয়ের কারণ কি? (ছ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণপূর্বক এর সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—

(ক) মোগলদের দুর্বলতার সুযোগে কোন্ কোন্ দুই যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বাংলাকে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন? (খ) কোন্ সালে এবং কে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পত্তন ঘটান? (গ) গুরু গোবিন্দ সিংহ কে ছিলেন? (ঘ) কোন্ সালে এবং কিভাবে গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যু হয়? (ঙ) মোগলশক্তির পতনের পর দেশের রাজনৈতিক শূন্যতা কারা এবং কিভাবে পূর্ণ করেছিল? (চ) বালাজী বিশ্বনাথ কিভাবে মারাঠা শক্তিকে সুদৃঢ় করেন? (ছ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কত সালে এবং কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?

৩। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) কোন্ সালে প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যু হয়? (খ) ১৬৮৯ সালে শিবাজীর পৌত্র শাহু কার হাতে বন্দী হন? (গ) নানাসাহেব কে ছিলেন? (ঘ) ভারতে মারাঠাদের ভবিষ্যৎ প্রভুত্বের ভিত্তি কে রচনা করেন? (ঙ) টিপু সুলতান কে ছিলেন? (চ) স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ছ) মৃত্যুকালে গুরু গোবিন্দ সিংহ কি উপদেশ দিয়েছিলেন?

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাও ঃ—

(ক) ইউরোপীয় বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলির তৎপরতায় কারা অগ্রণী ছিলেন? ভারতে কোন্ কোন্ ইউরোপীয় বাণিজ্যগোষ্ঠী অষ্টাদশ শতক ও তার পরেও তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল? (খ) ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কিভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে? ইংরেজগণ কি সত্যিই দেশীয় রাজাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন? (গ) অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ কিভাবে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে? (ঘ) কর্ণাটের যুদ্ধগুলি দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কিভাবে প্রভাবিত করে ইংরেজদের ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয়ে সুবিধা করেছিল? (ঙ) ফরাসী তৎপরতায় কিসের অভাব পরিলক্ষিত হয়? কেনই বা ফরাসীগণ এঁটে উঠতে পারেন নি।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—

(ক) ওলন্দাজ বাণিজ্য কুঠিগুলি কিভাবে ইংরেজদের হস্তগত হয়? (খ) প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধে নবাব আনোয়ার উদ্দিনের ফরাসীদের কাছে পরাজয় কি কি ইঙ্গিত বহন করেছিল? (গ) কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধের কারণ কি?

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) ১৬৩৩ সালে ইংরেজরা পূর্ব-ভারতের কোন্ স্থানে প্রথম বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করেন? (খ) ফরাসী দেশ থেকে কার আগমণের পর থেকে ফরাসীগণ বাণিজ্য করার পরিবর্তে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়? (গ) দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? (ঘ) ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক চতুরতা কাদের বেশি ছিল?

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে বাংলায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করল? (খ) অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাণিজ্য শুল্ক সংক্রান্ত যে সমস্ত ব্যবস্থাদি চালু ছিল এবং সেগুলি দেশীয় রাজন্যবর্গ ও ইংরেজদের সম্পর্কের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে? (গ) সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের কারণগুলি কি? কিভাবে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছয় এবং পলাশী যুদ্ধের গুরুত্ব কি? (ঘ) মিরকাশিম ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন কেন? ইংরেজ ও মিরকাশিমের সম্পর্কের পরিণতি কি হয়েছিল? (ঙ) ইংরেজদের দেওয়ানী লাভ কিভাবে সম্ভব হয়? দেওয়ানী লাভের তাৎপর্য কি ছিল?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) শায়েস্তা খাঁ কে ছিলেন। (খ) আলিনগরের সন্ধির শর্তগুলি কি কি? (গ) বক্সারের যুদ্ধ কখন এবং কাদের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল? এ যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল? (ঘ) 'নায়েব সুবা' কি?

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) কলকাতা মহানগরী কে স্থাপন করেন এবং কোন্ সালে? (খ) পলাশীর যুদ্ধ কোন্ সালে সংঘটিত হয়েছিল? (গ) সিরাজ কার হাতে নিহত হন? (ঘ) ইংরেজরা মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে কাকে নবাব নিযুক্ত করেছিলেন?

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির প্রসার কি ভাবে ঘটল? (খ) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পটভূমিকা এবং সলবাই-এর সন্ধির বিষয় যা জান লেখ। (গ) ইঙ্গ-মহীশূর দ্বন্দ্বে হায়দার আলির ভূমিকার আলোচনা কর। (ঘ) ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি কি?—ব্যাখ্যা কর। (ঙ) পাঞ্জাবে শিখদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের বিবরণ দাও। (চ) লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্য বিস্তারের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—

(ক) বেসিনের সন্ধি সম্বন্ধে যা জান লেখ। (খ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি কি? (গ) টিপু সুলতান কার পুত্র ছিলেন? কি ভাবে তিনি নিহত হয়েছিলেন? (ঘ) 'অধীনতামূলক মিত্রতা' প্রয়োগের ফল কি হয়েছিল? (ঙ) আফগানিস্তানে ইংরেজ অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে যা জান লেখ। (চ) ইঙ্গ-নেপাল সংঘর্ষের বর্ণনা দাও।

৩। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল? (খ) হায়দার আলির কত খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়? (গ) তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ কোন্ সালে হয়েছিল? (ঘ) ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কত সালে সিঙ্গাপুরের কর্তৃত্ব লাভ করে?

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাও ঃ—

(ক) ক্লাইভের দেওয়ানি লাভ ও তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল? (খ) রেগুলেটিং অ্যাক্ট কি? (গ) ভারতে তিনটি প্রধান স্তম্ভকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ শাসন-তান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠে। —এ তিনটি স্তম্ভ কি কি?—আলোচনা কর। (ঘ) 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' সম্বন্ধে যা জান লেখ। (ঙ) 'মহল্লাবী বন্দোবস্ত' কি?

২ সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—

(ক) 'ক্লাইভের দ্বৈত শাসন' বলতে কি বোঝ? (খ) 'পিট্স ইণ্ডিয়া' অ্যাক্ট কি?

৩। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) কোন্ সালে ইংরেজগণ বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে? (খ) কোন্ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হয়? (গ) মেকলে কে? (ঘ) কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে কবে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়েছিল? (ঙ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোন্ সালে এবং কে প্রবর্তন করেছিলেন?

(চ) বাংলার প্রথম গর্ভনর জেনারেল কে?

(ছ) ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের সদস্যদের নাম লিখ।

(জ) দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আদালত দুইটির নাম কি?

(ঝ) হেস্টিংসের ও কর্নওয়ালিসের আমলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী সর্বোচ্চ আদালত দুইটির বিচার যথাক্রমে কাহারা করিতেন?

(ঞ) কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট কবে স্থাপিত হয়?

(ট) সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?

(ঠ) পাঁচসালা বন্দোবস্ত কে চালু করেন?

(ড) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ প্রথমে কে করিয়াছিলেন?

(ঢ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কাহাদের আমলে প্রচলিত হয়?

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ (ক) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, (খ) ১৭৭২ সালের গুরুত্ব, (গ) রেগুলেটিং এ্যাক্ট, (ঘ) কমিটি অফ্ সারকিট বা ভ্রাম্যমাণ কমিটি, (ঙ) আমিনী কমিশন, (চ) কর্নওয়ালিস কোড, (ছ) শোর-কর্নওয়ালিস বিতর্ক (জ) সূর্যাস্ত আইন।

সপ্তম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর লেখঃ—

(ক) কিভাবে ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তার বিবরণ দাও। (খ) "অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতবর্ষ বিশ্ববাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।"—ব্যাখ্যা কর।

কোম্পানীর আমলে বাংলা তথা ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পের ধ্বংস কিভাবে হইয়াছিল? ইহার ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল?

ইংরেজ কোম্পানীর শাসনাধীনে ভারতীয় অর্থনীতিক বিপর্যয় কিভাবে ঘটিয়াছিল?

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ (ক) অর্থনৈতিক নির্গমন। (খ) ভারতের সূতীবস্ত্র শিল্প।

অষ্টম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো কিরূপ ছিল? (খ) ১৮৭০ সালে ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা-আইন পাশ হওয়ার পর ব্রিটিশরা ভারতে কিভাবে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করেন তার বিবরণ দাও। (গ) ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে কি বোঝ? (ঘ) রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারের বিবরণ দাও। (ঙ) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কারের বর্ণনা দাও।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—

(ক) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতায় ইংরেজী ভাষা শেখার জন্যে যে সব বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল তার বিবরণ দাও। (খ) নারীশিক্ষার তেমন প্রচলন সে সময়ে হয় নি কেন? (গ) মহারাষ্ট্রে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পুরোধা কে ছিলেন? এ আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান?

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ—

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? (খ) 'ডাফের যুগ' কোন সময়কে বলা হয়? (গ) ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত কয়টি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল? (ঘ) ব্রাহ্মসভা কোন্ সালে স্থাপিত হয়? (ঙ) বেথুন কলেজ কোন্ সালে স্থাপিত হয়?

নবম অধ্যায়ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাওঃ—

(ক) ওয়াহাবি আন্দোলন কাকে বলে? এই আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান? (খ) শিখদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবিদের সংগ্রামের বিবরণ দাও। (গ) বাংলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবি আন্দোলন সম্পর্কে যা জান লেখ। (ঘ) টীকা লেখঃ—কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ

সাঁওতাল বিদ্রোহের পরোক্ষ ফল কি হয়েছিল?

সাঁওতালগণ কেন বিদ্রোহ করে ?

এই বিদ্রোহ কিভাবে দমন করা হয় ?

৩। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

সিধু ও কানহু কে ছিলেন ?

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ

দশম অধ্যায় ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাও ঃ—

(ক) ১৮৫৭ সালের গণবিদ্রোহের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা কর। (খ) অযোধ্যায় ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের কুফল কি হয়েছিল ? (গ) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করেনি কেন ? কারণগুলি বর্ণনা কর। (ঘ) এ বিদ্রোহের ফলাফল কি হয়েছিল ?

(ঙ) ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র জাতীয় গণ-অভ্যুত্থান—উক্তিটির সহিত তুমি কি একমত ? ব্যাখ্যা সহ আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ (ক) নানাসাহেব, (খ) ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, (গ) তাঁতিয়া টোপী।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—

(ক) ইংরেজ সামরিক শক্তি সম্পর্কে ভারতীয়দের মূল্যায়ন কিরূপ ছিল ? (খ) ব্রিটিশরা কিভাবে ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছিলেন ? (গ) একটি মাত্র প্রত্যক্ষ কারণে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠল—কারণটি কি ?

৩। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) লর্ড ডালহৌসি কোন্ সালে অযোধ্যা অধিকার করেছিলেন ? (খ) লক্ষ্মীবাই কে ছিলেন ? (গ) সাঁওতাল বিদ্রোহ কোন্ সালে কোথায় হয়েছিল ?

(ঘ) কোন্ গর্ভনর জেনারেলের আমলে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ঘটে ?

(ঙ) মহাবিদ্রোহ প্রথম কোন্ স্থানে আরম্ভ হয় ?

(চ) কোন বন্দুকের কার্তুজ ব্যবহারের বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া মহাবিদ্রোহ শুরু হয় ? কে ইহার প্রথম নেতৃত্ব দেন ?

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta

H IX
BAR

© বর্ধমান শিক্ষক সংসদ